# Kaalbela by Somoresh Majumder

## [Part.1]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**

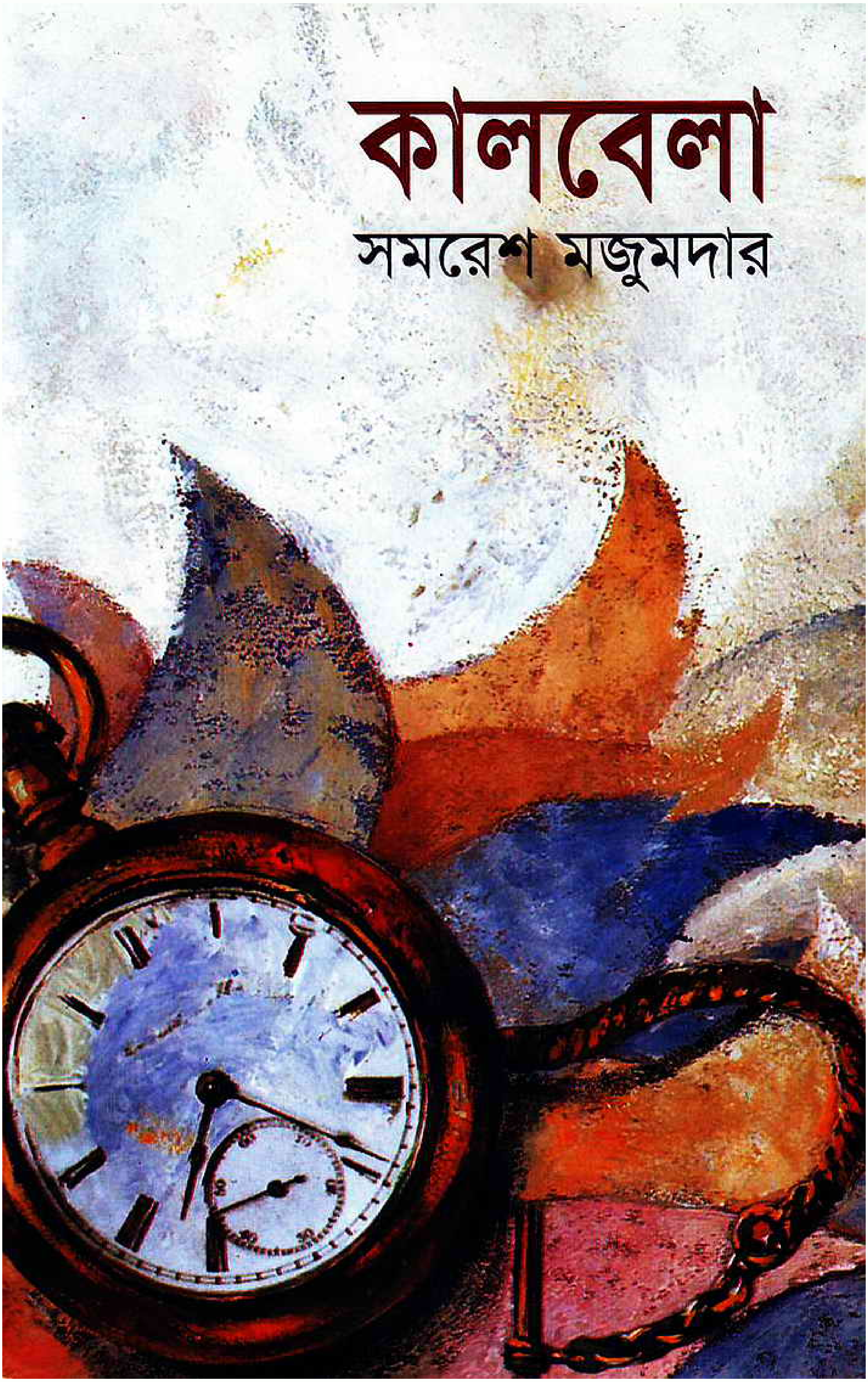
কালবেলা
সমরেশ মজুমদার

অনিমেষ যখন প্রথম কোলকাতায় পা রেখেছিল তখন রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে, গুলি চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই তরুণটি সেদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা মানুষের মত গা ভাসিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ তার জীবনের মোড় পাল্টালো। ছাত্র-রাজনীতি তাকে নিয়ে গেল জটিল আবর্তে। এই দেশে আর দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দুর্বার বাসনায় বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মনুষ্যত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ তাকে সরিয়ে নিয়ে এল উগ্র রাজনীতিতে। সত্তরের সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে দেখল, দাহ্যবস্তুর কোন সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে যখন বিকলাঙ্গ তখন বিপ্লবের শরিকরা হয় নিঃশেষ নয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের।
অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে। মাধবীলতা কোন রাজনীতি করেনি কখনো, শুধু তাকে ভালবেসে আলোকস্তম্ভের মত একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খরতপ্ত মধ্যাহ্নে যে এক গ্লাস শীতল জলের চেয়ে বেশি কিছু হতে চায় না। বাংলাদেশের এই মেয়ে যে কিনা শুধু ধূপের মত নিজেকে পোড়ায় আগামীকালকে সুন্দর করতে। দেশ গড়ার জন্যে বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।
'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এই দুটি চরিত্র লক্ষ পাঠকের ভালবাসা পেয়েছিল। সুস্থ উপন্যাসের সেইখানেই সার্থকতা।

ভরদুপুরে নিজের ছায়া দেখা যায় না। ছায়া যখন দীর্ঘতর হয় তখন তার আদল দেখে কায়াকে অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই সেদিন যেসব ঘটনা ঘটে গেল এ-দেশে তাই নিয়ে কিছু লিখতে বসার সময় হয়েছে কি না এ সংশয় থাকতেই পারে। সমসাময়িক কিছু নিয়ে লেখার মুশকিল হল আমাদের দেখাটা অন্ধের হস্তিদর্শন হয়ে যায়।

তবু 'উত্তরাধিকার'-এর পর 'কালবেলা' লিখতে বসে আমাকে এই সময়টাকেই বাছতে হয়েছে। আমি যেভাবে দেখতে চেয়েছি তার সঙ্গে অনেকেরই মতে মিলবে না, মিলতে পারে না। ওই সময়টাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম এই দাবি করি না কিন্তু আঁচ গায়ে না লাগুক মনে লেগেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সময় আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেউ কাউকে স্বীকার করতে চায় না। অতএব, আমার বিশ্বাসটাই আমার কাছে সত্য।

'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস ? আমি জানি না। কারণ এ ধরনের সাইনবোর্ডে আমি বিশ্বাসী নই। আমরা এক দারুণ অবিশ্বাসের কালে বেঁচে আছি। কেউ যদি বিশ্বাস করে ভুল করেন তবে তিনি কিন্তু আমাদের থেকে প্রাণবন্ত। অনিমেষরা যদি ভুলটা বুঝতে পেরে সঠিক পথটাকে খুঁজে পায় তা হলে কিন্তু ভুলটা মূল্যবান হয়ে যাবে।

কিন্তু 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ, মানুষ এবং নিজেকে। কারণ নিজেকে যে ভালবাসতে পারে না সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না।

উপন্যাসটি লেখার সময় আমি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'দেশ' পত্রিকার অজস্র পাঠক-পাঠিকা যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি ধন্য।

উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁকেই মানায়। আমার বন্ধু কল্যাণ সর্বাধিকারী প্রতিনিয়ত যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা স্মরণ থাকবে।

শেষ কথা, এই উপন্যাসে সময়টাকেই ধরতে চেয়েছি, কোনও মানুষ কিংবা ঘটনার সরাসরি ছবি তুলতে চাইনি।

**সমরেশ মজুমদার**

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে তরল মেঘেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিল আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর মাথা মুড়িয়ে। বাতাস আর্দ্র কিন্তু বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।

জানলা খুললে অনেকটা দূর দেখা যায়। অনিমেষ চুপচাপ বসেছিল। এরকম মেঘের দুপুর কিংবা বিকেলে মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। খুব আলস্য লাগে তখন। চোখ বন্ধ করলেই সেই মেঘগুলোর কথা মনে পড়ে যায় যারা ভুটান পাহাড় থেকে দল বেঁধে উড়ে এসে স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ওপর বৃষ্টি ঝরাত। তখন সেই সব বুনো লম্বাটে গাছগুলো কী উল্লাসে আকাশটা ছুঁয়ে রাখত। কান পাতলেই সেই শব্দ।

এ বছর ঘন মেঘের বিকেল এই প্রথম। মেঘেদের চেহারা কি পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম থাকে? তা হলে স্বর্গছেঁড়া এমনকী জলপাইগুড়ির মেঘগুলোর চেহারা চালচলন এখানকার থেকে একদম আলাদা কেন? ভীষণ ময়লা আর ঠুনকো মনে হচ্ছে এদের। যেন খুব কষ্ট করে আসছে ওরা, জমতে হয় তাই জমছে।

মেঘ দেখতে গিয়ে অনিমেষ কাছের দূরের ছাদগুলো দেখে ফেলল। তিনতলার ওপর ঘর বলে বেশ কিছু দূর দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার মেয়েরা বিকেলের এই সময়টা ছাদে ছাদে কাটিয়ে দেয়। হয়তো ওদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কিংবা এই বিরাট শহরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি মেলে না। অন্তত এ পাড়ার মেয়েদের দেখলে ওর তাই মনে হয়। কিন্তু এই মেঘ-থমথমে সন্ধেবেলায় যখন সব ছাদ খালি হয়ে গেছে তখন ওই মেয়েটি ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অমন করে কী দেখছে? খুব বিষণ্ণ সময় এলেই মানুষ অমন ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারে। মেয়েটিকে এর আগে সে কখনও দেখেনি। ওই হলুদ বাড়িটার ছাদে প্রায় সময় এক বিশাল চেহারার ফরসা মহিলা ঘোরাফেরা করেন। মেয়েটি মাথা নামিয়ে কিছু ভাবল, তারপর এ দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই কী হল কে জানে, একছুট লাগাল মেয়েটি, আর দেখা হল না। অনিমেষ হেসে ফেলল। তপন থাকলে বলত, বালিকা জানে না যে ও মরে গেছে। এই সময় ছটফটিয়ে বৃষ্টিটা নামল। জানলা বন্ধ করে আলো জ্বালল অনিমেষ।

এই ঘরের অন্য খাটটায় থাকে ত্রিদিব—ত্রিদিব সেনগুপ্ত, জামশেদপুরের ছেলে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া অথচ বাংলা কবিতা লেখে। ত্রিদিবের বিছানার দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওর বেডকভারটা খুব দামি, একরাশ নীল রঙের পাখি সেখানে ভিড় করে আছে; দেওয়ালে আঁটা হুকে ত্রিদিবের যে সব জামা-কাপড় ঝুলছে সেগুলো ওর পারিবারিক সাচ্ছল্যের সুন্দর বিজ্ঞাপন। ওর টেবিলের কোণে যে সব প্রসাধনদ্রব্য তা কলকাতায় আসার আগে অনিমেষ দেখেনি। অনিমেষ দেওয়ালে টাঙানো ত্রিদিবের আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। কলকাতার জল পেটে পড়লে মফস্বলের মানুষ নাকি ফরসা হয়ে যায়। অনিমেষ নিজেকে সুন্দর দেখল। সামান্য বড় চুল, খুব অল্প এবং কালচে গোঁফদাড়ি মুখের আদল পালটে দিয়েছে। চোখ আর নাকে আলো পড়তেই চট করে ক'দিন আগে দেখা ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। যুবক রবীন্দ্রনাথের মুখ কি এরকম দেখতে ছিল? ভাবতে গিয়েই লজ্জা পেল সে, দ্যুৎ, রবীন্দ্রনাথের গায়ের রং ভগবানের মতো ছিল।

কলকাতায় দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। কলেজের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সময়টা কম নয় কিন্তু অদ্ভুত নির্জনতা নিয়ে এখনও সে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে

www.MurchOna.com

গেল। কলেজে থাকার সময় সে বাবার আদেশ পুরোপুরি মেনে চলেছে। জলপাইগুড়ি থেকে নিয়মিত দুটো চিঠি প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন নির্দেশ নিয়ে তার কাছে আসে। একটা ঠাকুরদা সরিৎশেখরের, অন্যটা বাবা মহীতোষের। প্রথমবার এই কলকাতায় আসামাত্রই যে ঘটনাটা ওর শরীর-মনে ছাপ রেখেছিল পাকাপাকিভাবে তার কাঁপুনি থেকে নিজেকে সরাতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। ফলে ওই সব চিঠিগুলোর নির্দেশ মান্য করা ছাড়া ওর কোনও উপায় ছিল না। আর তাই এই কলেজের সময়টা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতায় কাটিয়ে দিল।

এই হোস্টেল মূলত কলেজ-ছাত্রদের, কিন্তু প্রাক্তন, যারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তারা ইচ্ছে করলে থাকতে পারে। সেই সুবাদে অনিমেষের এখানে থাকা। ত্রিদিব এখানে নতুন এসেছে। ও কলকাতার বাইরে যে কলেজ থেকে পাশ করেছে সেই কলেজ আর অনিমেষদের কলেজ একই মিশনারিদের সংস্থার অন্তর্গত। তাই প্রাক্তন ছাত্র না হয়েও ওর এখানে থাকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। মিশনারি হোস্টেল বলেই প্রতি বছর বেশ কিছু বিদেশি ছাত্র কলকাতায় পড়তে এসে এখানে থাকে; হোস্টেলের অর্ধেক তারাই। বেশির ভাগই আফ্রিকার, কিছু বর্মা মুলুকেরও আছে। আফ্রিকার ছেলেদের ভাবভঙ্গিতে কোনও সঙ্কোচ নেই, বিদেশে আছে বলে মনে হয় না। বিশাল চেহারাগুলো নিয়ে সব সময় হইচই করছে। প্রথম প্রথম ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত অনিমেষ। যে-কোনও আফ্রিকানকে দেখলেই আঙ্কল টমকে মনে পড়ে যায়। ক্রীতদাস করে রেখেছিল সাদা মানুষেরা এই সেদিন পর্যন্ত অথচ ওদের হাবভাবে সে সব কষ্টের কোনও চিহ্ন নেই। আর একটা স্মৃতি চট করে অনিমেষের সামনে উঠে আসে। আসাম রোডে ছুটে যাওয়া মিলিটারি কনভয়ের নিগ্রো অফিসারটার মুখ যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। লোকটা এখন কোথায় আছে কে জানে। আমরা কাউকে অকারণে মনে রেখে দিই চিরকাল, যার হয়তো আমাদের মনে রাখার কোনও কথাই নেই।

শব্দ করে বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। অনিমেষ দরজা খুলে ভেতরের বারান্দায় এল। হোস্টেলের অনেক ঘর বন্ধ, খোলা দরজাগুলো থেকে আলো এসে বাইরের বৃষ্টিতে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ইউ প্যাটার্নের এই বাড়িটার মাঝখানের বাস্কেটবল কোর্টটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ও পাশের একটা ঘর থেকে মাউথ অর্গানের সুর ভেসে আসছে। টানা এবং কান্নার সুর। আন্তরিক না হলে এ রকম বাজানো যায় না। কোনও চেনা গান বা পরিচিত ভঙ্গি সুরটায় নেই। নিশ্চয়ই ওটা ওই সব আফ্রিকানদের কেউ বাজাচ্ছে; হাজার হাজার মাইল দূরে এসে যার খুব কষ্ট হচ্ছে দেশের জন্য কিংবা ফেলে আসা কোনও মানুষের কথা সে ভাবছে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে হল ছেলেটিকে একবার দেখে আসে। মুশকিল হল ওদের দেখলে সে চট করে আলাদাভাবে চিনতে পারে না, কেউ খুব লম্বা, মোটা অথবা রোগা এইভাবে বুঝতে হয়। তিনতলার বারান্দা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে সেই ঘরটার সামনে এল অনিমেষ। একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, গায়ে পড়ে কথা বলতে কেমন যেন লাগে।

ঘরের ভেতর ছেলেটি একা চিৎপাত হয়ে খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। বেশ ঢ্যাঙা চেহারা, জুতো সুদ্ধু পা দুটো খাটের বাইরে ঝুলছে। ঘরটা দারুণ অগোছালো, সাজগোছ করার কোনও চেষ্টাই নেই। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সে ফিরে আসছিল এমন সময় ছেলেটি বাজনা থামিয়ে উঠে বসে বলল, 'হে-ই!' কথাটা জড়ানো, মানে না বুঝলেও অনিমেষ অনুমান করল যে তাকেই কিছু বলছে ছেলেটি। পরমুহূর্তেই এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকল ছেলেটি, 'গেট ইন, প্লিজ!'

এ বার বুঝতে পারলেও অনিমেষ লক্ষ করল ওর উচ্চারণে একটা মোটা আওয়াজ এমন জড়িয়ে থাকে যেটা অন্য শব্দগুলোকে স্পষ্ট হতে দেয় না। অনিমেষ ভেতরে ঢুকতেই চকচকে সাদা দাঁতে হাসল ছেলেটি, 'ইয়া—!'

ওর আসার কারণটা বোঝাতে গিয়ে বিপদে পড়ল অনিমেষ। মনে মনে দ্রুত ইংরেজি করে নিয়েও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না সে। সঙ্কোচ হচ্ছিল ইংরেজিটা ভুল হতে পারে! শেষ পর্যন্ত সহজ রাস্তাটা বেছে নিল অনিমেষ, আঙুল তুলে মাউথ অর্গানটাকে দেখাল। ছেলেটি যেন খুব খুশি হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বাদ্যযন্ত্রটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ফের লুফে নিয়ে বলল, 'য়ু লাইক ইট?'

'ইয়েস!' অনিমেষ ধাতস্থ হল, তারপর জুড়ে দিল, 'ভেরি সুইট।'

'থ্যাঙ্কু! ইটস মাই ফ্রেন্ড। মাদার গেভ ইট। সিট ডাউন, সিট হেয়ার প্লিজ।'

ওর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে খাটের পাশে রেখে সে অনিমেষকে ইঙ্গিত করল বসার জন্য।

www.MurchOna.com

এর আগে ইংরেজিতে কখনও কথা বলেনি অনিমেষ। জলপাইগুড়িতে যখন ছিল তখন এ প্রশ্ন উঠতই না। ত্রিদিব যখন বাংলা হিন্দি বলতে বলতে নিজের অজান্তে অনর্গল ইংরেজি বলে যায় তখন সেটা লক্ষ করেছে অনিমেষ। অনেক শব্দ যার অর্থ অন্য রকম ছিল, ব্যবহারে তার চেহারা পালটে যায়। এই যেমন ছেলেটি তাকে ভেতরে আসার জন্য বলল, গেট ইন। অনিমেষ নিজে গেট কথাটা ভাবতেই পারত না, বলত কাম ইন। অথচ বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গেটআউট তো স্বচ্ছন্দে মনে আসে। জলপাইগুড়ির বাঙালি স্কুলে ইংরেজি ভাষাটা যেভাবে শিখিয়েছে তাতে নিজের মতো করে কথা বলা যায় না। এই মুহূর্তে সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল।

চতুর্দিকে ছেলেটির রংবেরঙের জামাকাপড় ঝুলছে ওর রুমমেটটি এখনও বোধ হয় ফেরেনি। কেউ যে রঙিন জাঙ্গিয়া পরে জানা ছিল না অনিমেষের। চেয়ারে বসে ছেলেটিকে ভাল করে দেখল সে। চামড়ার রং কালো হতে হতে তা থেকে কেমন নীলচে জেল্লা বেরুচ্ছে। চোখ দুটো ছোট, মাথার চুলে চিরুনি বোলানো অসম্ভব, এত কোঁকড়া এবং পাক খাওয়া বোধ হয় চুল আঁচড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। শরীর ওর বেতের মতো হিলহিলে, সামান্য মেদ নেই কোথাও।

'আই অ্যাম থম্বোটো। রিয়েল গ্ল্যাড টু সি অ্যান ইন্ডিয়ান ইন মাই রুম।'

চকচকে সাদা দাঁত একবার ঝিলিক খেল। এই প্রথমবার, সে যে ইন্ডিয়ান তা কেউ অনিমেষকে বলল। তার হঠাৎ খেয়াল হল থম্বোটোর মাতৃভাষা ইংরেজি নয় অতএব সামান্য ভুলভাল হলে নিশ্চয়ই সে গ্রাহ্য করবে না। অনিমেষ নিজের নাম বলল, এখন কিছুটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে সে।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো স্কটিশেই পড়ো?'

'হ্যাঁ, বি এসসি ফার্স্ট ইয়ার, তুমি?'

'আমি এম.এ-তে অ্যাডমিশান নিয়েছি, এখনও ক্লাশ শুরু হয়নি। আর্টস।'

'ও গড, তুমি তা হলে আমার সিনিয়ার, বাট য়ু লুক সো ইয়াং।' অবাক চোখে তাকে দেখছিল থম্বোটো। সত্যি কি তাকে এম. এ. ক্লাশের ছাত্র বলে মনে হয় না? কী জানি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কেমন লাগছে তোমার?'

'ভালই। তবে ওই মশলা দেওয়া খাবারগুলো যদি না থাকত! দ্যাটস হরিবল। আমার স্টমাক প্রায়ই গোলমাল করছে, এ ম্যান ক্যান নট লিভ অন মেডিসিন। তুমি হোস্টেলে থাকছ কেন, তোমার বাড়ি এখানে নয়?'

'না। আমি এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে ডুয়ার্স বলে একটা জায়গা থেকে এসেছি।'

'সেটা কি ভারতবর্ষ নয়?'

'কেন নয়? এই পশ্চিমবাংলারই একটা অংশ।'

থম্বোটো চট করে টেবিল থেকে একটা বড় ভারতবর্ষের ম্যাপ সামনে বিছিয়ে বলল, 'শো মি হোয়ার ইট ইজ!'

অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে পশ্চিমবাংলার মাথায় জলপাইগুড়ি লেখা অঞ্চলটায় আঙুল রাখল। ও দেখল আলিপুরদুয়ার এবং ফালাকাটা ম্যাপে লেখা আছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ার উল্লেখ নেই। থম্বোটো জায়গাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'এ জায়গা তো হিমালয় পর্বতমালার নীচে, তুমি কি পাহাড়ি মানুষ?'

'না, না, আমি বাঙালি!' হেসে ফেলল অনিমেষ।

'স্ট্রেঞ্জ! তোমাদের এই ভারতবর্ষে স্নো-রেঞ্জ আছে, সমুদ্র আছে, মরুভূমি আছে, আবার ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল উইদ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস একসঙ্গে বাস করছ, কেউ বাঙালি কেউ পাঞ্জাবি আবার সকলেই ইন্ডিয়ান, তোমাদের কোনও অসুবিধে হয় না? কী করে তোমরা ইউনাইটেড হলে?' জানবার আগ্রহ থম্বোটোর মুখে।

অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'আমাদের চেহারা এবং ভাষা আলাদা হলেও কালচারের কোথাও কোথাও এবং ধর্মের মিল রয়েছে। তা ছাড়া ইতিহাস বলে, বার বার বিদেশি-আক্রমণ হয়েছিল আমাদের ওপর। বোধ হয় আক্রান্ত হলেই ইউনিটি গড়ে ওঠে।'

মন দিয়ে কথাটা শুনে থম্বোটো বলল, 'বাট দেয়ার আর হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস, ক্রিশ্চিয়ানও কম নেই। এরা তো কমপ্লিট আলাদা ধর্মের মানুষ এবং প্রত্যেকের মানসিকতা আলাদা, তাই না?'

অনিমেষ একটু থতমত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু ধর্ম তো ঘরের ব্যাপার, বাইরে আগুন লাগলে সেটা ঘরে রেখেই মানুষ আগুন নেবাতে বেরিয়ে আসে।'

www.MurchOna.com

হাসল থম্বোটো, 'তাই যদি হয় তোমরা এত বছর ব্রিটিশকে থাকতে দিলে কেন ? খুব দেরিতে হলেও অবশ্য তোমরা ব্রিটিশকে তাড়াতে পেরেছিলে আর এইটে আমাদের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশগুলোকে সাহায্য করেছিল।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ, ওরা আমাদের হাতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছে।'

বিস্মিত হল থম্বোটা, 'ফ্রিডাম কেউ কাউকে দেয় না, ফ্রিডাম আর্ন করতে হয়। তুমি কি বলতে চাইছ তোমরা ফ্রিডাম আর্ন করোনি ?'

কথাটা অনিমেষকে হঠাৎ উত্তেজিত করে ফেলল। স্কুল জীবনের শেষ দিকে সুনীলদা যে সব নতুন ব্যাখ্যা ওকে শুনিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে, কলকাতায় আসার পর হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সেই শোনা ব্যাখ্যাকে আরও দৃঢ় করেছে। সে বলল, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন পথে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের দিয়ে গেছে। রক্ত না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না আর যদি তা পাওয়াও যায় তা হলে সে স্বাধীনতা সম্পর্কে দেশের মানুষের মমতা থাকে না।' এই প্রথম অনিমেষ প্রকাশ্যে এ সব কথা বলল। এত দিন এই সব বিষয় ওর ভাবনায় ঘোরাফেরা করত। কিন্তু এখন বলার সময় ওর মনে হল নিজের দেশের এই রকম দুর্বল জায়গা নিয়ে একজন বিদেশির সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। থম্বোটো তার নিজের দেশের সমস্যা নিয়ে কোনও কথা বলেনি। এ সব কথা বললে ও নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে এবং সেটা ওর দেশের মানুষ জানুক তা কাম্য নয়। অনিমেষ গলার স্বর পালটে বলল, 'এর মধ্যে অনেকগুলো বছর গেছে, এ বার আমরা পুরনো ভুলগুলো শুধরে নেব। এ বার তোমার কথা বলো, আমরা একই পৃথিবীতে থাকি অথচ তোমাদের দেশের খবর ভারতবর্ষের মানুষ কিছুই জানে না।' থম্বোটো বলল, 'ওয়েল, আমাদের দেশ খুবই গরিব এবং বড়লোকেরা যাকে বলে আনডেভেলপড বোধ হয় তাই। প্র্যাকটিক্যালি আমরা আফ্রিকানরা এত ছোট ছোট স্টেটে ডিভাইডেড যে—।'

ঠিক এ সময় একজন খর্বকায় মানুষ দরজায় এসে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গ ভেজা, পোশাক থেকে টুপটাপ জল ঝরছে, মুখ চোখে খুব বিরক্তি। একে অবশ্য অনিমেষ কয়েকবার দেখেছে, এর মতো বেঁটে এবং রোগা এ হোস্টেলের কোনও আফ্রিকান নয়। তবে এর গায়ের রং নিকষ কালো নয় বরং তামাটে ভাবটাই বেশি। মোটা নাক এবং পুরু ঠোঁট থাকা সত্ত্বেও একটা আলগা শ্রী আছে। মাথার চুলে একটু বেশি স্প্রিং থাকায় বৃষ্টির জলেও এলোমেলো হয়নি। ছেলেটি ঘরে ঢুকে খুব উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে থম্বোটোকে কী সব বলতে লাগল নিজের ভাষায়। থম্বোটো হাসছে কিন্তু কোনও উত্তর দিচ্ছে না। ছেলেটা পাগলের মতো দু'-তিনবার পাক খেয়েও কথা থামাচ্ছে না। ভাষা ঠাওর না হলেও অনিমেষের মনে হল ছেলেটি বোধ হয় এই ঘরে ওকে দেখে রেগে গেছে। আফ্রিকান ছেলেদের ঘরে কোনও ভারতীয়কে সে আড্ডা দিতে দেখেনি, ওরাও কারও ঘরে যায় না। হঠাৎ ছেলেটি অনিমেষের দিকে তেড়ে এসে উলটোদিকের খাটে বসে তড়বড় করে যে কথাগুলো বলল সেটা যে ইংরেজি ভাষায় তা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। অনিমেষ দ্বিতীয়বার ওকে উচ্চারণ করতে শুনল, 'ইউ মাস্ত প্রতেস্ত।' কীসের প্রতিবাদ করার কথা বলছে ও বুঝতে না পেরে অনিমেষ থম্বোটোর দিকে তাকাতেই ছেলেটি একটা আঙুল ওর দিকে উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ লিভ দিস হোস্তেল ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অনিমেষ। একটু আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে ওর রাগের কারণ সে নয়, তা হলে প্রতিবাদ করার কথা বলত না। থম্বোটো এ বার কথা বলল। এই ছেলেটি ওর রুমমেট। আজ বিকেলে এক সদ্যপরিচিতা মহিলার সঙ্গে ওর বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টি এসে যাওয়ায় ওরা হোস্টেলে ফিরে এসে আড্ডা মারবে ঠিক করেছিল। কিন্তু গেটে যে দারোয়ান আছে সে নাকি বাগড়া দিয়েছে এই বলে যে এখানে নাকি মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। যেহেতু এখন আটটা বেজে গেছে তাই ভিজিটার্স রুমটাও বন্ধ ছিল। থম্বোটোর বন্ধু এতে ভীষণ অপমানিত বোধ করছে। তারা কেউ বাচ্চা ছেলে নয়, নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে জানে, এই ধরনের আইন মেয়েদের হোস্টেলে থাকতে পারে কিন্তু ওদের ওপর প্রয়োগ করা মানে রীতিমতো অপমান করা। একটু হেসে থম্বোটো যোগ করল, 'মহিলাটি আমার বন্ধুর মুখ আর দর্শন করবে না জানিয়ে গেছে।'

থম্বোটোর বন্ধু এতক্ষণ চুপ করে কথাগুলো শুনছিল, এ বার চিৎকার করে বলে উঠল, 'শি টোল্ড মি কি-ড।'

অনিমেষ হেসে ফেলল বলার ধরন দেখে। থম্বোটোর বন্ধু চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে নিজের জামাকাপড় খুলতে লাগল। গেঞ্জি-টেঞ্জি পরেনি, নির্লোম তামাটে বুক দেখলে কেউ নিগ্রো

www.MurchOna.com

বলে ভাবতে পারবে না। এর পর সে নির্দ্বিধায় প্যান্টের বোতাম খুলে সেটাকে ছুড়ে দিল ঘরের এক কোনায়। অনিমেষ এতটা আশা করেনি, চট করে একটা অস্বস্তি ওকে বিব্রত করে তুলল। পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে-কোনও মানুষের সামনেই এইরকম জামাকাপড় ছেড়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়ানোর কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এদের কি কোনও সঙ্কোচের বালাই নেই? ওর আশঙ্কা হচ্ছিল এ বার হয়তো জাঙ্গিয়াটাও শরীরে থাকবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটি খুব ঘেন্নার সঙ্গে বলে উঠল, 'ইউ ইন্ডিয়ান আর উইদাউট ব্যাকবোন, কাওয়ার্ড।' এ বার শব্দগুলো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে না হওয়ায় অনিমেষের মাথায় রক্ত উঠে গেল। চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। ওর শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে, দুটো হাতের আঙুল মুঠোয় ধরে রাখতে পারছে না। অনিমেষের মুখ-চোখের ভাব দেখে ছেলেটি বোধ হয় ভয় পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল। থম্বোটো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ছুটে এসে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরল। ওর বিরাট শরীরের কাছে অনিমেষ এই মুহূর্তে অসহায় হলেও প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। জোর না খাটিয়ে থম্বোটো বলল, 'আমার বন্ধুর কথায় কান দিয়ো না, ও ঠিক জানে না কাকে কী বলতে হয়।' তারপর হেসে বলল, 'তুমি রাগ করেছ দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল অনিমেষ। এখন শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। থম্বোটো এসে বাধা না দিলে ও নির্ঘাত ছেলেটিকে মারত। উনি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন আর সেটা সমর্থন না করলে জাত তুলে গালাগাল দেবেন। কোনও রকমে থম্বোটোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অনিমেষ। আজ অবধি কখনও কারও গায়ে হাত তোলেনি সে, ছেলেটাকে মারলে ও নিশ্চয়ই কোনও প্রতিরোধ করতে পারত না। ওরকম দুর্বল শরীর নিয়ে এ ধরনের কথা বলার সাহস পায় কী করে! মারতে পারেনি বলে জীবনে এই প্রথমবার আফশোস হল অনিমেষের। বাইরে এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে, আফ্রিকান ছেলেদের মানসিকতা এ রকম হয় কি না কে জানে, তবে থম্বোটোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই পিছনে ডাক শুনতে পেল সে, 'হেই, হনিমেস।

ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল থম্বোটো আসছে। নিজের নামটার এ রকম উচ্চারণ শুনে বিরক্তিটা যেন সামান্য মরে গেল। কাছে এসে থম্বোটো বলল, 'আমার খারাপ লাগছে। আমার বন্ধুটি কিন্তু খুব নিরীহ, শুধু মেয়েদের ব্যাপারে দারুণ সেনসিটিভ। যা হোক, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছে, তুমি কি আবার আসবে?'

কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে অনিমেষ রাগ করতে পারল না। সে বলল, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' ঠিক এই সময় থম্বোটোর ঘর থেকে একটা উদ্দাম সুর ভেসে এল। মাউথ অর্গানটা যেন ঝড় তুলছে। হেরে যাবে নিশ্চিত জেনে মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, সুরটা সেই রকম তেজি এবং উদ্দাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওরা বাজনাটা শুনল। এই শব্দ করে বৃষ্টিপড়া রাত্রে যখন সমস্ত হোস্টেলটা নিঝুম তখন এই রকম ঝিমঝিমে সুর যেন অবশ করে ফেলছিল ওকে। নিচু স্বরে থম্বোটো বলল, 'আমার চাইতে অনেক ভাল বাজায় ও, না?'

অনিমেষ কী বলবে ঠাওর না করতে পেরে নিজের মনে ঘাড় নেড়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল। যে সুরটা ওর পিছন পিছন আসছিল আচমকা সেটা থেমে যেতেই অনিমেষের মনে হল একটা ভারী নিস্তব্ধতা ওর চারপাশ চেপে ধরেছে। ঘরের শেকল খুলে অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সে। নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে, এই বিরাট কলকাতা শহরে তার কোনও বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। আলো না জ্বেলে ঘরে ঢুকে চুপচাপ খাটে শুয়ে পড়ল সে।

অস্বস্তিটা তবু যাচ্ছিল না। কী সহজে ছেলেটি ওকে গালাগালিটা দিল! থম্বোটো না থাকলে আজ কী হত বলা যায় না। হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ায় যে উত্তেজনা সমস্ত শরীরকে কাঁপাচ্ছিল তাতে সে কতখানি আঘাত করতে পারত কে জানে কিন্তু সেটা করতে পারলে বোধ হয় এখন ভাল লাগত। একটা ছেলে অত দূর থেকে কলকাতায় পড়তে এসে অমন সামান্য কারণে একটা দেশের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে এ রকম ইঙ্গিত দিতে যাবে কোন যুক্তিতে?

নিস্তেজ হয়ে অনিমেষ শুয়ে শুয়ে দরজা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছিল। বারান্দায় জ্বেলে রাখা আলোয় বৃষ্টি মাখামাখি হয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। উত্তেজনা কমে আসায় ক্রমশ এক ধরনের অবসাদ এল। অনিমেষ কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, ইউ ইন্ডিয়ানস আর উইদাউট ব্যাকবোন, কাওয়ার্ড। শব্দগুলো হঠাৎ কেমন নিরীহ হয়ে গেল, সে যেন সামান্য ওপরে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে শব্দগুলোকে দেখতে লাগল। এই তিন বছরে কলকাতা শহরে সে যে জীবন কাটিয়েছে, প্রতিদিনের খবরের

www.MurchOna.com

কাগজে অথবা চারপাশের যে মানুষগুলোকে নিত্য সে দেখেছে তারা কী ধরনের? জলপাইগুড়ি শহর থেকে সেই প্রথমবার ট্রেনে চেপে আসবার সময় ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন কিছু গড়ার জন্য যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে বলে উত্তেজনায় টগবগে হয়েছিল সে, এই কয় বছরে তা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন এই শহরের মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনেই হয় না তারা বা তাদের কেউ কেউ ও সব কথা কখনও ভেবেছিল। গড্ডলিকা প্রবাহ সে বইতে পড়েছিল কিন্তু সেটা কী জিনিস তা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা না দেখলে বুঝত না। মেরুদণ্ডহীন কথাটা কি একদম প্রযোজ্য নয়? এখনও ভারতবর্ষের নব্বুই ভাগ মানুষ জানে না যে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। যারা জানে তাদের অনেকের মানসিকতায় ব্রিটিশ শাসন আর স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

তার কলেজে পড়ার ব্যাপারে মহীতোষের সঙ্গে কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। মহীতোষ চাননি যে অনিমেষ স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতি হোক। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশুনাটা তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া হোস্টেলটা যখন কলেজ কম্পাউন্ডে নয় তখন কলকাতার রাস্তায় ছেলেকে হাঁটাচলা করতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। প্রায় আট মাস বিছানায় শুয়ে থেকে অনিমেষ খুব কাহিল এবং রোগা হয়ে গিয়েছিল, দ্রুত হাঁটাচলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একটু নজর করলেই বোঝা যায় যে সে একটা পা খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বস্তুত কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠানোর ইচ্ছাই চলে গিয়েছিল মহীতোষের। মাসকাবারি রিকশার ব্যবস্থা করে জলপাইগুড়ির বাড়ি থেকে আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ার ব্যাপারেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মানুষের সহজে শিক্ষা হয় না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনিমেষ যে আরও একগুঁয়ে হয়ে গেছে সেটা প্রমাণ হল তার কলকাতায় পড়তে যাওয়ার জেদে। আর একবার ঠাকুরদা সরিৎশেখর তাকে সমর্থন করলেন। দুর্ঘটনা বারবার ঘটে না। প্রায় বাধ্য হয়ে মহীতোষ ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এলেন, এ বার একা ছাড়েননি। প্রেসিডেন্সির পাশেই হিন্দু হোস্টেল, কিন্তু সেখানে ভরতি হওয়ার চেষ্টা বিফল হল। প্রথম ডিভিশনে পাশ করেও যে কোনও কোনও কলেজে জায়গা পাওয়া যায় না সেটা জেনে হতবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। ফলে কলকাতার তিনটি মিশনারি কলেজের দিকে ঝুঁকলেন মহীতোষ, সেন্ট জেভিয়ার্সে মন মানল না। সব দিক দিয়ে দেখেশুনে সেন্ট পল্স্ আসল জায়গা বলে মনে হল। কলেজের মধ্যেই হোস্টেল, রাস্তায় পা দিতে হবে না একবারও। কিন্তু অনিমেষ আকৃষ্ট হল তৃতীয়টিতে। স্কটিশচার্চে বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু পড়েছেন। কে কবে ঘি খেয়েছেন এখন গন্ধ শোঁকার কোনও মানে হয় না—মহীতোষ এই কথাটা বোঝাতে পারেননি। মা-মরা ছেলেরা বোধ হয় চিরকাল এ রকম জেদি হয়। ছেলের সঙ্গে দু'দিন কলেজে গিয়ে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অসহায় বোধ করেছিলেন তিনি। গাদা গাদা মেয়ে রংবেরঙের পোশাকে জটলা করছে কলেজ চত্বরে, তাদের কারও কারও ভঙ্গি বেশ বেপরোয়া। এখানে ছেলের পড়াশুনা কতদূর হবে সন্দেহ থেকে গেল তাঁর। যে চিন্তাটা তাঁকে আরও বিহ্বল করে দিচ্ছিল তা হল সায়েন্সের বদলে অনিমেষ আর্টসে অ্যাডমিশন নিয়েছে। বাবা হয়ে ছেলেকে ডাক্তার করার বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি দেখলেন এখানেও অনিমেষের ঠাকুরদার রায়ই শেষ কথা হল। যাওয়ার আগে বার বার তিনি ছেলেকে উপদেশ দিয়ে গেলেন। পড়াশুনা করে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এই কলকাতা শহর নতুন ছেলেদের নষ্ট করে দেবার জন্য ওত পেতে থাকে, অনিমেষ যেন কখনও অসতর্ক না হয়। কোনও বন্ধুবান্ধবকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না কারণ বিপদের দিনে তারা কেউ পাশে থাকবে না। কলেজের ইউনিয়ন থেকে যেন সে সাত হাত দূরে থাকে কারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলের এই বিলাসিতা সাজে না। রাজনীতি যাকে নেশা ধরায় তার ইহকাল পরকাল একদম ঝরঝরে হয়ে যায়। যাদের বাপের প্রচুর টাকা আছে তারাই ও সব করুক, যেমন জওহরলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস।

বাবার এ সব উপদেশ অনিমেষ মন দিয়ে শুনতে বাধ্য হয়েছিল। সে লক্ষ করেছিল বাবা যখন কথা বলেন তখন তিনি ভুলে যান ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। কিন্তু বাবার একটা কথার সঙ্গে সে একমত, ইতিমধ্যে তার একটা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মণ্টু তপন অর্ক এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। মানুষের জীবন বড় অল্প সময়ের, তা থেকেও যদি একটি বছর অকেজো হয়ে যায় তা হলে সেটা কম ক্ষতি নয়। অনিমেষ মহীতোষকে কথা দিয়েছিল সে সময় নষ্ট করবে না। তাই বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত সে শুধু দেখে গেছে চারধার। স্কটিশচার্চের ছাত্র ইউনিয়ন অবশ্যই ছাত্র ফেডারেশনের দখলে কিন্তু মাঝে মাঝে মিছিল করা ছাড়া তাদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী হল তার জন্য ওরা মিছিল বের করে অথচ কলেজের জলের কলটা তিন-দিন খারাপ হয়েছিল সে দিকে খেয়াল করেনি। অনিমেষ শুধু ওদের দেখে গিয়েছিল এই ক'টি বছর।

www.MurchOna.com

দ্রুত হাঁটা অথবা শারীরিক উদ্যম ফিরে আসতে যে এতটা সময় লাগবে তা সে ভাবেনি, মনে মনে ভেবে যাওয়া ছাড়া তার কোনও উপায় ছিল না। আশ্চর্য, কেউ তাকে কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেনি তার পায়ে কী হয়েছে!

ত্রিদিব কখন এসেছে টের পায়নি অনিমেষ। ঘরে আলো জ্বালতেই চোখে লাগল, হাতের আড়ালে চোখ রাখল। ত্রিদিব একা নয়, সঙ্গে আরও দু'জন এসেছে। খাওয়ার ঘরে ওদের দেখেছে কিন্তু আলাপ হয়নি। এই হোস্টেলে দুটো খাওয়ার ঘর, একটা বিদেশিদের অন্যটা ওদের। কে এই নিয়ম চালু করেছিল জানা নেই তবে এখনও তা চলে আসছে। অনিমেষ উঠে বসতে একটা তীব্র গন্ধ পেল। ত্রিদিবরা দাঁড়িয়ে আছে আর ওদের শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া জলে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। তিনজনেই ভিজে কাক। অনিমেষ ত্রিদিবকে বলল, 'কী ব্যাপার, বৃষ্টিতে ভিজে এলে, অসুখ করে যেতে পারে।'

ত্রিদিব হাসল। বৃষ্টিতে ভিজলে চুলগুলো এমন নেতিয়ে থাকে যে অনেক সময় মানুষের চেহারা পালটে যায়। ত্রিদিবকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, 'আরে এরকম ফাইন বৃষ্টির মধ্যে রোড দিয়ে হাঁটতে যে কী আরাম তা তুমি বুঝবে না। নিজেকে দেওয়ানা মনে হয়।'

'কিন্তু নিমোনিয়া হলে কী হবে?' কথার ভঙ্গিটায় অনিমেষ মজা পেল।

'কবিদের নিমোনিয়া হয় না। ঈশ্বর কবিদের সিনায় এত রকমের ভালবাসা দিয়েছেন যে সেখানে নিমোনিয়া জায়গা পায় না।' কথা বলতে বলতে ত্রিদিব নিজের অস্থিরতা লুকোতে পারল না। এ বার অনিমেষ লক্ষ করল ওরা তিনজনে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ত্রিদিবের গলার স্বরটা একটু অন্যরকম, 'অনিমেষ, মাই রুমমেট, এদের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? নেই? আমরা এই হোস্টেলে থাকি তবু কেউ কাউকে চিনি না, আমরা একই পৃথিবীতে থাকি তবু মানুষের আজও জানাশোনা হল না। এ হচ্ছে দুর্গা—দুর্গাপদ, গোবিন্দ।' আঙুল দিয়ে দ্বিতীয়জনকে দেখাল ত্রিদিব। গোবিন্দ যার নাম সে যখন কথা বলল তখনই গন্ধটার রহস্য বুঝতে পারল অনিমেষ।

'তুমি তো গুডি বয়, এখনও মফস্বলের আলোয়ান গায়ে জড়ানো!'

কথাগুলো জড়ানো, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া প্রতিটি শব্দে। তার মানে ত্রিদিব এবং দুর্গাপদ মদ খেয়েই এসেছে। গোবিন্দর কথায় বিদ্রূপ থাকলেও অনিমেষ জবাব দিল না। এটা জানা কথা, মত্ত হলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা অসংলগ্ন হয়ে যায়, তখন যুক্তি অচল।

সে শুধু ত্রিদিবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মদ খেয়েছ?'

কলকাতার এই প্রবাস-জীবনে ত্রিদিবকে গৃহসঙ্গী পেয়ে খুশি হয়েছিল অনিমেষ। ছেলেটা কবিতা লেখে, অন্য রকম কবিতা, মনটা ভাল। অবশ্যই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু আচরণে কোনও চালিয়াতি নেই। শুধু, অনিমেষের ইচ্ছে হোক না হোক ত্রিদিব ওকে কবিতা শোনাবেই। কিন্তু আজ অবধি ত্রিদিবকে সে মদ্যপান করা অবস্থায় দেখেনি। কেউ মদ খেলেই সেই অনেক বছর আগের দেখা মহীতোষের চেহারাটা ওর সামনে উঠে আসে। মত্ত মহীতোষ আর শীর্ণ চেহারার ছোটমাকে ভুলে গেছে অনিমেষ, তবু—। মানুষ দুঃখ পেলে নাকি মদ খায়, বড়লোকরা মেজাজ আনতে ড্রিঙ্ক করে কিন্তু ত্রিদিবের ক্ষেত্রে তো এ দুটোর কোনও প্রয়োজন আছে তার জানা নেই। তা ছাড়া এই হোস্টেলের যে নিয়মাবলী দরজায় টাঙানো তাতে এ ধরনের আচরণের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

ত্রিদিব কথাটার জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জানলার দিকে। পাল্লা দুটো খুলে দিতে দিতে বলে, 'কেন, মদ খেতে তোমার খারাপ লাগে? পেটে মদ মাথায় বৃষ্টি—লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সৃষ্টি। তুমি খাবে?'

'না।' নিজের অজান্তেই শব্দটা জোরে বলল অনিমেষ।

'কেন গুডি বয়? মদ খেলে মানুষ খারাপ হয়ে যায়?' গোবিন্দ টিপ্পনী কাটল জড়ানো গলায়। অনিমেষ দেখল দুর্গাপদ জামার তলা থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করছে। নাক সিটকে অনিমেষ বলল, 'মদ খেলে মানুষ কী হয় আমি জানি, আমার দেখা আছে।'

দুর্গাপদ খিকখিক করে হাসল, 'অনেকের জামাইষষ্ঠী থাকে না, ভাইফোঁটা নিতে নেই, তোমার বুঝি এরকম ব্যাপার—মদ খেতে নেই!'

www.MurchOna.com

ত্রিদিব জানালা খুলে দিতেই হু-হু করে বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকতে লাগল। অনিমেষ দেখল ওর পড়ার টেবিল জলে ভিজে যাচ্ছে। সে তড়াক করে নেমে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ত্রিদিবের কাছে বাধা পেল। দু'হাত দু'পাশে বাড়িয়ে ত্রিদিব বলল, 'নিয়ম না ভাঙলে নিয়মটাকে বোঝা যায় না, মাই রুমমেট।'

'আমার বইপত্র ভিজে যাচ্ছে।'

'কাল আমি শুকিয়ে দেব।'

অনিমেষ লক্ষ করল ত্রিদিব ভাবাপ্লুত অবস্থায় কথা বললে হিন্দি শব্দ একদম বলে না। যেমন কবিতা লেখার সময় ওর হয়। হাল ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে আসছিল এমন সময় গোবিন্দ ওর সামনে এসে দাঁড়াল, 'ইনডাইরেক্ট না ডাইরেক্ট ?' বোতলটা সামনে ধরে সে ইঙ্গিত করতেই অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'আমি খাব না।'

'তা কি হয়! এক যাত্রায় পৃথক ফল।'

'আশ্চর্য! আমি না খেলে তোমরা জোর করে খাওয়াবে নাকি ?'

ত্রিদিব এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল, 'সংস্কার ভাঙার কথা হচ্ছিল না সেদিন, তুমি নিজেই তো সংস্কারগ্রস্ত। নাও, খেয়ে নাও—লাথি মারো বিবেকের মাথায়।'

'ওটা শস্তা নয়, আমি মরে গেলেও খাব না।' অনিমেষ ফুঁসে উঠল। হঠাৎ কী হল ত্রিদিবের, ওর চোখ মুখ হিংস্র হয়ে গেল। ধস্তাধস্তি শুরু হল বৃষ্টিভেজা ঘরটায়। অনিমেষ ভাবল চিৎকার করে ওঠে। সুপার ছুটে এলে এদের হাত থেকে বাঁচা যাবেই। কিন্তু তারপর যেটা হবে সেটা ভেবে সে চিৎকার করল না। নিঃশব্দ ছিল বাকি তিনজনই। সে কিছুতেই ওই তিন প্রায়-মাতালের সঙ্গে পেরে উঠছিল না। প্রচণ্ড শক্তিতে ওরা অনিমেষকে মাটিতে চিত করে ফেলে মুখের মধ্যে মদের বোতল গুঁজে দিল। গলগল করে নেমে আসা বিশ্রী স্বাদের তরল পদার্থটিকে জিভ দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারল না অনিমেষ। উগরে ফেলতে গিয়ে কিছুটা পেটের ভেতর চলে গেল। জ্বলছে গলা—কী দুর্গন্ধ! অনিমেষ শেষবার দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিরোধ আনছিল। গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা খাচ্ছে না। ঠিক আছে, ওর শাস্তি হল আগাগোড়া ন্যাংটো করা।'

'নগ্নতা কবিতা নয় অথবা আরও কিছু বেশি।' ত্রিদিব বিড়বিড় করে উঠল। ওদের হাত চলছে। দু'জন চেপে ধরেছে অন্যজন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দু'পায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অনিমেষের নিম্নদেশ নগ্ন হয়ে গেল। পরবর্তী আক্রমণ কী হবে সেটা ভাববার আগেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনতে পেল অনিমেষ।

গোবিন্দ বলছে, 'আরে ব্বাস, এ শালার থাইতে এত বড় দাগ কীসের ?' চোখ বন্ধ অনিমেষের শরীরে আচমকা সেই যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে পড়ল। সে শূন্যে সামান্য লাফিয়েই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ত্রিদিব ওকে ছেড়ে দিয়ে অপারেশনের জায়গাটায় হাত দিয়ে অন্য রকম গলায় কথা বলল, 'কী হয়েছিল এখানে ? কীসের দাগ ?'

মুখের ভেতর বিশ্রী স্বাদ, গলা জ্বলছে, সমস্ত শরীরে অবসাদ, অনিমেষ থুতু ফেলার চেষ্টা করে জবাব দিল, 'বুলেটের।'

## দুই

হাঁটুর খানিকটা ওপরে গভীর তামাটে দাগ অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের আদল নিয়েছে। হঠাৎ দেখলে একটু অস্বস্তি হয়। সুন্দর নির্লোম থাই-এর মধ্যিখানে একটা কুৎসিত চিহ্ন সারা জীবন আঁকা থাকবে। সাধারণত ফুলপ্যান্ট পরলে চিহ্নটি কারও চোখে পড়ে না, অনিমেষও সেটা মনের আড়ালে রেখে দেয়। সামান্য পা টেনে হাঁটা ছাড়া এই চিহ্নটি ওকে কোনও পীড়া দেয় না। চোখের বাইরে থাকলেই সব জিনিসের ধার কমে যায়। কিন্তু যখনই ওই প্রসঙ্গ ওঠে অথবা খবরের কাগজে পুলিশের গুলি চালানোর কথা লেখা হয় তখনই অনিমেষের থাই টনটন করতে থাকে। ব্যথাটা আচম্বিতে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়।

কখন জ্ঞান ফিরেছিল অনিমেষ জানে না। মানুষ জলে ডুবে গিয়ে কী দেখে সেটাও অভিজ্ঞতায় নেই। কিন্তু চোখের সামনে অজস্র ঘোলাটে ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে—এ ছাড়া সে কিছু জানে না। প্রথম যখন নিজের অস্তিত্ব টের পেল তখন সে বিছানায়, মাথার ওপরে ছাদ এবং নাকজোড়া কড়া ওষুধের গন্ধ। সামান্য মাথা ঘোরাতে ও বুঝতে পারল এটা হাসপাতাল এবং সবে ভোর হয়েছে।

www.MurchOna.com

কলকাতায় পড়তে এসে যখন শিয়ালদায় নেমেছিল তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। অথচ এই ভোরবেলায় সে হাসপাতালে শুয়ে আছে কেন ? অনিমেষের চিন্তা করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ বন্ধ করে পরিচিত মুখগুলোকে দেখতে চাইছিল। সরিৎশেখর, দাদুকে, ও এক পলকেই লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে দেখল চোখের পরদায়। মহীতোষ, ওর বাবা, গম্ভীর মুখে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে সাইকেল থেকে নামছেন। ছোটমা মাঠের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছেন, ঘোমটা একটু নেমে এসেছে। না, সবাইকে সে মনে করতে পারছে, আলাদা আলাদা করে প্রতিটি মুখের আদল দেখতে পাচ্ছে। আর তারপরেই সিনেমার মতো চোখের পর্দায় জ্বলন্ত ট্রামটা ভেসে উঠল, কিছু ছেলে যেটায় আগুন লাগিয়ে একটু আগে ছুটে গেছে। শব্দ হচ্ছে ট্রামটা থেকে, লকলকে আগুন ট্রামের তার ছুঁয়েছে। বারুদের গন্ধ বাতাসে, অনিমেষ সেই ট্রেনে-পরিচিত বৃদ্ধের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল। কার্ফু শব্দটার কার্যকর ক্ষমতা সে ওই প্রথম দেখল। এমন নিস্তব্ধ মৃত শহরের নাম কলকাতা এটা আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। সেই বৃদ্ধের মুখটা [illegible] পড়ছে না, তিনিও কি—। সঙ্গে সঙ্গে যেন শব্দটা শুনতে পেল অনিমেষ। ট্রামের পাশে দাঁড়ানো [illegible]গুলোকে তেড়ে আসতে দেখে সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। এত অন্ধকার জলপাইগুড়ি শহরে কখনও দেখেনি সে। আর তখনই ওর থাই-এর মধ্যে গরম ছুরি বসিয়ে কেউ যেন শূন্যে ঠেলে দিল। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল অনিমেষ, আর কিছু মনে নেই। না, ঠিক তা নয়, কতগুলো অস্পষ্ট মুখ—কিছু না-বোঝা-কথাবার্তা এর পরে সে শুনেছে। নিজের মায়ের মুখ, ছবিতে থাকা মৃত মায়ের মুখ কি ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল ? একটা গান গাইছিল কেউ, তার সুর বা কথা কিছু মনে নেই। আর তারপরেই কে যেন এসে ভুল নামে তাকে ডেকেছিল, তারা কে ?

'জ্ঞান ফিরেছে।' গলাটা খসখসে কিন্তু ভাল লাগল অনিমেষের। সে চোখ খুলে যাঁকে দেখল তিনি একজন নার্স। সব নার্সকেই একই রকম দেখায়। এঁর চেহারা মোটেই সুন্দরী নয় এটুকু বোঝা যায়। অনিমেষ কথা বলতে চেষ্টা করল, ভীষণ দুর্বল লাগছে, 'আমি কোথায় ?'

'এটা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল। দু'দিন আগে আপনি এখানে এসেছিলেন। এখন আরাম করে ঘুমোন।' নার্স হাসলেন। ওঁর কালো মাড়ি দেখতে অনিমেষের একটুও খারাপ লাগল না। কিন্তু হঠাৎই মনে হল কোমরের নীচ থেকে নিজের পায়ের অস্তিত্ব সে টের পাচ্ছে না। তলাটা যেন অসাড় হয়ে আছে। ব্যাপারটা কী বুঝে ওঠার আগেই শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল এবং পায়ের ওপর রাখা চাদর মাথা অবধি টেনে নেওয়ার মতো হঠাৎই একটা আচ্ছন্নতা ওকে ঢেকে ফেলল।

আবার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। কয়েক মুহূর্তের অস্বচ্ছতা, তারপরেই সব কিছু পরিষ্কার দেখতে লাগল অনিমেষ। তার কাছে কেউ নেই, সেই নার্সটিকেও দেখতে পেল না। কিন্তু ও পাশে বেশ কথাবার্তা চলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল ও পাশের বেডগুলোতে আরও মানুষ শুয়ে বসে আছেন এবং তাঁদের কাছে মানুষজন এসেছেন। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল সে যে এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে তা কি বাড়ির লোকেরা জানে ? অনিমেষ উঠে বসতে গিয়ে যন্ত্রণাটাকে আবিষ্কার করল। সে পারছে না, হাত আঙুল কিংবা মাথা তার ইচ্ছেমতন কাজ করলেও কোমরের নীচে ইচ্ছেটা পৌঁছাচ্ছে না।

আঘাত এবং যন্ত্রণাটা যে গুলি থেকে সেটা এখন স্পষ্ট। কিন্তু কে গুলি করল ওকে ? সেই গলির মধ্যে পালিয়ে যাওয়া ছেলেগুলো না পিছনে ধেয়ে আসা পুলিশ ? সে মনে করতে পারল আঘাতটা পিছন থেকেই এসেছিল এবং সে ধাক্কা খেয়েও পিছনে মুখ ঘোরাতে পারেনি। ট্রামের আগুনে দেখা পুলিশগুলো রাগী গোখরোর মতো তেড়ে আসছিল। কিন্তু হাতে স্যুটকেস আর বেডিং দেখেও কি ওরা বুঝতে পারল না ? খামোকা ওকে পুলিশ গুলি করল কেন ? গুলিটা যদি আর একটু ওপরে লাগত, একটুও অস্বাভাবিক ছিল না—তা হলে ?

'ঘুম ভেঙেছে তা হলে ?'

অনিমেষ দেখল একজন কালো চেহারার স্থূলকায় নার্স ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। সকালের নার্সটি নন। যদিও সব নার্সের পোশাক এক তবু এঁর কথা বলার ভঙ্গি এবং চাহনিতে এমন একটা ব্যাপার আছে যা অস্বস্তি এনে দেয়।

'হাঁ করে কী গিলছ ভাই, তোমার সামনে এখন অনেক পরীক্ষা।'

'পরীক্ষা, কীসের পরীক্ষা!' নিজের গলার স্বর অনিমেষের অচেনা, সে তো এরকম গলায় কথা বলে না। নার্স বললেন, 'তুমি তো আকাশ থেকে পড়েছ, নামটাও লেখা হয়নি, আর পায়ে যে মালটি ঢুকিয়েছিলে সেটা শান্ত ভদ্র ছেলের ঢোকে না। একজন বাবাজি রোজ দু'বেলা এসে তোমার

www.MurchOna.com

খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে। তা আজ যদি কথা বলতে ইচ্ছে না করে চোখ মটকে পড়ে থাকো, আমি গিয়ে বলে দিই জ্ঞান ফেরেনি। খবরদার, চোখ খোলা চলবে না।' একনাগাড়ে কথা বললেও মুখের চেহারা একটুও পালটালেন না মহিলা।

'বাবাজি?' এ সব কিছু হেঁয়ালির মতো লাগছিল অনিমেষের।

'পুলিশ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলে আর বাবাজিদের চিনলে না? দিয়েছে তো পা ফাঁসিয়ে, এখন থাকো বিছানায় শুয়ে। এ বার পুলিশ অন্য ঠ্যাঙটা ধরে টানাটানি করবে। কি, ঘুমুবে না খবর দেব?' মহিলার কথা বলার মধ্যে এমন একটা ঠাট্টার ভঙ্গি ছিল যে, অনিমেষ অসহায় হয়ে পড়ল। সে কাতর-গলায় বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি পুলিশকে কিছু করিনি, আমি কলকাতার কিছু চিনি না।'

'ও সব গল্প আমার কাছে বলে কোনও লাভ নেই।'

কথাবার্তা একদম অস্বাভাবিক। জলপাইগুড়িতে সে কোনও মহিলাকে এরকম কথা বলতে শোনেনি। কলকাতার সব মেয়ে কি এই ভঙ্গিতেই কথা বলে? ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে কলকাতার মানুষদের মনে দয়ামায়া কম, কেউ কারও কথা ভাবে না, স্বার্থপর হয়ে যায় সবাই। কিন্তু নার্সরা এরকম হবে কেন?

জলপাইগুড়িতে তার খবর এখনও পৌঁছায়নি। তার পকেটে অবশ্য এমন কিছু ছিল না যা থেকে কেউ তার ঠিকানা খুঁজে পাবে। অবশ্য স্যুটকেস খুললে সব কিছু পাওয়া যাবে। বাবার বন্ধুকে লেখা চিঠিও ওতে আছে। তা হলে কি স্যুটকেস বেডিং-এর হদিস কেউ পায়নি? ও দুটো হারালে সে কী করবে? তার সব শার্ট প্যান্ট তো ওই স্যুটকেসেই আছে। খুব দুর্বল লাগছে এখন।

'জ্ঞান ফিরেছে?'

অনিমেষ দেখল একজন ডাক্তার—ডাক্তারই, কেন না গলায় স্টেথো ঝোলানো, ওকে প্রশ্ন করছেন। শরীরের পাশে নেতিয়ে থাকা ডান হাতের কবজিটা তুলে পালস্ দেখলেন তিনি, তারপর বললেন, 'পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলবেন না।'

'বাঁধা গৎ।' মোটা গলার চাপা হাসি কানে এল।

'যা বলেন, তবে এ কেসে আর একটু ব্লিডিং হলে বাঁচানো যেত না।' অনিমেষ ডাক্তারকে চলে যেতে দেখল। শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে? অনিমেষের ইচ্ছে করছিল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে তার পা আস্ত আছে কি না? সে নিজে উঠে বসে যে দেখবে তেমন শক্তি নেই। যদি পা বাদ দিয়ে থাকে ওরা তা হলে সে কী করবে? চিরকাল খোঁড়া হয়ে হাঁটা—, মেঝেতে কিছু ঘষটে আনার শব্দ হতে অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একজন রোগা মানুষ কিন্তু কাতলা মাছের মতো মুখ, সবুজ হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা, ও পাশ থেকে একটা টুল ঘষটে খাটের কাছে নিয়ে এল। লোকটার চোখ সে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না; কারণ, নাকের পাশে আর ভ্রূর তলার ঢিপি মাংস সে দুটোকে প্রায় ঢেকে রেখেছে।

'বিপ্লব হল?' মুখের ভেতর চিবিয়ে ছিবড়ে ছুড়ে ফেলেছে এমন ভঙ্গি কথা বলার। প্রশ্নটা বুঝতে পারল না, কীসের বিপ্লব, তার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?

'ফেরেববাজি আমি একদম পছন্দ করি না। যা জিজ্ঞাসা করব চটপট জবাব দেবে, তোমার চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য যে হাসপাতালে শুয়ে আছ।' কথা বলে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসল লোকটা। অনিমেষ দেখল ওর দাঁতগুলো খুব ছোট, চোখের মতো, আছে কি নেই বোঝা যায় না। সে খুব সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'তোমাদের পরিত্রাতা, ঈশ্বর। ঈশ্বরকে চেনো? যার ডাকনাম ভগবান?' বলেই ভেঙচিয়ে উঠল লোকটা, 'আপনি কে? নবাবসাহেব আমাকেই প্রশ্ন করছেন উলটে। একদম না। যা জিজ্ঞাসা করার তা আমিই করব।' হাতের ডায়েরি খুলে প্রথম প্রশ্ন হল, 'বাপ-মা-র দেওয়া নামটা কী?'

'অনিমেষ।' ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভ টানছে অনিমেষের।

'পুরো নাম বলার অভ্যেস নেই নাকি? আচ্ছা ত্যাঁদোড় তো! যেন রবীন্দ্রনাথ, হিটলার, বললেই চিনে ফেলতে হবে। পুরো নাম ঠিকানা বলো!'

অনিমেষ বাধ্য হয়ে লোকটার হুকুম তামিল করতেই খিঁচুনি শুনতে পেল, 'আবার নক্করবাজি! বোম ছুড়লে শ্যালদায় আর ঠিকানা দিচ্ছ সেই জলপাইগুড়ির, ওখান থেকে বিপ্লব করতে এসেছিলে?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ এতক্ষণে বিপ্লব শব্দটার অর্থ ধরতে পারল। সেদিন যে ট্রাম জ্বলছিল, বোম পড়ছিল, লোকটা তাকেই ব্যঙ্গ করছে। নার্স যার কথা বলছিলেন বাবাজি তিনি যে সুবিধের নন সেটা এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর কোনও ভয় লাগছে না অনিমেষের। সে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কেউ সত্যি কথা বলে না, না?'

নো, নেভার। পুলিশদের কারবার সেরা মিথ্যুকদের সঙ্গে। এ বার আসল ঠিকানাটা বলে ফেলো। আরে বাবা, বাপ-মা থাকলে তারা এতক্ষণে হেদিয়ে মরছে, ঠিকানা জানলে আমি খবরটা দিয়ে দেব।' স্নেহ-স্নেহ মুখ করার চেষ্টা করতেই লোকটার চোখের তলার মাংসের ঢিবি নেচে উঠল।

'আমি ঠিকই বলছি। জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় আমি থাকতাম। বাবা স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে কাজ করেন।' কথা বলতে এখন ক্লান্ত লাগছে। লোকটা যদি সত্যিই দাদুকে খবরটা দিয়ে দেয়! ঠিকানা লিখে নিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে আর যারা ছিল তাদের নাম বলো?'

'একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। উনি ফুটপাতে পড়ে গিয়েছিলেন, নাম জানি না।'

'বৃদ্ধ—ইয়ার্কি?'

'আমরা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে এসেছিলাম। স্টেশনে নেমে দেখলাম খুব গোলমাল হচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর উনি আমায় নিয়ে বেরিয়েছিলেন।'

'বেশ, বেশ, বলে যাও।' পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করেও কী ভেবে আবার বুক পকেটে রেখে দিল লোকটা।

'আমি এর আগে কখনও কলকাতায় আসিনি!'

'বাঃ, গুড, চলুক।'

'আমরা যখন রাস্তায় এলাম তখন চারপাশ নিস্তব্ধ আর একটা ট্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছিল।'

'দাউ দাউ করে জ্বলছিল, অ্যাঁ? কেমন লাগল দেখতে?' লোকটা ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'গল্প বানানো সবার ক্ষমতায় আসে না, বুঝলে ছোকরা! আমরা ট্রাম পোড়ানোর জন্য একমাত্র যাকে ধরতে পেরেছি সে হল তুমি। আর তোমার গল্প হল সেই সন্ধেতে প্রথম তুমি কলকাতার মুখ দেখেছ?'

কথা বলার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে, নীরবে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

'কিন্তু চাঁদু, ওই পোড়োবাড়ির আখড়ায়—যেখান থেকে বিপ্লব পরিচালনা করা হচ্ছিল সেখানে তোমাকে পাওয়া গেল কী করে? সব তখন ভোঁ ভোঁ, ওনলি তোমার হাফ-ডেড বডি পড়েছিল তো?' যেন আসল জায়গায় এতক্ষণে হাত দিয়েছে এমন ভঙ্গি করল লোকটা।

অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। চেতনায় অস্পষ্ট হলেও তার মনে আসছে কারা যেন তাকে চ্যাংদোলা করে ছুটে যাচ্ছিল। তারপর কেউ ভুল নামে ওকে ডেকেছিল—। সে চোখ না খুলেই বলল, 'আমি জানি না, আমার কিছু মনে নেই। এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে যেটা সে ঠাওর করেনি সেটাই ঘটে গেল। হঠাৎই যেন তার পায়ের তলায় মাটি সরে যেতে সে তলিয়ে যাচ্ছিল। সে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেও সব কিছু নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে হু হু করে নীচে নেমে গেল এবং তারপর সব অন্ধকার।

ঠিক কত ঘণ্টা জানা নেই, ঘুম থেকে ওঠার মতো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চোখ খুলল অনিমেষ। এখন বেশ ভাল লাগছে, গতকাল জ্ঞান ফেরার পর যে অবসাদ সমস্ত শরীরে জড়িয়েছিল সেটা এখন নেই। দুটো হাত মাথার ওপর এনে সে দেখল বেশ জোর পাচ্ছে, কিন্তু উঠে বসতে গিয়ে খচ করে কোমরে লাগতেই প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে গেল থাইতে। কিছুক্ষণ মুখ বুজে শুয়ে থেকে যন্ত্রণাটাকে কমিয়ে আনল অনিমেষ। হাত দিয়ে যেটুকু পারে বুলিয়ে সে বুঝতে পারল তার পা দুটো আস্তই আছে, মনে হয় কেউ বাদ দেয়নি। হ্যাঁ, পায়ের আঙুলগুলো সে নাড়াচাড়া করতে পারছে। অদ্ভুত স্বস্তি এল মনে, কী আরাম! ওর নাকি খুব ব্লিডিং হয়েছিল? যারা তাকে গলি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা কি অযত্ন করেছে? নাকি পুলিশই দেরি করেছে তাকে হাসপাতালে ভরতি করতে?

অনিমেষ দেখল, ও পাশের বেডে একজন বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে আছেন। খুব রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা। চোখাচোখি হতেই ফোকলা মুখে সরল হাসি হাসলেন, 'তা হলে ঘুম ভাঙল, কেমন বোধ করছ বাবা?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ভাল।

'কাল বিকেলবেলায় সেই লোকটা খুব খিচোচ্ছিল বুঝি? আমি নার্সকে বললাম, কেন এ সব লোককে ঢুকতে দেন? তা সে মাগি জবাব দিল লোকটা নাকি পুলিশ। তা বাবা, কী করেছিলে,

www.MurchOna.com

ডাকাতি না ছেনতাই ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'ও সব কিছু নয়।'

অনিমেষ দেখল, এটা একটা বিরাট হলঘর। তার বিছানা, একদম দেওয়াল ঘেঁষে। এক পাশে সাদা দেওয়াল, অন্য পাশে সারি সারি বিছানা। অনিমেষের মনে হল, বৃদ্ধের বসে থাকার ভঙ্গিটা খুব স্বাভাবিক নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওভাবে বসে আছেন কেন ?'

'শুতে পারি না ভাই, শুলেই শরীরের সব হাড় পটাপট গায়ের মধ্যে ফোটে। না খেতে পেয়ে মাংস বলে তো কিছু নেই। আবার লোকে যেভাবে বসে থাকে সেভাবে বসলে খচখচ করে। এই যে উচ্চিংড়ের মতো বসে আছি—এটাই আমার আরাম।' তারপর মাথা দুলিয়ে ফাঁকা মাড়িতে একগাল হেসে বললেন, 'সকলে মিলে যে নিয়মটাকে তৈরি করে আমরা সেটাকেই স্বাভাবিক বলি। কেউ কেউ যদি নিজের মতো কিছু করে নেয় সেটা চোখে ঠেকলেও জেনো তাতেই তার আরাম।'

পায়ের শব্দে অনিমেষ দেখল গতকালের সেই অসুন্দর অথচ ভাল লাগা নার্সটি এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেই কথা বলল সে, 'এখন ভাল আছি।'

'খুব ঘুমিয়েছেন!' তারপর খাটের পিছনে টাঙানো একটা কাগজ দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্রে জ্বর এসেছিল ?' মহিলা ঝুঁকে পড়ে ওর কপাল ছুঁয়ে বললেন, 'না, এখন টেম্পারেচার নেই।' অনিমেষ অবাক হল। ঘুমের মধ্যে তার কখন জ্বর এল আবার চলেও গেল সে টের পায়নি। মহিলা সতর্ক করলেন, 'এখন নড়াচড়া একদম বন্ধ। যদি আবার হাঁটতে চান হাড়টা এমন জায়গায় ফেটেছে যে অবাধ্য হলে আর জোড়া লাগবে না। খুব ভাগ্য যে বেঁচে গেছেন।'

অনিমেষ মহিলার দিকে তাকাল। ছোট্ট শান্ত মুখ, গলার স্বরে দূরত্ব নেই। টুকটাক কাজ সেরে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে তো কিছুই নেই যা দিয়ে একটু পরিষ্কার হবেন। হাসপাতালে ও সব কিছু পাওয়া যায় না। বাড়িতে খবর গেছে ?'

'জানি না, কাল একজন পুলিশ এসেছিল—ওরা যদি খবর দেয়।' বলতে বলতে সে দেখল, ও পাশের অনেক বিছানার চারপাশে কাপড়ের ঘেরাটোপ, সম্ভবত প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলো প্রকাশ্যে করা থেকে আড়ালের ব্যবস্থা। আশ্চর্য, অনিমেষ নিজে ওরকম তাগিদ অনুভব করছে না এখন আর করলেও এই মহিলার সামনে মরে গেলেও—।

ঠিকানাটা বলুন, দেখি হাসপাতাল থেকে চেষ্টা করে যদি খবর দেওয়াতে পারি।' মহিলা টুলটাকে টেনে নিয়ে পাশে বসলেন। অনিমেষ এ বার অনুভব করল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার চোখ দুটো ভারী, সম্ভবত সেখানে পিচুটি জমেছে। কোনও মহিলার দিকে এই চোখে তাকানো অস্বস্তিকর। সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় আমার বাড়ি।'

'জলপাইগুড়ি! ওমা, সে তো অনেক দূরে। কলকাতায় আপনি কোথায় থাকতেন ?'

'যে দিন গুলিটা লাগল সে দিনই আমি প্রথম কলকাতায় এসেছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারছি না। কলকাতার কিছুই চিনি না আমি। বাবার এক বন্ধু এখানেই থাকেন, তাঁর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। এই যাঃ, পুলিশকে ওঁর ঠিকানাটা বলতেই ভুলে গিয়েছি।' অনিমেষের সত্যি আপশোস হল।

'কী ঠিকানা ?'

'সাত নম্বর হরেন মল্লিক লেন, কলকাতা—কলকাতা বারো বোধ হয়। বাবার বন্ধুর নাম দেবব্রত বাবু, ওঁকেও আমি কখনও দেখিনি।' অসহায়ের মতো তাকাল সে।

'কলকাতা বারো ? তা হলে তো এই এলাকা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খবর দিয়ে দেব।'

'আপনি নিজেই দেবেন ?'

'দিলামই বা। আপনি আগে কলকাতায় আসেননি।' হেসে উঠলেন, 'আপনাকে আপনি বলতে আমার খারাপ লাগছে, একদম বাচ্চা ছেলে, আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে তুমি বলবেন। আমার নাম অনিমেষ।'

'এখানে কী জন্য আসা হয়েছিল ?'

'পড়তে। আমি এ বার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।'

'দেখো কী কপাল! এ বছরটা নষ্ট হয়ে গেল তো!'

'নষ্ট হল মানে ? আমি কি হাঁটতে পারব না ?'

'পারবে না কেন ? তবে অনেকদিন বিছানায় আটকে থাকতে হবে। হাঁটুর ওপরের হাড়টা ফ্র্যাকচার হয়েছিল, বয়স অল্প বলে জুড়ে যাবে। তুমি তো মরেও যেতে পারতে।'

www.MurchOna.com

কথা শেষ করতেই ও পাশের একজন রুগি কিছু চেঁচিয়ে বলতে মহিলা উঠে তাঁর কাছে চলে গেলেন। অনিমেষ শিথিলভাবে শুয়ে রইল। ভীষণ মন খারাপ লাগছে।

দুপুরে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল, কিন্তু গরমে জামা ভিজে গেছে, ঘেমো গন্ধ বেরুচ্ছে বিছানা থেকে—গা ঘিনঘিনে ভাবটা আর ঘুমুতে দিচ্ছিল না ওকে। পাশের বেডের বৃদ্ধ সেই রকম ভঙ্গিতে বসে বসেই দুপুরটা ঘুমুলেন। এখন ওয়ার্ডে কেউ হাঁটাচলা করছে না। মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসছে বাইরে থেকে। খাওয়ার সময় বৃদ্ধের মুখে শুনে সে জেনেছে ওটা ট্রামের শব্দ। খাওয়া—অনিমেষ কোনও দিন চিন্তাও করেনি এ ভাবে শুয়ে শুয়ে মানুষ খেতে পারে। এমনকী প্রাকৃতিক কাজগুলো পর্যন্ত এই বিছানায় সারতে হল। ভাগ্যিস তখন কোনও নার্স ছিল না, জমাদার টাইপের একটা লোক অনিমেষকে খুব সাহায্য করেছে। ট্রামের শব্দটা শুনে ওর মনে হল, কলকাতা শহরের বুকে সে শুয়ে আছে, কিন্তু একটা চলন্ত ট্রাম সে দেখতে পেল না। এখন নাকি কলকাতা একদম স্বাভাবিক, রাস্তায় বন্দুক হাতে পুলিশ নেই। কেউ বোম ছুড়ছে না, ট্রাম পোড়াচ্ছে না। কলকাতা শহর যেমন হঠাৎই ফুঁসে ওঠে তেমনি চটজলদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বৃদ্ধের মুখে এ খবর শুনে অনিমেষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে জন্য আন্দোলন হয়েছিল তা যেমনকে তেমনই রয়েছে। এ রকম ভালুক-জ্বরের মতো আন্দোলন করে কার কী লাভ হয়? আবার এমনও তো হতে পারে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে এর প্রকৃত কারণটা ধরতে পারছে না। কলকাতাকে জানতে হলে এই শহরে মিশে যেতে হবে। অসহায়ের মতো অনিমেষ নিজের পায়ের দিকে তাকাল।

কোথাও যেন ঘণ্টা বাজল ট্রেন ছাড়ার আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের বিছানার মানুষেরা নড়েচড়ে বসতে লাগল। এটা তা হলে ভিজিটার্স আওয়ার। রোগীদের আত্মীয় বন্ধুরা আসছে। সে দেখল বৃদ্ধের কাছে কেউ আসেনি এবং তাতে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। উনি তেমনি উবু হয়ে বসে সব দেখছেন। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই একটা অপরিচিত গলায় নিজের নাম শুনে তাকে চোখ খুলতেই হল। একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। ফরসা মাথার পাতলা চুল, লম্বা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা। ওকে চোখ খুলতে দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম অনিমেষ?'

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল সে।

'কোথায় বাড়ি?'

'জলপাইগুড়ি।' ইনি কে? দেখে তো পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না।

'বাবার নাম কী?' ভদ্রলোক খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

'মহীতোষ–' কথাটা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক। যেন উত্তর পেয়ে গেছেন, আর প্রয়োজন নেই এমন ভঙ্গিতে হাত তুলে হাসলেন, 'আসার কথা ছিল আমার বাড়িতে, তার বদলে চলে এলে এই হাসপাতালে! কী আশ্চর্য!'

এ বার অনিমেষ অনুমান করল ভদ্রলোকের পরিচয়, 'আপনি–।'

'তোমার বাবার বন্ধু দেবব্রত মুখার্জি। সাত নম্বর হরেন মল্লিক লেন এখান থেকে দু' পা রাস্তা কিন্তু ওই নার্স মহিলা যদি না যেতেন তা হলে জানতেই পারতাম না। ওঁর কাছেই সব শুনলাম, কী গেরো বলো দেখি। বিধিলিপি কে খণ্ডাবে! আমি তোমার বাবার টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম যে দিন তোমার আসার কথা তার পরের দিন। কী ডাক ব্যবস্থা বোঝো! তা পেয়ে অবধি দুশ্চিন্তায় অস্থির, এই বিরাট শহরে কোথায় আছ কে জানে! তা আজ খবর পেয়েই মহীকে টেলিগ্রাম করলাম চলে আসার জন্য। এখন কেমন আছ?' ভদ্রলোকের কথা বলার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, অনিমেষের ভাল লাগল। সে বলল, 'শুধু এই পা-টা–।'

'ঠিক আছে, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।' বলে দেবব্রতবাবু মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের আলাপ করিয়ে দিই—নীলা, এ দিকে আয়।'

এতক্ষণে অনিমেষ লক্ষ করল, দেবব্রতবাবু একা নন, একটি লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। যদিও গায়ের রং চাপা তবু ওকে দেখলে চট করে উর্বশীর কথা মনে পড়ে যায়। জলপাইগুড়ির বিরাম করের মেজ মেয়ে উর্বশী এখন কলকাতায় আছে।

'আপনার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে অবধি বাবা ছটফট করছেন, পারলে সেই দুপুরেই ছুটে আসতেন।' রেডিয়োর ঘোষিকারা যেভাবে কথা বলে থাকেন সেই ভাবে বলল মেয়েটি।

'অনিমেষ খুব ভাল ছেলে, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। নীলাও এ বার পাশ করেছে, বুঝলে। বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ ভরতি হয়েছে। আচ্ছা নীলা, তুই একটু ওর কাছে বস, আমি ডাক্তারদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। দেবব্রতবাবুকে সত্যি চিন্তিত দেখাচ্ছিল, তিনি চলে গেলেন।

কী কথা বলবে অনিমেষ বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ কর থাকল। নীলাও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় অনিমেষ বলল, 'আমার বোধ হয় কলেজে ভরতি হওয়া হবে না।'

'আগে সেরে উঠুন তো। যেমন চটপট পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন! মফস্বলের লোক তো—।' হাসল নীলা।

'কলকাতার লোকেরা বুঝি খুব বুদ্ধিমান হয়?'

'হয়ই তো। যাক, বাবা চাইছিলেন আজই আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। কিন্তু নার্স যা বললেন তাতে কী হবে কী জানি!'

'আপনাদের বাড়িতে এ অবস্থায় গেলে অসুবিধে করব।'

'বাব্বা, খুব জ্ঞান দেখছি।'

'এখন এ কথা বলছেন পরে অসহ্য হবে।'

'তাই নাকি! এত জেনে বসে আছেন। বরং হয়তো উলটো ব্যাপার হবে।'

'তার মানে?'

'আমার নাম শুনলেন তো?'

'নীলা!'

'জানেন তো, ওটা কারও কারও সহ্য হয় না।'

## তিন

দেবব্রতবাবু খুব কাজের মানুষ। নইলে পুলিশ এত সহজে হাত গুটিয়ে নিত না। অনিমেষ শুনল, লালবাজারে দেবব্রতবাবুর খুব জানাশোনা আছে। কী করে কী হল অনিমেষ জানে না কিন্তু সেদিনের পর আর কোনও পুলিশ ওর সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। ব্যাপারটা জেনে দেবব্রতবাবুর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

হাসপাতালে এখন সে অনেকটা স্বচ্ছন্দ। দেবব্রতবাবু সেদিনই দুটো শার্ট আর পাজামা কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন নীলা একটা ছোট বাস্কেটে তোয়ালে সাবান আর পাউডার এনে দিয়েছে। একইভাবে দীর্ঘদিন শুয়ে থাকলে নাকি পিঠে ঘা হয়ে যায় তাই পাউডারের ব্যবস্থা। শরীরটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় অনিমেষের মেজাজ ভাল হল। শুধু এই একভাবে শুয়ে থাকাটাই অস্বস্তিকর। ঘুম আসে না, বদলে আজেবাজে চিন্তার ভিড় জমে। নীলার মা কখনও আসেনি। কিন্তু নীলার সঙ্গে কথা বলতে অনিমেষের রীতিমতো ভয় করে। যদিও দেবব্রতবাবু সামনে থাকলে নীলার কথাবার্তা খুব সাধারণ হয়ে যায়, বোঝা যায় রেখেঢেকে কথা বলছে। কিন্তু একা থাকলেই এমন ভঙ্গি করে তাতে সে যে কলকাতার মেয়ে, অনেক বেশি জানে অনিমেষের চেয়ে, এটা বোঝাতে কসুর করে না। অনিমেষ আন্দাজ করে ওদের সংসার বেশ সচ্ছল, নীলা নিত্য পোশাক পালটে আসে, দেবব্রতবাবুকে রোজ ইস্ত্রিভাঙা পাঞ্জাবি পরতে দেখেছে সে। বাবা তো চিরকাল স্বর্গছেঁড়ায় রয়ে গেলেন, এদের সঙ্গে কী করে আলাপ হল কে জানে! ওদের পরিবারের কোনও মেয়ে রোজ রোজ অপরিচিত কোনও ছেলেকে দেখতে হাসপাতালে আসত না।

মহীতোষ যে বিকেলে এলেন সেই দিনই মৃত্যু দেখল অনিমেষ। নিজের মাকে যে চোখের সামনে একটু একটু করে মরে যেতে দেখেছে তার কাছে মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এই ঘটনাটা একদম অবাক করে দেবার মতো। সকালে নার্স সবাইকে দেখাশোনা করছেন তখনই ওঁর নজরে পড়ল অনিমেষের পাশের বেডের বৃদ্ধ টানটান হয়ে শুয়ে আছেন। নার্সদের ডিউটি রোজ এক সময়ে থাকে না, আজকে যিনি আছেন তিনি গম্ভীর মুখের এবং অনিমেষ তাকে হাসতে দেখেনি। মহিলা বৃদ্ধের পাশে গিয়ে ঝুঁকে শরীরে হাত ছোঁয়ালেন, একবার নাড়ি দেখলেন, তারপর পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদরটা টেনে মুখ অবধি ঢেকে জুতোয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

আচমকা একটা মানুষকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় অনিমেষের শরীর কেঁপে উঠল। চোখের সামনে জুড়ে থাকা ওই সাদা কাপড়টা যেন নিষ্ঠুর হাতে জীবনকে সরিয়ে দেয়। ওর মনে পড়ল বৃদ্ধ বলেছিলেন যে স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকলে ওঁর সর্বাঙ্গে হাড় ফোটে। তাই এক উদ্ভট ভঙ্গিতে বসে

www.MurchOna.com

থাকতেন, সেই ভাবেই ঘুমুতেন, আরাম তৈরি করে নিয়েছিলেন মনের মতো। অথচ এখন কী নিশ্চিন্তে সর্বাঙ্গ বিছিয়ে শুয়ে আছেন। মানুষটা যে কখন নিঃশব্দে চলে গেল সে টের পায়নি দু'হাত দূরে শুয়ে থেকেও। হঠাৎ সে লক্ষ করল নার্স চলে যাওয়ার পর এই ঘরে আর কোনও শব্দ হচ্ছে না। সবক'টা বেডের মানুষ এই দিকে চুপচাপ তাকিয়ে। এঁরা প্রত্যেকেই জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে হোঁচট খেয়ে হাসপাতালে এসেছেন মেরামতের জন্য। কিন্তু মুশকিল হল মৃত্যুর দরজাটা এখান থেকে এত কাছে, বড় কাছে! হঠাৎ কেউ শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় 'হরি হে নারায়ণ' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনিমেষের মনে হল বৃদ্ধের শরীর থেকে নির্গত আত্মা এখনও এই ঘরে পাক খাচ্ছে আর তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই ওই তিনটি শব্দ অঞ্জলির মতো ছুড়ে দেওয়া হল। এই বৃদ্ধের কোনও আত্মীয়কে সে দু'দিনে দেখেনি। পৃথিবীতে জন্মে এত বয়স ভোগ করে চুপচাপ চলে যাওয়ায় পৃথিবীর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। এত কষ্ট পাওয়া অথবা কাউকে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার ছিল ওই বৃদ্ধের যদি চুপচাপ মৃত্যুর কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়! সে দিন সেই অন্ধকার গলিতে পুলিশের বুলেট যদি আরও কয়েক ইঞ্চি ওপরে ছুটে আসত তা হলে অনিমেষেরও ওই একই হাল হত। খুব বিরক্তিতে মাথা নাড়ল অনিমেষ, না, এই রকম চুপচাপ সে মৃত হয়ে যাবে না।

এ দিন আর একটা ঘটনা ঘটল। এগারোটা নাগাদ অনিমেষ দেখল ওর বেডের দিকে একটি ছেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখ পড়ায় চমকে উঠেছিল সে, সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, মনে হয়েছিল সুনীলদা এগিয়ে আসছে। যে মানুষটাকে ওরা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে জলপাইগুড়ির শ্মশানে দাহ করে এল সে কী করে এখানে আসবে? সে দেখল পঁচিশের নীচে বয়স, পাজামা আর হ্যান্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবি পরনে ছেলেটি ঘরে ঢুকে অন্য বেডগুলো একবার দেখে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কলকাতা শহরের কোনও ছেলেকে অনিমেষ চেনে না। ছেলেটি ওর বেডের পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল খানিক, তারপর বলল, 'এখন তো আপনি সুস্থ মানে কথা বললে অসুবিধে হচ্ছে না, তাই তো?'

অনিমেষ নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'আপনি একটু সুস্থ না হলে আসতে পারছিলাম না। ওদের বুলেটটা নিচু হয়ে এসেছিল এটুকুই যা সান্ত্বনা। আপনার সব খবর আমি জানি, দু'দিন জ্ঞান ফেরেনি, প্রচুর ব্লিডিং হয়েছিল।' সামান্য জড়তা নেই কথায়, অপরিচিত শব্দটা কথা বলার ভঙ্গিতে নেই।

'আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।' সরাসরি বলে ফেলল অনিমেষ।

'কী করে চিনবেন? তখন তো আপনার হুঁশই ছিল না। শুধু মা মা বলে গোঙাচ্ছিলেন।' হাসল ছেলেটি, 'যাক, আপনার জ্ঞান না ফিরলে আসতে পারছিলাম না। তারপর শুনলাম পুলিশ নাকি এমন মগজ ধোলাই করেছে যে আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। ও কি সেই ছেলেগুলোর একজন যারা ট্রাম পুড়িয়েছিল? এই মুহূর্তে যদি সম্ভব হত অনিমেষ উঠে বসত। ওর চোখ-মুখে এক ধরনের উত্তেজনা ফুটে উঠল, 'আপনারা আন্দোলন করছিলেন?'

ওর এই হঠাৎ উত্তেজিত ভাবটা লক্ষ করেও ছেলেটি খুব সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'পুলিশ আপনাদের ধরতে পারেনি?'

'না!' বলেই হেসে উঠল ছেলেটি, 'তা হলে এখানে এলাম কী করে? আপনার সঙ্গে পরিচিত হই, আমার নাম সুবাস সেন। চাকরিবাকরি পাইনি এখনও, টিউশনি করি কয়েকটা। আপনার নাম তো অনিমেষ, এ বারে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হতে এসেছ?'

আর একবার অবাক হল অনিমেষ। এ সব কথা সুবাস জানল কী করে? সে লক্ষ করল সুবাস বাক্যটা আরম্ভ করেছিল আপনি বলে, শেষ করল তুমিতে।

টুলটা নিয়ে এসে সুবাস বলল, 'তোমার স্যুটকেস খুলে এ সব জানতে পারলাম। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি আমাদেরই দলের লোক। যাক, বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে এখান থেকে?'

বিহ্বল অনিমেষ সময় নিল কথা বলতে, 'হ্যাঁ, বাবার এক বন্ধু দিয়েছেন, পুলিশও দিতে পারে।' তারপরই সে প্রশ্নটা ছুড়ল, 'আপনাদের আন্দোলন এখনও চলছে?'

সুবাস প্রশ্নটা শুনে অনিমেষকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল। কী বুঝল অনিমেষ জানে না। তবে সন্দেহ ছিল ওর চোখে, 'যতক্ষণ আন্দোলনটা আমাদের সবাইকার না হবে ততক্ষণ তার জীবন কয়েক ঘণ্টা

www.MurchOna.com

কিংবা দিনের। আমরা শুধু সরকারকে খুঁচিয়ে একটু বিরক্ত করতে পারি কিন্তু সেটাকে বৃহৎ ব্যাপারে নিয়ে যেতে পারি না। তাই সেদিন গুলি চলল, ট্রাম পুড়ল, কাগজে হেডিং হল কিন্তু মানুষের অবস্থা একই রয়ে গেল। তুমি রাস্তায় বেরুলে দেখবে জীবন একদম স্বাভাবিক, সে দিনের কথা কারও খেয়ালে নেই।'

অনিমেষ মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সে দিন কী ধরনের আন্দোলন তার বিস্তৃত বিবরণ সুবাসের মুখে শোনে। কিন্তু সঙ্কোচ হল এ বার, কী মনে করবে বলা যায় না। তাই যে প্রশ্নটা নিজের কাছে অস্পষ্ট সেটাই ও জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কীসের জন্য আন্দোলন করছেন?'

সুবাস ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল, তারপর বলল, 'জলপাইগুড়িতে তুমি কি বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলে?' অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না।

'আজ থাক। পরে একদিন আলোচনা হবে। তোমার জন্য দুঃখিত, কলকাতায় পড়তে এসে কী হয়ে গেল! কত দিনে সারবে বলছে?'

'এখনও বলেনি তবে বাবার বন্ধু বলছেন বেশি দিন লাগবে না।' ওকে উঠতে দেখে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। সুবাসের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভাল লাগছে।

সুবাস বলল, 'তোমার স্যুটকেস আর বেডিং নীচের এনক্যুয়েরিতে জমা দিয়েছি আজ। মনে হয় ওরা কিছু সরাবে না, দেখে নিয়ো সব ঠিক আছে কি না!'

যেন ঝিনুক খুলেই মুক্তো পেল অনিমেষ। হারানো জিনিস দুটো সুবাস জমা দিয়ে গেছে জেনে ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। কলকাতা শহরের কোনও মানুষ একটা দায়িত্ব নিজে থেকে নেবে সে কল্পনা করতে পারেনি। এখানকার মানুষের হৃদয় নেই, বিশ্বাস শব্দটা এই শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ সবই শুনে এসেছে এতকাল। অথচ ওর আহত শরীরটাকেই ওরা শুধু তুলে আনেনি, গলির ভেতর ছিটকে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে হাসপাতালে জমা করে দিয়ে গেছে—অনিমেষের বুক ভরে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আবার আসবেন তো?'

'তোমাকে এরা কবে ছাড়বে কিছু বলেছে?'

'না।'

'যদি উপায় থাকে তবে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়াই ভাল। ভারতবর্ষের হাসপাতালগুলোর সঙ্গে মর্গের কোনও পার্থক্য নেই। বিকেলে আমার সময় হবে না, এলে এই সময় আসব।'

'এই সময় ওরা আসতে দেয়?'

'এসেছি তো। আমি সব জায়গায় যেতে পারি, ব্রিটিশ আমল হলে লাটসাহেবের শোওয়ার ঘরেও ঢুকে যেতে পারতাম। চলি।' কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এল সুবাস, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। কাগজে বেরিয়েছে প্রথম সারির একজন নেতাকে পুলিশ নাকি আহত অবস্থায় ধরেছে বলে দাবি করেছে। কিছু না পেয়ে ওরা পুতুলকে মানুষ বলে চালাচ্ছে। ওরা যদি আবার প্রশ্ন করে জবাব দিয়ো না।'

অনিমেষ সরল মনে জানাল, 'পুলিশ তো অভিযোগ তুলে নিয়েছে, ওরা আমার কাছে সে দিনের পর আর আসেনি। বাবার বন্ধু দেবব্রতবাবু এটা ম্যানেজ করেছেন।'

একটু অবাক চোখে অনিমেষকে দেখল সুবাস, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'দেবব্রতবাবু কী করেন?' কথাটার মধ্যে একটুও স্বাভাবিকতা নেই, অনিমেষের অস্বস্তি হল, 'জানি না, তবে এখানকার পুলিশের সঙ্গে ওঁর খুব জানাশোনা আছে।'

'ও। তবে আর চিন্তা কী!' কথাটা বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল সুবাস।

মন খারাপ হয়ে গেল অনিমেষের। যে উপমাটা এইমাত্র সুবাস দিয়ে গেল সেটা মনের সব আনন্দ নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু সে কোনও সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দেয়নি তাই পুতুল হয়ে গেল? আর দেবব্রতবাবুর কল্যাণে পুলিশ যে হাত গুটিয়ে নিয়েছে এতে তার অপরাধ কোথায়? কিন্তু সুবাসের মুখের ভাব স্পষ্ট বলে দিল কথাটা শুনে সে একটুও খুশি হয়নি। ও পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। এখন কড়া রোদ। সুবাস নিজে থেকে না এলে তার দেখা পাওয়া আর সম্ভব নয়। পাশের বেডে এখনও সেই বৃদ্ধ চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। সুবাস কি একটা মৃতদেহের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছিল?

দুপুরবেলায় ঘুম এল না। আজকাল অবশ্য এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বিছানা এখন ফাঁকা। এমনকী বেডকভার না থাকায় ময়লা তোশকটা বিশ্রী দাঁত বের করে হাসছে। ও দিকে চোখ রাখা যায় না। সুবাসের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর অনিমেষের মন কেমন ভার হয়ে আছে। সুবাস ওর

চেয়ে বয়সে খুব একটা বড় নয় অথচ ওর সঙ্গে কথা বললে নিজেকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। অনিমেষ জোর করে ভাবনাটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। দেবব্রতবাবু বলেছিলেন যে স্কটিশচার্চে ওঁর এক বন্ধু নাকি অধ্যাপনা করেন। অনিমেষ সেখানে ভরতি হয়ে বাড়িতেই পড়াশুনা করতে পারে। ফার্স্ট ইয়ারে কাউকেই বেশি পড়তে হয় না। অ্যাটেন্ডেন্সের গড় ঠিক থাকলেই প্রমোশন পাওয়া যায়—তা সেটাও নাকি ম্যানেজ হয়ে যাবে। এটা শুনে অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ ব্যবস্থাটা পাকা না হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। ফার্স্ট-ইয়ারটা শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে?

বিকেলবেলায় মহীতোষ এলেন। সঙ্গে দেবব্রতবাবু, আজ নীলা আসেনি। দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়ে খানিকটা সঙ্কোচ আর কেন জানা নেই অপরাধবোধ এল অনিমেষের। মহীতোষ সোজা মানুষ, চা-বাগানের নির্জনতায় থেকে সরল কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অনিমেষ জানে বাবা তাকে ঘিরে অনেক আশা করেন। ওকে ডাক্তার হতে হবে, অনেক পসার হবে—প্রচুর টাকা আসবে, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে ফর্মুলা তার বাইরে তিনি ছেলেকে কিছুতেই দেখতে চান না। অথচ কলকাতায় সে পড়তে আসুক এ ব্যাপারে তাঁর কোথায় যেন দ্বিধা ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে আই. এসসি. পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেলে ওর আরও দায়িত্ববোধ এবং বয়স বাড়বে সুতরাং চিন্তার কিছু থাকবে না। সেই ছেলে কলকাতায় পৌঁছে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খবরটা এল লোকাল থানা থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর ছেলে সম্পর্কে জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যেন অনিমেষ কলকাতায় খুব বড় ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। একটা কথা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না, একদম আনাড়ি ছেলে কলকাতায় গিয়ে কী করতে পারে যার জন্য পুলিশ গুলি করবে? কাগজে তিনি পোড়া ট্রাম-বাস আন্দোলনের ছবি দেখেছেন। মহীতোষের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল নিজের ছেলেকে তিনি কখনওই চিনতে পারেননি। ট্রেনে গেলে অনেক সময়। পড়ি কি মরি করে তেলিপাড়া থেকে যে বেসরকারি মালের প্লেন ছাড়ে তাতেই জায়গা করে নিলেন। অনিমেষের এই খবরটা জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখরকে জানাবার সময় পেলেন না আর। শেষ দুপুরে দমদমে নেমে সোজা দেবব্রতবাবুর কাছে চলে এসেছেন তিনি। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা একটু টের পেলেন না মহীতোষ। দমদম থেকে হরেন মল্লিক লেনে আসতে যে কলকাতা পড়ল তা শান্ত, কোথাও কোনও বিক্ষোভ নেই। কল্পনাই করা যাচ্ছে না এখানে এসে অনিমেষ কী কারণে গুলি খেতে পারে। দেবব্রতবাবু বাড়িতে ছিলেন, দীর্ঘকাল বাদে দেখা হওয়া মাত্র মহীতোষ হাসপাতালে যেতে চাইলেন। কিন্তু তখন দুপুর, যেতে চাইলে সম্ভব নয়। দেবব্রতবাবু মহীতোষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন। এর কিছুটা অনিমেষের কাছে দেবব্রতবাবু জেনেছেন, কিছুটা পুলিশের সূত্রে, বাকিটা অনুমান।

অনিমেষ এখন মোটামুটি ভাল, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই জানতে পেরে মহীতোষ কিছুটা শান্ত হলেন। সকালে পাওয়া উত্তেজনাটা হঠাৎ নিতে এলে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল। দেবব্রতবাবু ওঁকে বোঝালেন এখন কিছুই করার নেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা থাই-এর হাড়ে গুলি লেগে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছিল, অপারেশন হয়েছে, ডাক্তার বলছে মাস ছয়েক বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলে অনিমেষ হাঁটতে পারবে। দুর্ঘটনা তো ঘটেই কিন্তু মুশকিল হল সেটা ঘটবার আগে কিছুতেই জানা যায় না। মহীতোষ বললেন, 'আসলে আমার ভাগ্যটাই এই রকম: ওর মা চলে গেল একটা সামান্য দুর্ঘটনায়, কোনও কারণ ছিল না। ছেলেটা এতকাল দাদুর কাছে মানুষ হয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্কুল ফাইনালে ও যখন ফার্স্ট ডিভিশন পেল আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পড়াশুনায় ভাল কিন্তু বড্ড জেদি আর অবাধ্য মনে হত। তা রেজাল্ট ভাল হতে ওকে ঘিরে একগাদা কল্পনা করে ফেললাম। অথচ দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুর্ঘটনা।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'আপনার ছেলেকে অবাধ্য বলে মনে হয় না কিন্তু।'

মহীতোষ হাসলেন, 'ওটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। ও যেটা ভাল মনে করে সেটা করবেই। এককালে কংগ্রেসের কাজকর্ম করত আমার অপছন্দ সত্ত্বেও।'

দেবব্রতবাবু অবাক হলেন, 'অনিমেষ কংগ্রেস করত?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে সেরকমই শুনেছিলাম, নেহাতই কাঁচা ব্যাপার, চাপল্য তো ওই বয়সেই আসে।' মহীতোষ নিজেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ওর কলেজে ভরতির সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্কটিশে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে রাখছি, সুস্থ হলে ক্লাশ করবে।'

www.MurchOna.com

'স্কটিশে কেন, প্রেসিডেন্সিতে জায়গা পাবে না ?'

'না—মানে, ধরাধরির ব্যাপার তো। ক্লাশ না করলে প্রেসিডেন্সি খাতায় নাম রাখবে না। খুব কম্পিটিশন ওখানে।'

'স্কটিশ কি আর আগের মতো আছে ?' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল মহীতোষকে, 'তার ওপর কো-এড়ুকেশন কলেজ—।'

'দূর মশাই, ও সব নিয়ে ভাববেন না। প্রেসিডেন্সিতেও মেয়েরা পড়ছে। পড়াশুনাই হল আসল কথা। স্কটিশের আর্টস ডিপার্টমেন্টটা ভাল।'

'আর্টস ?' মহীতোষ যেন আকাশ থেকে পরলেন, 'অনিমেষ কি আর্টসে ঢুকতে চায় ?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলল। তা ছাড়া সায়েন্স নিয়ে পড়লে ক্লাশ না করলে চলবে না। প্র্যাক্টিক্যালগুলো তো বাড়িতে বসে করা যাবে না।'

মুখ-চোখ শক্ত হয়ে গেল মহীতোষের, নীরবে মাথা নাড়লেন। সেটা লক্ষ করে দেবব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অন্য কিছু ভাবছেন ?'

চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন মহীতোষ, 'ডাক্তাররা যদি বলে থাকেন ছয় মাসের মধ্যেও উঠতে পারবে না তা হলে আর এখানে রেখে লাভ কী! আর তার পরেও তো হাঁটাচলা সড়গড় হতে সময় লাগবে। আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই, সামনের বছর দেখা যাবে।'

'নিয়ে যাবেন মানে ?'হেসে ফেললেন দেবব্রতবাবু, 'আপনি তো এখনও ওকে চোখে দেখেননি, সামান্য নড়াচড়া ওর পক্ষে ক্ষতিকর আর আপনি সেই জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন ?' তারপর ব্যাপারটা ধরতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি চাইছেন না অনিমেষ আর্টসে ভরতি হোক ?'

মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, 'না, ওর জীবন লক্ষ্যহীন হোক সেটা চাই না। ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তার হবে, আমারও তাই ইচ্ছে।'

কথাটা শুনে দেবব্রতবাবু হাসলেন, 'তাই বলুন। তা হলে অবশ্য এ বছরটা নষ্ট করতেই হবে। যাক, হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন। চারটের একটু আগেই বেরোব আমরা।'

মহীতোষ উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলেন, 'আমি বরং হোটেল থেকে ঘুরে আসি।'

'হোটেল ? আপনি হোটেলে থাকবেন নাকি ?'

'কত দিন থাকতে হবে জানি না তো, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তা ছাড়া প্যারাডাইস হোটেলটা কাছেই, আমাদের জলপাইগুড়ির হোটেল বলতে পারেন—এ সব নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

দেবব্রতবাবুর ঘোর আপত্তি মহীতোষ শুনলেন না। প্রয়োজনে পুত্রকে তিনি বন্ধুর কাছে সাময়িকভাবে থাকতে পাঠাতে পারেন কিন্তু নিজের থাকার কোনও কারণ পান না।

ক'দিনের যাওয়া আসায় দেবব্রতবাবু এর মধ্যেই হাসপাতালে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এনক্যুয়ারি কাউন্টার থেকে এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ওঁকে ডাকলেন, 'আপনি তো জেনারেল বেডের একশো আটত্রিশ নম্বরের কাছে আসেন ?'

দেবব্রতবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'কেমন আছে ও ?'

'খারাপ কিছু রিপোর্ট নেই। আপনার পেশেন্টের নাম অনিমেষ, তাই তো ?'

'হ্যাঁ। কী হয়েছে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ সকালে একজন আপনার পেশেন্টের নাম করে দুটো লাগেজ দিয়ে গেছে। ওকে দেখিয়ে তো কোনও লাভ নেই, আপনারা যদি চান তো নিয়ে যেতে পারেন।'

দেবব্রতবাবু অবাক হয়ে মহীতোষের দিকে তাকালেন। মহীতোষ এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি একটু দেখতে পারি ?'

দেবব্রতবাবু পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ইনি পেশেন্টের বাবা।'

চিনতে পারলেন মহীতোষ। বেডিংটা তো বটেই, স্যুটকেসটাও সঙ্গে এনেছিল অনিমেষ। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কেউ হয়তো দিয়ে গেছে কিন্তু এত দিন বাদে চিনে চিনে এগুলো এখানে কী করে পৌঁছাল সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না ওঁদের। জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখার কোনও মানে হয় না। প্রথমত ওতে কী কী ছিল তাই মহীতোষ জানেন না আর যদি কিছু হারিয়ে থাকে তা কখনওই পাওয়া যাবে না। এগুলো কেউ দিয়ে গেছে তাই যথেষ্ট।

www.MurchOna.com

চেয়ে বয়সে খুব একটা বড় নয় অথচ ওর সঙ্গে কথা বললে নিজেকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। অনিমেষ জোর করে ভাবনাটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। দেবব্রতবাবু বলেছিলেন যে স্কটিশচার্চে ওঁর এক বন্ধু নাকি অধ্যাপনা করেন। অনিমেষ সেখানে ভরতি হয়ে বাড়িতেই পড়াশুনা করতে পারে। ফার্স্ট ইয়ারে কাউকেই বেশি পড়তে হয় না। অ্যাটেন্ডেন্সের গড় ঠিক থাকলেই প্রমোশন পাওয়া যায়—তা সেটাও নাকি ম্যানেজ হয়ে যাবে। এটা শুনে অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ ব্যবস্থাটা পাকা না হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। ফার্স্ট-ইয়ারটা শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে?

বিকেলবেলায় মহীতোষ এলেন। সঙ্গে দেবব্রতবাবু, আজ নীলা আসেনি। দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়ে খানিকটা সঙ্কোচ আর কেন জানা নেই অপরাধবোধ এল অনিমেষের। মহীতোষ সোজা মানুষ, চা-বাগানের নির্জনতায় থেকে সরল কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অনিমেষ জানে বাবা তাকে ঘিরে অনেক আশা করেন। ওকে ডাক্তার হতে হবে, অনেক পসার হবে—প্রচুর টাকা আসবে, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে ফর্মুলা তার বাইরে তিনি ছেলেকে কিছুতেই দেখতে চান না। অথচ কলকাতায় সে পড়তে আসুক এ ব্যাপারে তাঁর কোথায় যেন দ্বিধা ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে আই. এসসি. পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেলে ওর আরও দায়িত্ববোধ এবং বয়স বাড়বে সুতরাং চিন্তার কিছু থাকবে না। সেই ছেলে কলকাতায় পৌঁছে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খবরটা এল লোকাল থানা থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর ছেলে সম্পর্কে জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যেন অনিমেষ কলকাতায় খুব বড় ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। একটা কথা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না, একদম আনাড়ি ছেলে কলকাতায় গিয়ে কী করতে পারে যার জন্য পুলিশ গুলি করবে? কাগজে তিনি পোড়া ট্রাম-বাস আন্দোলনের ছবি দেখেছেন। মহীতোষের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল নিজের ছেলেকে তিনি কখনওই চিনতে পারেননি। ট্রেনে গেলে অনেক সময়। পড়ি কি মরি করে তেলিপাড়া থেকে যে বেসরকারি মালের প্লেন ছাড়ে তাতেই জায়গা করে নিলেন। অনিমেষের এই খবরটা জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখরকে জানাবার সময় পেলেন না আর। শেষ দুপুরে দমদমে নেমে সোজা দেবব্রতবাবুর কাছে চলে এসেছেন তিনি। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা একটু টের পেলেন না মহীতোষ। দমদম থেকে হরেন মল্লিক লেনে আসতে যে কলকাতা পড়ল তা শান্ত, কোথাও কোনও বিক্ষোভ নেই। কল্পনাই করা যাচ্ছে না এখানে এসে অনিমেষ কী কারণে গুলি খেতে পারে। দেবব্রতবাবু বাড়িতে ছিলেন, দীর্ঘকাল বাদে দেখা হওয়া মাত্র মহীতোষ হাসপাতালে যেতে চাইলেন। কিন্তু তখন দুপুর, যেতে চাইলে সম্ভব নয়। দেবব্রতবাবু মহীতোষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন। এর কিছুটা অনিমেষের কাছে দেবব্রতবাবু জেনেছেন, কিছুটা পুলিশের সূত্রে, বাকিটা অনুমান।

অনিমেষ এখন মোটামুটি ভাল, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই জানতে পেরে মহীতোষ কিছুটা শান্ত হলেন। সকালে পাওয়া উত্তেজনাটা হঠাৎ নিভে এলে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল। দেবব্রতবাবু ওঁকে বোঝালেন এখন কিছুই করার নেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা থাই-এর হাড়ে গুলি লেগে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছিল, অপারেশন হয়েছে, ডাক্তার বলছে মাস ছয়েক বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলে অনিমেষ হাঁটতে পারবে। দুর্ঘটনা তো ঘটেই কিন্তু মুশকিল হল সেটা ঘটবার আগে কিছুতেই জানা যায় না। মহীতোষ বললেন, 'আসলে আমার ভাগ্যটাই এই রকম। ওর মা চলে গেল একটা সামান্য দুর্ঘটনায়, কোনও কারণ ছিল না। ছেলেটা এতকাল দাদুর কাছে মানুষ হয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্কুল ফাইনালে ও যখন ফার্স্ট ডিভিশন পেল আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পড়াশুনায় ভাল কিন্তু বড্ড জেদি আর অবাধ্য মনে হত। তা রেজাল্ট ভাল হতে ওকে ঘিরে একগাদা কল্পনা করে ফেললাম। অথচ দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুর্ঘটনা।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'আপনার ছেলেকে অবাধ্য বলে মনে হয় না কিন্তু।'

মহীতোষ হাসলেন, 'ওটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। ও যেটা ভাল মনে করে সেটা করবেই। এককালে কংগ্রেসের কাজকর্ম করত আমার অপছন্দ সত্ত্বেও।'

দেবব্রতবাবু অবাক হলেন, 'অনিমেষ কংগ্রেস করত?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে সেরকমই শুনেছিলাম, নেহাতই কাঁচা ব্যাপার, চাপল্য তো ওই বয়সেই আসে।' মহীতোষ নিজেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ওর কলেজে ভরতির সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্কটিশে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে রাখছি, সুস্থ হলে ক্লাশ করবে।'

www.MurchOna.com

'সে কী! কালই তো দেখে গেলাম।' হতভম্ব দেবব্রতবাবুর মুখটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'আজ সকালে টের পাওয়া গেল।'

এ বার মহীতোষ কথা বললেন, 'টের পাওয়া গেল মানে ? একটা লোক কখন মরে গেছে তা কেউ খবর রাখল না ? অদ্ভুত ব্যাপার তো! তুই দেখলি ?' এই প্রথম ছেলেকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন মহীতোষ।

অনিমেষ বাবার দিকে তাকাল। খুব বিচলিত দেখাচ্ছে ওঁকে। বাবাকে দেখার পরই যে সঙ্কোচটা এসেছিল এখন সেটা অনেক কম। বরং বাবার অদ্ভুত ব্যবহারে সে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ওর আহত হবার পর যিনি জলপাইগুড়ি থেকে ছুটে এলেন তিনি এসে অবধি একটাও কথা বলেননি, কী করে ঘটনাটা ঘটল জিজ্ঞাসাও করেননি। গম্ভীর মুখে অনিমেষ মহীতোষের প্রশ্নটার উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

মহীতোষ বললেন, 'খুব খারাপ ব্যাপার। আচ্ছা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা যাবে এখন ?'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'চলুন দেখি। তবে আপনি যা চাইছেন তা হবে না।'

অন্যমনস্ক মহীতোষ বললেন, 'মানে ?'

'ওই যে তখন বলছিলেন না, ছেলেকে নিয়ে ফিরে যাবেন, সেটা অসম্ভব। দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। তার ওপর আপনাদের বিখ্যাত মণিহারীঘাট পার হয়ে যাওয়া—কিছু হয়ে গেলে সারাজীবন আফশোষ করতে হবে।'

'কিন্তু এখানে রাখা মানে আপনার ওপর অত্যাচার করা। তা ছাড়া, এ বছর যখন নষ্ট হচ্ছেই, চলুন, আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি— অনিমেষকে কিছু না বলে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

কথাগুলো শোনামাত্র অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। মহীতোষ এসেছেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ? এটা ঠিক, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু জলপাইগুড়িতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই এখানকার কলেজে আর ভরতি হওয়া যাবে না। মহীতোষ তো স্পষ্ট বললেন এ বছরটা নষ্ট হচ্ছে। তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে সে এখন কলেজে ভর্তি হচ্ছে না। একটা বছর চুপচাপ বৃথায় চলে যাবে এবং উনি সেটা মেনে নিয়েছেন। অনিমেষের মনে হচ্ছিল সে যদি একবার এখান থেকে জলপাইগুড়ি ফিরে যায় তা হলে আর কখনও কলকাতার কলেজে পড়া হবে না। কিন্তু সে এখন তো কিছুই করতে পারে না। যার বিছানা থেকে এক ইঞ্চি উঠে বসার সামর্থ্য নেই তার কথা কেউ শুনবে কেন ? যদি দাদু থাকতেন কাছে, অনিমেষ সরিৎশেখরের অভাব ভীষণভাবে অনুভব করল। দাদুর কথায় বাবা না বলতে পারতেন না আর দাদুকে রাজি করানো নিজেকে রাজি করানোর মতোই সহজ। এখনও সে ভালভাবে কলকাতার রাস্তায় হাঁটেনি, কলকাতার কিছুই দেখেনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ট্রামের চাকার ঘরঘর শব্দ ছাড়া কলকাতা ওর কাছে অচেনা, তবু অনিমেষের মনে হচ্ছিল, কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে তার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

অনিমেষ চোখ বন্ধ করে ছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল কেউ যেন খাটের পাশের টুলটায় এসে বসেছে। সে চোখ খুলল না। খানিক বাদে সে মহীতোষের গলা শুনতে পেল। গলা অদ্ভুত বিষণ্ণ এবং কেমন ভাঙা ভাঙা। এরকম গলায় বাবাকে কখনও কথা বলতে শোনেনি সে। মহীতোষ বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, খোকা ?'

চোখ খুলল না অনিমেষ। এতক্ষণ কোথায় ছিল জানা নেই, অভিমানের সুতোটা টানটান হয়ে যেতে লাগল। ওর মনে হল, চোখ খুললেই সে কেঁদে ফেলবে। কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই, তারপর খুব আলতোভাবে পায়ের ওপর স্পর্শ পেল অনিমেষ। ওর অপারেশনের জায়গায় হাত রেখে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, খুব ব্যথা করছে রে ?'

সামান্য স্পর্শ কিন্তু অনিমেষের মনে হল, কেউ করাত দিয়ে ওর পা কাটছে। অন্য সময় হলে আর্তনাদ করত কিন্তু এখন শারীরিক যন্ত্রণাটাকে দাঁতে চাপল সে। প্রাণপণে, স্বাভাবিক গলায় সে বলার চেষ্টা করল, 'না বাবা।'

## চার

ব্যাপারটা যে এত দ্রুত চাউর হয়ে যাবে কল্পনা করতে পারেনি অনিমেষ। পরদিন সকালে যখন আকাশ সাজানো রোদ উঠল, ত্রিদিবের সঙ্গে ডাইনিং রুমে ঢুকতেই ও বুঝতে পারল হোস্টেলের বাঙালি বাসিন্দাদের চোখের দৃষ্টি পালটে গেছে। প্রথমটায় একটু অস্পষ্টতা ছিল, ছেলেরা খেতে খেতে ওর দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এবং সেটা ওকে কেন্দ্র করেই।

www.MurchOna.com

অনিমেষ ত্রিদিবকে কারণটা জিজ্ঞাসা করল। এরা বেশির ভাগই কলেজের ছাত্র, ওদের চেয়ে জুনিয়ার, একসঙ্গে মেশার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই রকম আচরণও ওদের করতে দেখা যায়নি এত দিন। ত্রিদিব কিন্তু আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'কী ব্যাপার, সামথিং গোলমাল মনে হচ্ছে?'

ওদের মধ্যে যে ছেলেটি সব চেয়ে সপ্রতিভ সে খাওয়া থামিয়ে হেসে জবাব দিল, 'না, না, গোলমাল হবে কেন? আমরা অনিমেষদার সম্পর্কে একটা খবর শুনেছি তাই আলোচনা করছিলাম।'

'কী খবর?' ত্রিদিব মজা করে জিজ্ঞাসা করল।

'উনি খুব অ্যাকটিভ কমিউনিস্ট অথচ এখানে এমন ভাবে থাকেন কেউ তা টের পায় না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, তারপর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভেবে চুপ করে গেল। ওর মনে হল ফালতু কথা বলে কোনও লাভ নেই। যে কেউ ইচ্ছেমতন ধারণা তৈরি করে নিতে পারে, জনে জনে গিয়ে সেই ধারণা ভাঙিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কী ঘটনা থেকে এদের তার সম্পর্কে এমত ধারণা হল সেটা জানতে আগ্রহ হচ্ছিল। সেটা ত্রিদিবই প্রশ্ন করল, 'তোমরা এই খবরটা কী করে পেলে?'

'বাঃ, খাদ্য আন্দোলনের সময় অনিমেষদা পুলিশের গুলিতে হেভি ইনজ্যুরড্ হয়েছিলেন শুনলাম, সেটা অ্যাকটিভ না হলে হয়?' ছেলেটি কথা থামিয়ে একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু অনিমেষদা, আপনি কলেজ ইউনিয়নে জয়েন করেননি কেন? আমরা শুনলাম আপনি এস. এফ-এর মেম্বার পর্যন্ত ছিলেন না!'

খেতে ভাল লাগছিল না অনিমেষের। ত্রিদিব খুব দ্রুত খায়, ওর খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা খুব ভুল খবর শুনেছ। আমার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই।'

বেসিনে হাত ধুতে ধুতে কানে এল ওদের একজন চাপা গলায় বলছে, 'কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর যারা রিয়েল মেম্বার তারা কক্ষণও সেটা প্রকাশ করে না।'

ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্ত থেমে থাকত তবে সেটা এরকম হত, ইউনিভার্সিটিতে খবর গড়িয়ে গড়িয়ে এল। সেই যে মাসে রেজাল্ট বেরিয়েছে আর এখন জুলাই-এর মাঝামাঝি, সবে ক্লাশ শুরু হয়েছে, কেউ কাউকে চেনে না। এমনকী নবীন ছাত্রদের বরণ-করা ব্যাপারটা এখনও হয়ে ওঠেনি। স্কটিশের যে ব্যাচটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে অনিমেষ ওদের সঙ্গেই সময় কাটাত। ওদের এই ব্যাচের সবাই খুব শান্তশিষ্ট, পড়াশুনোর মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। বি-এ অনার্সে যে ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল সে ওদের ব্যাচেরই। দু'জন খুব সিরিয়াসলি সাহিত্য করার কথা ভাবে। এর মধ্যেই বিদেশি সাহিত্যের অনেক খবর ওরা জেনে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে আসার পর বিদেশি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলার ঝোঁক ওদের আরও বেড়েছে।

স্কটিশের হোস্টেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে কেউ হেঁটে আসে না। পথটা এমন দূরত্বের নয় যে হাঁটা অসম্ভব কিন্তু কলকাতায় চোখের সামনে এত যানবাহন যে হাঁটার প্রয়োজন পড়ে না। অনিমেষ একটা মান্থলি করিয়ে নিয়েছে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামের। সেটায় সেই ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত সারাদিন ধরে ঘোরা যায় অথচ পয়সা সামান্যই লাগে। সেদিন ত্রিদিব একটা কথা বলল। জিনিসপত্রের দাম এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। একটা কাগজ লিখেছিল যে মাথাপিছু মানুষের প্রতিদিনের রোজগার নাকি কুড়ি পয়সা। কুড়ি পয়সায় একটা মানুষ কী করে বেঁচে থাকতে পারে? ত্রিদিব বলেছিল তবু মানুষ বেঁচে থাকে এবং সেটা মানুষ বলেই সম্ভব। ভারতবর্ষের কোথাও যখন মানুষ এ বিষয় নিয়ে হইচই করেনি, জিনিসপত্রের দাম কমানো নিয়ে আন্দোলন হয়নি তখন কলকাতায় একদিন দু'দিনের জন্য হলেও বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। ত্রিদিবের কাছে সেটাই অস্বাভাবিক লাগে। ও বলেছিল, 'এখানে দশ পয়সা দিলে এক ভাঁড় চা পাওয়া যায়, ট্রামে মাইলখানেক স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায়, বারো আনা পয়সায় একটা মানুষ ডাল ভাত তরকারি খেতে পারে। এই ব্যাপারটা পশ্চিমবাংলার বাইরে কোথাও সম্ভব নয়। দিল্লিতে নাকি এটা স্বপ্নকুসুম। তাই এখানে এত মানুষের ভিড়, সবাই কম পয়সায় থাকবার জন্য কলকাতায় ছুটে আসছে। অথচ এখানেই খাদ্য আন্দোলন হয়, এক পয়সা ভাড়া বাড়লে ট্রাম পোড়ে। কেন? তার মানে কি এই যে পশ্চিমবাংলার মানুষ খুব সচেতন, তাদের কেউ ভুলিয়ে রাখতে পারে না? অনিমেষ এই জায়গায় ত্রিদিবের সঙ্গে একমত নয়। এখানে যত তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে ওঠে তত তাড়াতাড়ি তা নিভে যায়। নিভে যাওয়ার পর মনেই হয় না কখনও আগুন জ্বলেছিল। আর এই আগুন জ্বলবারও একটা মজার দিক আছে। বেশির ভাগ মানুষই শীতে হাত পা সেঁকার মতো দূরে থেকে নিজেদের গরম

রাখতে চায়, মুষ্টিমেয় যে ক'জন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আচরণ নাটক দেখার চোখ নিয়ে দেখে। বেশির ভাগ বাঙালির চরিত্রই এই, অবাঙালিরা যারা এই শহর কলকাতায় প্রায় আধাআধি, তাদের সঙ্গে যেন এই সব আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই, দেখলে মনে হয় তারা অন্য পৃথিবীতে বাস করে। কলেজে পড়ার সময় যে দু'-চারটে ছোটখাটো আন্দোলন অনিমেষ দেখেছে সেগুলোর চেহারা মোটামুটি একই। একটা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ, মিছিল করে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, সেখানে কিছুক্ষণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা চলল, ব্যাস, সব কর্তব্য শেষ। কিংবা খুব জোরদার কিছু ঘটলে একদিনের জন্য ধর্মঘট। এই ব্যাপারটা অনিমেষের মাথায় ঢোকে না, ধর্মঘট করলে কার কী লাভ হবে! নিজের নাক কেটে কি অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা যায়? আমি কোনও কাজ করছি না তোমার আচরণের প্রতিবাদে—যারা অন্যায় করে, এত সহজে তারা আজকাল ভয় পায় না এটাই বোধহয় ধর্মঘটি নেতারা ভুলে গেছেন। নাকি আসলে কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই ধর্মঘটের মুখোশ পরে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে চান। ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে সাধারণ মানুষ কখনওই কোনও আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চায় না। অথচ আন্দোলন বলে যেটা হয় সেটা সাধারণ মানুষের জন্যই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মান্থলি টিকিট নিয়ে যাওয়া-আসার পথে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে অনিমেষ। প্রথম শ্রেণীতে এক তিল জায়গা না থাকলেও ভদ্র বাঙালিরা কখনওই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে চান না। সেখানে কিছু অবাঙালি এবং ওই কুড়ি পয়সা-আয়মার্কা মানুষের ভিড়। অথচ দুটো কামরা একই সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে তো এই বিচার আরও প্রবল। অনিমেষ কোনও সুন্দরী মহিলাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে দেখেনি। চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে এ দুটো শ্রেণীর মানুষেরাই সাধারণ—জনসাধারণ।

জলপাইগুড়িতে যে সব চিন্তা-ভাবনা ওর মাথায় ছটফট করত সেগুলো এই চার বছরে অন্য চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে দিন পুলিশের ছোড়া বুলেটটা তার একদিক দিয়ে উপকারই করেছে। এই যে অত দিন বিছানায় শুয়ে থাকা, শরীর কাহিল হওয়ায় সতর্ক হয়ে চলাফেরা—এগুলো অনেক উদ্দামতাকে সংযত করতে সাহায্য করছে। না হলে যে উদ্দীপনা প্রথমবার কলকাতায় আসবার সময় বুকের মধ্যে আঁচড় কাটত সেটা তাকে এত দিনে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে। খোলা চোখেও যে অনেক সময় দৃষ্টি থাকে না—সেটা সেরকম সময় ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়িটায় ওদের ক্লাশ শুরু হয়েছে। বইপত্র এখনও কেনা হয়নি। মহীতোষ এখনও টাকা পাঠাননি। রেজাল্ট বের হবার পর যখন সে জলপাইগুড়ি থেকে এ বার এল তখন ভরতির অতিরিক্ত টাকা মহীতোষ দিতে পারেননি। এম এ ক্লাশে কী রকম বই কিনতে হয় ওঁরা কেউ জানেন না, অনিমেষও বলতে পারেনি। রেজাল্ট বের হবার পর মহীতোষ একটু পালটে গেছেন। তাঁর এখন মনে হচ্ছে অনিমেষ যদি ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে এম এ পাশ করতে পারে তা হলে কোনও কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে যাবে। যদিও মাইনে কম তবু চাকরিটায় সম্মান আছে। এ সব ব্যাপারে দেবব্রতবাবু তাঁকে হালফিল খবর চিঠিতে জানিয়ে থাকেন।

দেবব্রতবাবুর বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয়নি। মনে পড়ে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে প্রায় মাস তিনেক ওঁর বাড়িতে থাকতে হয়েছিল অনিমেষকে। একটুও কষ্ট হয়নি। দেবব্রতবাবু ব্যবসা করেন কিন্তু কী ধরনের ব্যবসা তা ও জানে না। দিন-রাতের খুব কম সময়ই ওঁকে বাইরে যেতে দেখেছে সে সময়। কিন্তু বাড়িতে সচ্ছলতা সবখানে, ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হত। নীলা কলেজে পড়ছে। কলেজ মানে সকালে সেজেগুজে যেত আর বারোটা নাগাদ খুব পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসত। সারাটা দুপুর নীলার সঙ্গে গল্প করে কেটে যেত। গল্প মানে পৃথিবীর কোনও বিষয় যা থেকে বাদ নয়। ক'দিনের মধ্যে তুই-তোকারিতে সম্পর্কটা নামিয়ে এনেছিল নীলা। অত বড় একটা মেয়েকে তুই বলতে লজ্জা করত কিন্তু মেয়েটার ব্যবহার এত সহজ যে লজ্জা প্রকাশ করাটাই একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিল নীলার মতন মেয়ে জলপাইগুড়িতে সে কখনও দেখেনি। সীতা, উর্বশী কিংবা রম্ভার থেকে নীলা যেন হাজার মাইল আলাদা জাতের মেয়ে। মন্টু বলত যৌবন এসে গেলে মেয়ে-পুরুষে বন্ধুত্ব হয় না। অনিমেষের মনে হয়েছিল মন্টু নীলার মতো মেয়েকে দেখেনি। কোনও রকম নকল লজ্জা বা ঢং ছাড়া একটা মেয়ে যখন কথা বলতে পারে তখন তাকে বন্ধু না ভেবে পারা যায়! ওর কলেজে যাওয়া-আসার পথে ছেলেরা দাঁড়িয়ে থেকে যে সব মন্তব্য ছুড়ে মারে সেগুলো অকপটে বলতে পারে নীলা। গুডি ছেলেদের দেখলে কী ভীষণ

www.MurchOna.com

ক্যাবলা মনে হয়, আবার অতিরিক্ত স্মার্টদের দেখলে গা জ্বলে যায়—অনিমেষের জানা হয়ে গেছে। ওদের বাড়িতে থাকার শেষের দিকে ওর সহপাঠিনীর এক দাদাকে ভাল লাগতে শুরু হয়েছিল—অনিমেষকে সেটা জানাতে দ্বিধা করেনি নীলা। একসঙ্গে একই বাড়িতে থেকে এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনও রকম আচরণ করতে দেখেনি ওকে অথচ হাসপাতালে প্রথম আলাপের দিন অনিমেষ নীলার সম্পর্কে একটা মোটা দাগের ধারণা করে ফেলেছিল।

পরের বছর হোস্টেলে আসার পর দেবব্রতবাবুর ওখানে সে গিয়েছে মাঝে মাঝে। দেবব্রতবাবুও খোঁজখবর নিতে এসে থাকেন কিন্তু নীলার সঙ্গে সে আড্ডাটা আর জমেনি। একটা বছর নষ্ট হওয়ায় নীলা ওর থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বি এ পড়ার সময় একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল যার পর অনিমেষ আর দেবব্রতবাবুর বাড়িতে যায়নি। যায়নি মানে সম্পর্ক চলে যাওয়া নয়, যেতে ঠিক ইচ্ছে করে না। ব্যাপারটা ওকে এত চমকে দিয়েছিল যে এখনও ভাবলে কূলকিনারা পায় না। দেবব্রতবাবু মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন তাঁর বাড়িতে সে যাচ্ছে না বলে। কারণটা ওঁকে বলা যায় না তাই জানাতে পারেনি অনিমেষ। যাকে বলা যেত সে কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেনি। নীলা কখনওই ওর হোস্টেলে আসেনি। যখন বাড়িতে যেত তখন হেসে গল্প করত, খবরাখবর নিত, ব্যস। এক এক সময় অনিমেষের মনে হয়েছে সরাসরি গিয়ে নীলাকে ব্যাপারটা বলে, ওর কী বক্তব্য সেটা জেনে নেয়। নীলা যেমন সহজ মেয়ে নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলবে। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা করাটাই যে অস্বস্তির।

সেই বিকেলটা ছিল শীতের। সন্ধেটা আসবার আগেই কলকাতা ধোঁয়াটে হয়ে যায়। নীলাদের বাড়িতে এসেছিল অনিমেষ। এসে শুনল নীলা দেবব্রতবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে। ওর আসার কোনও কথা নয়, ওরা জানেও না। মাসিমা খুব আদর করে ওকে খাওয়ালেন, ভদ্রমহিলাকে কখনও গম্ভীর মুখে দেখেনি অনিমেষ। ওদের এই বাড়িটা সুখী সংসারের একটা দারুণ উদাহরণ। মহীতোষ তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন এটা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ওদের ফিরতে দেরি হবে বলে অনিমেষ চলে আসছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে হাঁটছে এমন সময় কেউ একজন ওর সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ দেখল ছেলেটি ওর চেয়ে সামান্য বড় হবে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, এই শীতেও কোনও গরম জামা গায়ে নেই। অনিমেষ থমকে দাঁড়াতেই ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল, কোনও রকমে বলল, 'আপনি কে ?'

'আমি যে-ই হই তোমার তাতে কী দরকার! কথা আছে শুনতে হবে।'

'বাঃ, আপনাকে আমি চিনি না—'

অনিমেষকে থামিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও পাশে একটা পার্ক আছে, সেখানে বসব।' কথা বলার সময় ছেলেটি বারংবার চার পাশে তাকাচ্ছিল। ওর চোখ মুখে এমন একটা উত্তেজনা ছড়ানো যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অনিমেষের মনে হল ছেলেটি তো অন্য কারও সঙ্গে তাকে গুলিয়েও ফেলতে পারে। এই আবছা অন্ধকারে সেটা অসম্ভব নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে চেনেন ?'

'তুমি তো অনিমেষ, এসো, আমি এগোচ্ছি।' ছেলেটি সামনে হাঁটছে, ইতস্তত করেও অনিমেষ ওকে অনুসরণ করল। ঠিক ভয় নয়, অনিমেষের মনে হচ্ছিল এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে ছেলেটির তাকে খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেটা এমন অস্পষ্ট যে ওটা জানবার আগ্রহ ওকে পার্কে টেনে আনল। সে পার্কের ভেতর ঢুকে দেখল একটা খালি বেঞ্চিতে ছেলেটি বসে আছে। ছোটখাটো পার্ক কিন্তু মানুষের ভিড় কম। অনিমেষকে একটু পা টেনে হাঁটতে দেখে ছেলেটি বলল, 'তোমার পায়ে কি এখনও ব্যথা আছে ?' অবাক হয়ে তাকাল অনিমেষ। ঘাড় নেড়ে না বলতে বলতে ভাবল এই ছেলেটি ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। কী ব্যাপার!

বেঞ্চিতে বসলে ছেলেটি এ বার কেমন মিইয়ে গেল। যে উত্তেজনায় অনিমেষকে এখানে ডেকে এনেছে সেটা কমে আসতেই ও কথা খুঁজে পাচ্ছে না এটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। অনিমেষ বলল, 'কী কথা, বলুন।'

ছেলেটি হঠাৎ কাতর গলায় বলে উঠল, 'তুমি আমাকে চেনো না, আমার নাম শ্যামল। আমি নীলাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি।'

এরকম কথা শুনবে অনুমান করতে পারেনি অনিমেষ। ও অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখতে লাগল। এবং এতক্ষণে ওর খেয়াল হল প্রথম থেকে শ্যামল ওকে সমানে তুমি তুমি বলে যাচ্ছে অথচ

www.MurchOna.com

ওকে খুব বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছে না তার। নীলাকে ভালবাসে বলেই কি অনিমেষকে তুমি বলার অধিকার পেয়ে যাবে! বিরক্ত হয়ে সে অন্য দিকে তাকাল। ছেলেটি সেই রকম গলায় বলল, 'আমি তোমার কাছে, কী বলব, আমার মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।'

কোনও রকমে অনিমেষ বলতে পারল, 'এ সব কথা আমাকে বলছেন কেন ?'

শ্যামল বলল, 'কারণ তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো!'

'আমি ?' হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ।

'তুমি এমন ভাব করছ যেন কিছুই বুঝতে পারছ না!' আড়চোখে তাকাল শ্যামল।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হয় তুমি মিথ্যুক নয়—, না, নীলা কখনওই মিথ্যে কথা বলতে পারে না। শোনো, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই। নীলাকে আমি ভালবাসি। আমি জানতাম ও আমাকে ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু ইদানীং ওর ব্যবহার একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল যে আমাকে নাকি ও ভালবাসতে পারছে না। আমি জানি এর কারণ তুমি। তুমি ওদের বাড়িতে অত দিন ছিলে, একসঙ্গে থাকলে অনেক সময় মমতা এসে যায়। নীলা তোমার জন্য আমাকে রিফ্যুজ করছে।' বড় বড় চোখে তাকাল শ্যামল।

হেসে ফেলল অনিমেষ। সে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কথা আপনি কোত্থেকে জানলেন ? নীলা আপনাকে বলেছে ?'

ঘাড় নাড়ল শ্যামল, 'নীলা বলবে কেন ? আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ছাড়া আর কোনও ছেলে ও বাড়িতে যায় না।'

হাসছিল অনিমেষ, 'ব্যস, তা থেকেই আপনি ধারণা করে ফেললেন ?'

শ্যামল রেগে গেল, 'ইয়ার্কি মারার সময় এটা নয়। নীলা আমাকে যেরকম ভালবাসত তা থেকে সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ অন্য কেউ তার মন ভুলিয়েছে। মেয়েরা রুগ্ণ মানুষের ওপর চট করে মায়া দেখিয়ে বসে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি ভুল করছেন। নীলার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কেন নীলা এরকম করেছে সেটা তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমাকে ও এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। নীলা তোমার গল্প আমার কাছে যখনই করত তখন এমন ভাব দেখাত যে তুমি একজন হিরো। পুলিশের গুলি খেয়েও বেঁচে গেছে। নীলা জানে না আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি।'

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না নীলা কেন এরকম ব্যবহার শ্যামলের সঙ্গে করছে। বোধ হয় শ্যামল হল সেই ছেলে যার কথা নীলা ওকে বলেছিল। সহপাঠিনীর দাদা। এত চট করে ভালবাসা চলে যায় কী করে! ও বন্ধুর মতো শ্যামলকে বলল, 'নীলা যখন চাইছে না তখন ব্যাপারটা ভুলে যান। জোর করে কারও ভালবাসা আদায় করা যায় না আর আদায় করাটা পাওয়া নয়।'

ফুঁসে উঠল শ্যামল, 'ভুলে যাব ? অসম্ভব। আমি তার আগে নীলাকে মেরে ফেলব।'

এ বার সত্যি ঘাবড়ে গেল অনিমেষ। শ্যামলের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে রকম কিছু করা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?' শ্যামল খুব গম্ভীর গলায় এ বার বলল, 'তুমি যদি আর নীলার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখো তা হলে নিশ্চয়ই নীলার মন আবার আমার দিকে ফিরে আসবে। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। তুমি তো বলছ তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তা হলে যোগাযোগ না থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না।'

এই প্রথম ছেলেটির জন্য কেমন মমতা অনুভব করল অনিমেষ। ভালবাসতে মানুষ কি অন্ধ হয়ে যায়! কোনও যুক্তি কি আর মাথায় কাজ করে না ? নীলা যদি ওকে এড়িয়ে যেতে চায় তা হলে শ্যামল কত মানুষের কাছে গিয়ে এই ধরনের অনুরোধ করবে ? কিন্তু নীলার মতো সহজ মেয়ে এইরকম ব্যবহার করবেই বা কেন ? যদিও নীলা শ্যামলকে বলেনি যে সে অনিমেষকেই ভালবাসে—ব্যাপারটা চিন্তা করতেই সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে নীলার কাছে আসব না।'

শ্যামল খুব খুশি হল, ওর মুখে হাসি ফুটল।

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও মন পালটাল। শ্যামলকে পার্কের বেঞ্চিতে রেখে সে হনহন করে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। দ্রুত হাঁটতে তখনও অসুবিধে হত কিন্তু সে গ্রাহ্য করল না।

www.MurchOna.com

কথা রেখেছিল অনিমেষ। যদিও মাঝে মাঝে মনে হত শ্যামলের ওই ছেলেমানুষি হৃদয়াবেগকে ও অহেতুক প্রশ্রয় দিচ্ছে তবু নীলাদের বাড়িতে যেতে কেমন আড়ষ্টতা অনুভব করত এর পর থেকে। এ সব কথা দেবব্রতবাবুকে বলা যায় না। নীলা-শ্যামলের সম্পর্কটা এখন কী রকম সে খবর আর পায়নি সে। এবং একটা অদ্ভুত ব্যাপার, নীলা তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্কটিশ তো মোটে দশ মিনিটের রাস্তা।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে, ট্রামগুলো লাইনবন্দি হয়ে পড়ায় অনিমেষ নেমে পড়ল। আজ প্রথম পিরিয়ড বারোটায়। সময় আছে হাতে। বই-এর দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যেতে ওর খুব মজা লাগে। সার দেওয়া দোকানগুলোতে কত রকমের বই অথচ দু' দণ্ড সে দিকে তাকাবে তার জো নেই। দরজায় দাঁড়ানো কর্মচারীরা চিৎকার করে ডেকে দোকানে ঢোকাবেই। যারা ওই ফুটপাতে হাঁটবে তারা সম্ভাব্য খরিদ্দার বলে বোধ হয় ওরা ধারণা করে। এক-এক দিন তো প্রায় হাত ধরে টানাটানি চলে ভেতরে নিয়ে যেতে, তা বই কেনার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। ওদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বই দেখার মধ্যে লুকোচুরি খেলার মতো একটা মজা আছে। হ্যারিসন রোড পার হয়ে এ পারে আসতেই অনিমেষ চমকে উঠল। প্রায় পাঁচ বছর পর দেখল, চেহারার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না। সেই গেরুয়া পাঞ্জাবিটি আর পাজামা, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, হাতে সিগারেট নিয়ে কিছু ভাবছে। অনিমেষ সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'চিনতে পারছেন?' আচমকা প্রশ্নটায় মুখে ভাঁজ পড়ল। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য, তারপরই, অনিমেষের হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি, 'আরে তুমি!'

অনিমেষ বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত চিনতে পারলেন!'

সুবাস সেন বলল, 'কী আশ্চর্য, চিনব না কেন? তবে তুমি খুব বড় হয়ে গেছ। মুখটা দাড়িগোঁফে ঢেকে ফেললেও চিনতে অসুবিধে হবে কেন? কেমন আছ?'

'ভাল।' অনিমেষ উত্তরটা দিতে গিয়ে টের পেল এত দিন বাদে সুবাস সেনকে দেখতে পেয়ে ওর খুব ভাল লাগছে।

'তোমার পা? এখন ঠিক হয়ে গেছে তো?' সুবাস পায়ের দিকে তাকাতেই অনিমেষ বলল, 'প্রায় ঠিক, কোনও অসুবিধে হয় না। তবে দৌড়ালে লাগে।'

সুবাস হাসল, 'দৌড়বার কী দরকার। হেঁটে হেঁটে যদি পৌঁছে যাওয়া যায় সেটাই তো ভাল। তারপর বলো, আছ কোথায়, কী করছ?'

একটা সময় ওর সুবাসের ওপর অভিমান হত, এই কয় বছরে কলকাতা শহরে যখনি সে হেঁটেছে তখনই মনে হয়েছে, হয়তো একদিন সুবাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও দিন সেরকম কিছু হয়নি। হাসপাতালে এক দিন এসে সেই যে সুবাস চলে গেল আর দেখা পায়নি তার। সুবাস বলেছিল, আবার তাকে দেখতে আসবে কিন্তু কথা রাখেনি। ইচ্ছে করলে কি সুবাস তার ঠিকানা হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করে দেবব্রতবাবুর বাড়িতে যেতে পারত না! এ সব চিন্তা যত পুরনো হয়েছে তত মনে হয়েছে, তার কাছে সুবাসের আসবার কী কারণ থাকতে পারে? সে সুবাসদের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, একদিন যে হাসপাতালে এসে দেখা করে জিনিসপত্র দিয়ে গেছে তাই ঢের। কিন্তু সুবাস যে কথা দিয়েছিল আসবে— কথা দিয়ে না এলে বড় কষ্ট হয়। এখন এই মুহূর্তে সেই সব অভিমানগুলো যখন ওর মনে দুলতে শুরু করেছে, সুবাস বলল, 'নাও, এত দিন পর দেখা হল, একটা সিগারেট খাও।' চারমিনারের প্যাকেটটা সামনে এগিয়ে ধরতেই অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না সিগারেট সে খায় না তা নয়, কিন্তু ওই যে অত দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হল তারপর থেকে খাওয়ার ঝোঁকটাই একদম চলে গেছে। আর এখন মহীতোষ যে টাকা পাঠান তাতে সিগারেট খেতে গেলে খুব অসুবিধে হবে।

অনিমেষ এখন কী করছে তা জেনেটেনে নিয়ে সুবাস বলল, 'বাঃ, তুমি দেখছি বেশ গুডি বয়। যাক, তোমাদের ক্লাশ শুরু হয়েছে, ওখানে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল?'

'আপনাদের ছেলে মানে?' অনিমেষ অবাক হল।

সুবাস ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি স্কটিশে ছাত্র ফেডারেশন করতে না? অবশ্য করলে তো আমি জানতামই।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। ইউনিয়নের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।'

সুবাস এ বার অবাক হল, 'সে কী! আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তুমি বামপন্থী কথাবার্তা বলেছিলে।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না কী করে ব্যাপারটা বোঝাবে। সে যদি চটপট বলে বসে যে, আন্দোলনের ব্যাপারটা ওর কাছে স্পষ্ট নয় বলে সে সক্রিয় হতে পারেনি অথবা স্কটিশের ছাত্র ফেডারেশন কতগুলো বিলাসী ছেলের সময় কাটানোর একটা মাধ্যম বলে তার মনে হয়েছিল, তা হলে সুবাসদা সে কথা নিশ্চয়ই খুব সহজে মেনে নেবে না। ওর ভয় হচ্ছিল, এ কথা শুনলে বরং সুবাসদা ওকে ভুল বুঝতে পারে।

অনিমেষ বলল, 'আসলে আমার এই পা নিয়ে এত বিব্রত ছিলাম যে, কিছু করতে সাহস পেতাম না।' কথাটা শেষ করেই মনে হল উত্তরটায় ফাঁকি থেকে গেল। সে আবার বলল, 'তা ছাড়া, কোনও ব্যাপার অস্পষ্ট থাকলে আমার মন তার মধ্যে যেতে সায় দেয় না।'

'কিন্তু অস্পষ্টতা কীসের জন্য এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেছ কখনও?'

সুবাস ওর কাঁধে হাত রাখল। অনিমেষ উত্তর দিল, 'না, আসলে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা নিজেই ভেবে ঠিক করে নেওয়া যায়।'

সুবাসের হাতের আঙুল ওর কাঁধে শক্ত হল, 'না। আলোচনাই পথ পরিষ্কার করে। ঠিক আছে, এক দিন তুমি আর আমি বসব। একা একা লড়াই করা যায় না।'

অনিমেষ বলল, 'মাঝে মাঝে আপনার কথা ভাবতাম কিন্তু ঠিকানা জানি না যে দেখা পাব। ক'টা বাজে?'

সুবাস ঘড়ি দেখল, বারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। সে বলল, 'তুমি তো ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছ, চলো, তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিই।'

অনিমেষ অস্বস্তির গলায় বলল, 'কিন্তু আমার যে বারোটায় ক্লাশ।'

সুবাস বলল, 'কী সাবজেক্ট?'

অনিমেষ বলল, "বৈষ্ণব সাহিত্য।'

সুবাস হাসল, 'ওটা জেনে তোমার কী কাজে লাগবে? পরীক্ষার আগে তিন দিন চোখ বোলালেই নম্বর পেয়ে যাবে। বিমানের সঙ্গে আলাপ করো, দেখবে ভবিষ্যতে কাজ করতে সুবিধে হবে।' ক্লাশ না করে কোথাও যেতে খারাপ লাগছিল অনিমেষের। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিমান কে?'

সুবাস বলল, 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি।'

## পাঁচ

একতলার ক্যান্টিন রুমে সুবাস সেনের সঙ্গে ঢুকল অনিমেষ। এখানে ও প্রথম এল। বারোটার সময় ক্যান্টিনে ভিড় কম, কয়েকজন ভাত খাচ্ছে। ও পাশে তিন-চারজন ছেলে বেঞ্চিতে পা তুলে বসে গুলতানি মারছে। সুবাস একবার চোখ বুলিয়ে ক্যান্টিনের ম্যানেজারকে বিমানের কথা জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক পিছনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে।'

ওরা একটা বেঞ্চিতে বসলে সুবাস দুটো চায়ের জন্য হুকুম দিল। ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়ে এসেছে, এখনই চা খাওয়া ওর অভ্যাসে নেই কিন্তু অনিমেষ আপত্তি করল না। কলকাতার মানুষের কাছে এভরি টাইম ইজ টি-টাইম। দেবব্রতবাবুর বাড়িতে রাত দশটাতেও চা হত। অথচ স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে চা খাওয়ার এত চল নেই। বেশি খেলে শরীর কষে যায়—এরকম একটা ধারণা চা-বাগানের মানুষের। কলকাতার মানুষ হার্ট ভাল করতে ঘন ঘন চা খায়—এ রকম একটা খবর ক'দিন আগে কাগজে দেখেছে।

সুবাস চা খেতে খেতে বলল, 'বিমান খুব সিরিয়াস ছেলে। পলিটিক্যাল চিন্তাভাবনা ওর পরিষ্কার। কিন্তু মুশকিল হল সময়মতো কঠোর হতে পারে না, ফলে মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি চার বছর কলেজে থেকে কী করে এস এফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে চললে!'

অনিমেষ উত্তর দিল না। কথাটা এর আগেও সুবাস জিজ্ঞাসা করেছে। বোধ হয় কোনও সন্দেহ ওর মনে ঢুকেছে। সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'চুপচাপ কেন?'

অনিমেষ বলল, 'কোনও কারণ নেই। আসলে আমার তো একটা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে পায়ের জন্য, আর কোনও রিস্ক নিতে চাইছিলাম না।'

www.MurchOna.com

সুবাস বলল, 'রিস্ক মানে ?'

অনিমেষ উত্তর দিল, 'আমি যদি ফেল করতাম তা হলে আর পড়া হত না। বি এ একবারে পাশ করাটা জরুরি ছিল।'

সুবাস ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তুমি গ্র্যাজুয়েট। কতটা লাভবান হয়েছ তুমি ?'

'মানে ?' অবাক হল অনিমেষ।

'বি এ পাশ করে তোমার ক'টা হাত গজিয়েছে ? তুমি কোথাও দরখাস্ত করলে কেউ তোমাকে চাকরি দেবে ? সুস্থভাবে বাঁচার জন্য বি এ ডিগ্রিটা তোমাকে কী সাহায্য করবে ? এই যে তুমি বাংলা নিয়ে এম এ ক্লাশে ভরতি হয়েছ, ধরে নিলাম তুমি খুব ভালভাবে পাশ করবে, কিন্তু তারপর ?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সুবাস।

'এম এ পাশ করলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পাওয়া যাবে।' অনিমেষ বলল।

'ছাই পাওয়া যাবে! বোঝা যাচ্ছে তুমি কোনও খবরই রাখো না। স্ট্যাটিস্টিকস বলছে আঠারো লক্ষ বেকার গ্র্যাজুয়েট আর তিন লক্ষ বেকার এম এ আঙুল চুষছে। সংখ্যাটা প্রতি বছর বাড়বে। তোমার যদি কোনও মামা থাকে তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে তার জন্য এম এ পড়ার কোনও দরকার হয় না।' সুবাস সিগারেট ধরাল। কথাগুলো শুনতে শুনতে অনিমেষ কী রকম অসহায় বোধ করছিল।

সুবাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটা জিনিস ভাবলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাংলায় এম এ হওয়ার পর চাকরি করার সুযোগ কোথায় কোথায় আছে ? প্রথমে কলেজে তারপর স্কুলে। এই দুই জায়গার বাইরে দু'-একটা খবরের কাগজ, ব্যস। প্রতি বছর ক'টা চাকরির স্কুল কলেজগুলোতে বাংলার জন্য খালি হচ্ছে ? খুব জোর পঞ্চাশটা, অ্যাঁ ? অথচ দুটো ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরুচ্ছে প্রায় শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে। এই যে প্রত্যেক বছর দেড়শো করে ছেলেমেয়ে বেকার হয়ে থাকছে তারা কোথায় যাবে ? চাকরি দরকার বলে ওরা এমন প্রফেশনে ঢুকবে যার সঙ্গে বাংলায় এম এ পড়ার কোনও সংস্রব নেই। এটা কি কর্তৃপক্ষ জানে না ভাবছ ? নিশ্চয়ই জানে। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' কথাগুলো বলতে বলতে সুবাস দরজার দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। কথা শেষ করেই বলে উঠল, 'এই যে, বিমান এসে গেছে।'

অনিমেষ দেখল, ফরসা সুন্দর চেহারার একটি ছেলে ক্যান্টিনে ঢুকছে। শার্ট-প্যান্ট পরনে, চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। ওর পিছনে আরও দু'জন। ঘরে ঢুকেই বিমান সুবাস সেনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'আরে সুবাসদা, তুমি কতক্ষণ ?'

'মিনিট দশেক।' সুবাস ওর বাড়ানো হাতটা স্পর্শ করে বলল, 'কেমন আছ ?'

'চলছে। তোমাকে কিন্তু এখানে আশা করিনি।' বিমান ওর সঙ্গীদের কিছু বলতে তারা আবার বেরিয়ে গেলে সে ওদের পাশে এসে বসল।

'কেন ?'

'শুনেছিলাম তুমি বীরভূমে চলে যাচ্ছ। ওখানকার কাজকর্ম দেখবে।'

'ঠিকই শুনেছ। আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি। তোমার কাছে আসবার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। হঠাৎ এর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় মনে হল তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। সুবাস অনিমেষকে দেখাল।

পরিচয়-পর্ব শেষ হবার পর অনিমেষকে বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন কলেজ থেকে আসছেন ?' সুবাস বলল, 'ও স্কটিশে পড়ত। আসলে জলপাইগুড়ির ছেলে, এখানে হোস্টেলে থাকত। ওর একটা ব্যাপার ঘটেছিল সেটার সঙ্গে আমিও কিছুটা জড়িত।' বলে সে হাসল।

বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার ?'

অনিমেষ দ্রুত বলে উঠল, 'না, না, এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

সুবাস হাসছিল, বিমান ওদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'স্কটিশের যারা এ বার বেরিয়েছে তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না বলে মনে হচ্ছে।'

সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? ওরা কি সব ডান দিকে ?'

বিমান বলল, 'স্কটিশ দেখাশুনা করত অতীনবাবু। ওরা তো এখন আমাদের চিনের দালাল বলে বেড়াচ্ছে। ন্যাচারালি স্কটিশের ইউনিটটা ওদের মতকেই সমর্থন করছে। পুরোপুরি ক্লাশ শুরু না হলে

www.MurchOna.com

ঠিক বোঝা যাবে না আমাদের দিকে কারা কারা আছে। আপনার কি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে?'

অনিমেষ দেখল বিমান ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল। খবরের কাগজ থেকে আজ কারও জানতে বাকি নেই বিমান কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সেই চিন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই এই সব ব্যাপার চলছে। অনিমেষ অবাক হত একটা ব্যাপার দেখে, বিদেশি একটা রাষ্ট্রের আক্রমণের ফসল হিসেবে এ দেশের একটা বড় পার্টি ভাগ হয়ে গেল। পার্টির ভাগাভাগিটা সবে অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু তার প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন থেকে। স্কটিশে যারা ছাত্র ফেডারেশন করছে তারা পার্টিকেই সমর্থন করছে আর বিমান এবং নিশ্চয়ই সুবাসদারা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট অংশটার সঙ্গে রয়েছে। একই পার্টিতে দীর্ঘকাল একসঙ্গে থেকে পার্টির নেতারা চিন-যুদ্ধের পর দ্বিমত হলেন। একদল বললেন চিন আক্রমণকারী, অন্যদল মনে করলেন ওটা সীমান্ত সংঘর্ষ। ব্যস, ভাগাভাগি হয়ে গেল দলটা। কিন্তু সেই সঙ্গে খবরের কাগজে যে কথাটা লেখা হল সেটাই অনিমেষকে গুলিয়ে দেয়, ডানপন্থী কমিউনিস্টরা নাকি রাশিয়ার সমর্থক, বামপন্থীরা চিনের। কেন আমরা বিদেশি রাষ্ট্রের কথায় পরিচালিত হব, এটাই বুঝতে পারে না সে। বিমানের মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ উত্তর দিল, 'এ সব ব্যাপার আমি সিরিয়াসলি কখনও ভাবিনি।'

'ভাবেননি? নগরে যখন আগুন লাগে তখন কি দেবালয় অক্ষত থাকে? দেশের জন্য যদি চিন্তা-ভাবনা করেন তা হলে একটা সঠিক পথে আপনাকে যেতে হবে। পথটা কী নেবেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। ঠিক হয়ে গেলেই সেটা আপনার কাছে সঠিক পথ। আজকের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি ছাত্রের দায়িত্ব আছে।'

সুবাস এতক্ষণ শুনছিল, এ বার বলল, 'আমি এটুকু বলতে পারি অনিমেষ একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আসলে পলিটিক্যাল কনশাসনেস ওর মধ্যে আসেনি বলে ও এখনও মনস্থির করতে পারছে না।'

বিমান সোজা হয়ে বসল, 'আপনি ভাবুন, অনিমেষ। যদি কোনও ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকে তা হলে সরাসরি আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।'

এই সময় আরও কয়েকজন ছেলে ক্যান্টিনে ঢুকল। ওদের দেখে বিমান একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সুবাসদাও একটু উসখুস করছিলেন। দলটা থেকে একজন এগিয়ে এল, 'বিমান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী ব্যাপার!' বিমান ওদের দিকে তাকাল।

'আমাদের ছেলেদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না।' অনিমেষ দেখল যে ছেলেটি কথা বলছে তার মধ্যে কোনও জড়তা নেই। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরনে।

'কে বাধা দিচ্ছে, আমরা?'

'আমাদের কাছে তাই খবর।'

'কী রকম?'

'নবাগত ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানিয়ে যে সব পোস্টার দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছাত্র পরিষদের একটাও পোস্টার চোখে পড়ছে না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ওগুলো আমরা ছিঁড়েছি! কেন ছিঁড়ব? ওই সব পোস্টার পড়লে কি নতুন ছেলেমেয়েরা সব আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে? দ্যাখো মুকুলেশ, আমি চাই না কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে বিরোধ করতে। তোমাদের যদি সত্যি কোনও নালিশ থাকে তা হলে ভি সি-র কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন?'

'আমরা কী করব সেটা আমাদের বিবেচ্য। যেহেতু তুমি জি এস, আর বাম ছাত্র ফেডারেশন এই কাজ করছে তাই তোমাকে জানিয়ে রাখা হল। যদি একই রকম আচরণ চলতে থাকে তা হলে পরবর্তীকালে আমরা অন্য রকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

কথা শেষ করে ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, বিমান তাকে ডাকল। মুকুলেশ পেছন ফিরে তাকাতে বিমান বলল, 'তুমি আমাকে জানো, এই রকম ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না। তোমাদের পোস্টার কারা ছিঁড়ছে আমি জানি না, তবে ওই সব পোস্টার লেখার আগে তোমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। নতুন ছেলেমেয়েদের ওয়েলকাম করতে আমাদের গালাগালি করতেই হবে—এটা কী ধরনের ভদ্রতা? কই আমাদের পোস্টারে তো তোমাদের সম্পর্কে কোনও কথা বলিনি। রাজনীতির প্রথম কথাই কি অভদ্রতা?'

www.MurchOna.com

মুকুলেশ হেসে উঠল, 'রাজনীতির পাঠ তোমার কাছ থেকে নেবার আগে আমার আত্মহত্যা করা উচিত। নতুন যে সব মুরগি ঢুকছে তাদের ব্রেন-ওয়াশ করতে পারো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। তোমরা কতটা ভদ্র তার বিরাট লিস্ট আমার কাছে আছে। যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা রাখব।'

বিমান একটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে চোখ রাঙাতে এসেছ?'

মুকুলেশ দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি জেনারেল সেক্রেটারি, তোমাকে চোখ রাঙানোর সাধ্য কী! কিন্তু মনে রেখো, এই দেশটা ভারতবর্ষ, চিনের দালালদের আমরা ক্ষমা করব না।' যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ওরা।

অনিমেষ দেখল সমস্ত ক্যান্টিনঘর এখন চুপচাপ। যারা ও পাশে ভাত খাচ্ছিল তারা তো বটেই, এমনকী ক্যান্টিনের বয়গুলো পর্যন্ত কাজ ভুলে বিমানের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা নৈঃশব্দ্য কিছুক্ষণ সুতোর মুখে ঝুলতে থাকল। এতক্ষণ সুবাস সেন চুপচাপ শুনছিল, এবার নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী?'

সে নিজে হলে কী হত কে জানে, কিন্তু অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল বিমান খুব সহজেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'সেই পুরনো চাল, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। দিনরাত গালাগাল দেবে কিন্তু প্রতিবাদ করলেই ছাত্র ফেডারেশনের আক্রমণ বলে পোস্টার পড়বে।'

সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'পোস্টার ছেঁড়ার ব্যাপারটা কী?'

বিমান কাঁধ ঝাঁকাল, 'আরে যাচ্ছেতাই কথা লিখছে! নবীন ছাত্ররা চিনের দালালদের চিনে রাখুন। একজন দেশদ্রোহী আপনার পাশেই আছেন, যার গেঞ্জি চিন থেকে আসছে। এই সব পোস্টার দেখতে দেখতে কোনও ছেলে যদি মাথা গরম করে ফেলে এক-আধটা ছিঁড়ে ফেলে তা হলে আমি কী করতে পারি! ওদের চরিত্র সেই টিপিক্যাল গ্রাম্য ঝগড়াটে বুড়ির মতো হয়ে গেছে।'

সুবাস বলল, 'দক্ষিণীরা?'

বিমান হেসে ফেলল, 'ভাল বলেছ। তাদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের সংখ্যা সামান্য, শুনছি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে একটা আঁতাত হচ্ছে ওদের। এক সময় সবার চরিত্র প্রকাশ পাবেই।'

চার-পাঁচজন ছেলেকে খুব উত্তেজিত গলায় কথা বলতে বলতে এ দিকে আসতে দেখল ওরা। সবাই অনিমেষের সমবয়সী, দু'-একজনের চেহারা বেশ রাগী রাগী। ক্যান্টিনে ঢুকে ওরা সরাসরি কাছে চলে এল, 'কী ব্যাপার, শুনলাম মুকুলেশ নাকি তোমাকে মারতে এসেছিল?' একজন খুব উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'কে বলল?' অনিমেষ তাজ্জব হয়ে শুনল কী নিরাসক্ত গলায় কথা বলছে বিমান!

'সত্যি কি না একবার বলো। শালার লাশ নামিয়ে দেব আজই। এত বড় হেক্কড় যে তোমার গায়ে হাত তুলতে আসে! ফ্যাক্ট?'

বিমান ওদের উত্তেজিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'মারামারি করে কোনও লাভ হবে না। এস এফ গুণ্ডাদের পার্টি নয়। ওটা যাদের ধর্ম তারা করুক। তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে ওরা সেই সুযোগ নেবে।'

আর একজন বলে উঠল, 'কিন্তু গুরু, তোমাকে ইনসাল্ট করলে তো আমরা মুখ বুজে বসে থাকব না। মুকুলেশকে এর খেসারত দিতে হবে। শালা কি গায়ে হাত তুলেছে?'

বিমান হেসে ফেলল, 'তোমরা এত খেপে গেছ কেন? বলছি তো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি জানি কী করে এটা ট্যাকল করতে হবে।'

চুপচাপ শুনছিল অনিমেষ। একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হচ্ছিল ও, ছেলেগুলোর প্রশ্নের উত্তরে বিমান একবারও বলছে না ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তাকে মারেনি।

দলের আর একজন বলল, 'কিন্তু ওদের প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্যন্ত রোখা যাবে না। খামোকা জি এস-এর গায়ে হাত তুলবে আর আমরা সেটা সহ্য করব—শালারা টিটকিরিতে হাড় জ্বালিয়ে দেয়।'

বিমান দু' মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'সুদীপ এসেছে?'

'না, দেখিনি।' একজন জবাব দিল।

'একটু দ্যাখো। তোমরা ক্লাশে ক্লাশে বলে এসো যে আজ তিনটের সময় লনে আসতে। যা বলার আমরা সাধারণ ছাত্রদের কাছে সরাসরি বলব।'

'গেট মিটিং?'

www.MurchOna.com

'না, গেট মিটিং নয়। জাস্ট একটা গেট টুগেদার।'

'মাইক বলব?'

'দরকার নেই। আমার গলা ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। এ নিয়ে তোমরা কোনও গোলমাল কোরো না। তিনটে অবধি অপেক্ষা করতে বলো সবাইকে।'

ওরা চলে গেলে সুবাস বলল, 'খুব টেনশন দেখছি।'

'হবেই। সরকার ওদের হাতে, যা ইচ্ছে করলেও ভাইস-চ্যান্সেলার চুপ করে থাকেন, সেটাই ওদের সুযোগ। এটা আমাদের ছেলেরা সহ্য করতে পারে না। যাক, বীরভূমে তোমার কেমন কাজ হচ্ছে বলো।'

সুবাস সিগারেট ধরাল, 'ওখানে না গেলে সত্যি কিছুই জানতাম না। এখানে এই কলকাতা শহরের মানুষের যে প্রবলেম আছে, পলিটিক্যাল যে সব ঝামেলা আছে, গ্রামে গেলে তুমি তার সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারবে না। কমপ্লিট ডিফারেন্ট ব্যাপার। এমন এক-একটা গ্রাম আছে যেখানে স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ জানে না এমন মানুষের অভাব নেই। জওহরলাল, গান্ধী তাদের কাছে শিব নারায়ণের মতো ভগবানেরই একটা রূপ। ওরা কমিউনিস্ট বলে যাদের জানে তারা থাকে অন্য দেশে। যেন বর্গি কিংবা রাক্ষসের মতো ভয়ানক শত্রু, তারাই কয়েকদিন আগে এই দেশটাকে জয় করতে এসেছিল, ভাগ্যিস গান্ধী দেবতার শিষ্যরা ছিলেন তাই দেশ রক্ষা পেয়েছে। এইরকম অবস্থায় কাজ করা যে কী দুরূহ তা তোমরা বুঝবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ওদের যত সহজে কোনও সমস্যা বোঝানো যায়, শিক্ষিত মানুষকে তা সম্ভব নয়।'

'তুমি কলকাতায় ফিরছ কবে পাকাপাকিভাবে?' বিমান উসখুস করল।

'যবে পার্টি বলবে। তবে আমার ওখানে থাকতেই ভাল লাগছে। চলো, আজ উঠি, কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল অনেক।' সুবাস উঠে দাঁড়াতেই বিমান যেন দাঁড়াতে পারল। অনিমেষের মনে হল বিমানের উসখুস ভাবটা নিশ্চয়ই সুবাসদা লক্ষ করেছিলেন। বিমানের পলিটিক্যাল ধ্যানধারণা সুবাসদার কথা মতো হয়তো খুবই ভাল কিন্তু সুবাসদার দৃষ্টিভঙ্গি বিমানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এ ব্যাপারে অনিমেষের কোনও সন্দেহ নেই।

ক্যান্টিনের দরজায় গিয়ে সুবাস থমকে দাঁড়াল, 'ওই যা, চায়ের দামটা দেওয়া হয়নি। দাঁড়াও দিয়ে আসি।'

বিমান বাধা দিল, 'দিতে হবে না। ওটা আমার নামে লিখে রাখবে।' সুবাস শুনল না। দাম মিটিয়ে ফিরে এসে বলল, 'এই লিখে রাখা সিস্টেমটা খুব খারাপ ব্যাপার। খরচের হাত বেড়ে যায়, খেয়াল থাকে না।'

বিমান বলল, 'তুমি তো খুব হিসেবি, সুবাসদা।'

সুবাস বলল, 'আমাকে খুব কম অর্থে মাস চালাতে হয় বিমান। অনিমেষ, তুমি কি এখন ক্লাশে যাবে?' অনিমেষের খেয়াল হল ততক্ষণে দুটো পিরিয়ড অবশ্যই হয়ে গেছে। সবে শুরু হওয়া সেসনে পড়ানো এখনও সিরিয়াসলি শুরু হয়নি। তবু খামোকা ক্লাশে না যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ও ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সুবাস বলল, 'তা হলে আমি চলি। আবার কবে কলকাতায় ফিরব জানি না, এলে দেখা করব। বিমানের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে গেল, এখন কাজকর্ম শুরু করতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আজই যাচ্ছেন?'

'না, কাল সকালে। কেন?'

'কারণ নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।'

সুবাস অনিমেষকে একবার ভাল করে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি স্কটিশের কোন হোস্টেলটায় থাকো?' অনিমেষ ঠিকানাটা বলতে সুবাস মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, যদি সময় পাই সন্ধেবেলায় তোমার কাছে যেতে পারি।' অনিমেষ এটাই চাইছিল। সুবাসদার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলা দরকার। কী কথা তা এই মুহূর্তে ওর মাথায় নেই, সমস্ত ব্যাপারটা কী রকম ছায়া হয়ে আছে।

ওরা ক্যান্টিনের সামনের প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ বিমান চেঁচিয়ে একজনকে ডাকল, 'সু-দী-প।' বাঁ হাতে একটা মোটা চুরুট জ্বলছে, সুদীপকে এগিয়ে আসতে দেখল অনিমেষ। সমবয়সী একটি ছেলেকে চুরুট খেতে দেখতে খুব বেমানান দেখাচ্ছে। সিগারেট সবার হাতে মানিয়ে যায় কিন্তু ছেলেটি যে ভাবে চুরুট থেকে ধোঁয়া ছাড়ছে তাতে ওকে একটুও মানায় না। সুদীপের কথা

www.MurchOna.com

বলার ঢংটাও অদ্ভুত। কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলোর ওপর একটু জোর দিয়ে আলতো করে ছেড়ে দেওয়া। সুদীপ কাছে এসে বলল, 'মুকুলেশের ব্যাপারটা শুনলাম। চল, ইউনিয়ন রুমে বসা যাক।'

বিমান হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সুবাসদা, তুমি সুদীপকে চেনো তো!'

সুবাস বলল, 'বাঃ, আমি কি এখানে নতুন এলাম ?' সুদীপ হাসল না শব্দ করল অনিমেষ বুঝতে পারল না।

বিমান বলল, 'সুদীপ, এর নাম অনিমেষ, ফ্রেশার, স্কটিশ থেকে আসছে।' সুদীপ ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'স্কটিশচার্চ ? ওহো, ওখানকার একটা ছেলের কথা শুনলাম একটু আগে, খুব ইন্টারেস্টিং কেস।'

ওরা লনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ?'

'একটি ছেলে, নামটা কী যেন—কী যেন—, হ্যাঁ, ছেলেটি নাকি অ্যাকটিভলি পার্টির কাজকর্ম করে অথচ স্কটিশের স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি। সবচেয়ে বড় খবর লাস্ট মুভমেন্টে ওকে নাকি পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, লাকিলি বেঁচে গেছে। অনেকে বুলেটের দাগ দেখেছে।'

বিমান বলল, 'অদ্ভুত ঘটনা। এরকম একটা কেস কোনও কলেজে আছে আর আমরা জানব না ? ইম্পসিবল! সুবাসদা, তুমি জানো ?'

সুবাসদা হেসে ফেলল। অনিমেষ খুব অবাক হয়ে গেল। এত দ্রুত গল্পটা বাড়তে বাড়তে এইখানে চলে এসেছে। এ ভাবে যদি এগোয় তবে শেষ পর্যন্ত সে বিরাট বিপ্লবী হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ বিমান অনিমেষের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি তো স্কটিশ থেকে এসেছেন। ছেলেটিকে চেনেন ? কী পড়ে ?'

কাঁচুমাচু মুখে অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক সত্যি নয়।'

সুবাস হাসছিল, এ বার বলল, 'তোমরা যার কথা বলছ সে তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে ঘটনাটা হল পুলিশের বুলেট ওর পায়ে লেগেছিল এটা ঠিক, এক বছর নষ্ট হয়েছে, মারাও যেতে পারত, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওর কখনও কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। বাকিটা সবার মনগড়া গল্প।'

বিমান অনিমেষকে একদৃষ্টে দেখছিল, এ বার প্রশ্ন করল, 'পুলিশ আপনাকে কেন গুলি করল ?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'ভুল করে। দৌড়াচ্ছিলাম বলে ভেবেছিল আমিই বোম মেরেছি।'

সুদীপ নিবে যাওয়া চুরুট ঠিক করতে করতে বলল, 'কিন্তু তবু আপনি অভিনন্দনযোগ্য। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন, কমরেড।'

এই প্রথম কেউ তাকে কমরেড সম্বোধন করল। একই সঙ্গে অস্বস্তি এবং এক ধরনের খুশি অনিমেষকে টালমাটাল করল। কোনটার পাল্লা ভারী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে মুখ নিচু করে বলল, 'আপনারা বোধহয় তিলকে তাল করছেন, আমি তার যোগ্য নই।'

বিমান এক হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'আঘাতটা কেমন ছিল ?'

অনিমেষ বিমানের এরকম সহৃদয় ব্যবহারে আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দিল, 'আমি প্রায় আটমাস বিছানায় শুয়ে ছিলাম। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! তা হলে তো আমরা একসঙ্গে পাশ করেছি। অনিমেষ, আপনার পায়ে কি এখনও বুলেটের দাগ আছে ?' বিমান গাঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, ওটা মৃত্যু অবধি থাকবে। আমার থাইটা বীভৎস হয়ে আছে।'

'ভালই হল, আপনি আমাদের হাত শক্ত করুন।' বিমান ওর সঙ্গে করমর্দন করল।

সুবাসকে সামান্য এগিয়ে দিয়ে অনিমেষ দোতলায় উঠে এল। অনেকক্ষণ ক্লাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। বি সেকশনে ঢোকার তিনটে দরজা, অধ্যাপক যদি পড়ানোর ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেন তা হলে তাঁর পক্ষে লক্ষ করা সম্ভব নয় কেউ এল কি না। ও দিকে দেওয়াল ঘেঁষে মেয়েরা, এ পাশে দরজার দিকে ছেলেরা বসে আছে। অনিমেষ ইতস্তত করছিল ঢুকবে কি না। এই ভাবে ফাঁকা করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল দেখায় না। এখন যিনি বাংলা ছোটগল্প পড়াচ্ছেন তাঁর সম্পর্কে বাংলা নিয়ে যারাই পড়ে তাদের অসীম দুর্বলতা। গত চার বছরে অনিমেষ ওঁর লেখা সব ছোটগল্প-উপন্যাস গোগ্রাসে গিলেছে। একটা অদ্ভুত জীবন যেন ছিটকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ অন্যরকম আদল নিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়। ছোটগল্প যখন পড়ান তখন চট করে মনে হয় আমি প্যারিসের রাস্তায় হাঁটছি মোপাসাঁর হাত ধরে অথবা এডগার অ্যালান পোর সঙ্গে একটু আগে চা খেয়ে এলাম। পড়ানোটা এত আন্তরিক যে কান বন্ধ করতে ইচ্ছে করে না।

দরজার ধারে বসা দু'-তিনটি ছেলে অনিমেষকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে ইশারায় ভেতরে আসতে বলল। এরা স্কটিশ থেকে আসেনি। আলাপও হয়নি, ক'দিনের ক্লাশে শুধু চোখাচোখি হয়েছে মাত্র। মাথা নামিয়ে অনিমেষ চট করে দরজা ডিঙিয়ে সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। দু'-একজন এ দিকে তাকাল মাত্র কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করল না। অনিমেষকে যারা ডেকেছিল তাদের মধ্যে একজন, যে এখন ওর পাশে বসে আছে, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কলেজ ?'

'স্কটিশচার্চ', অনিমেষ উত্তর দিল।

'চার্চ ?' ছেলেটা চোখ বড় করল, 'চার্চ না সার্চ ? মেয়ে খোঁজার জায়গা। মাইরি তোমাদের কপাল সোনা দিয়ে বাঁধানো। আমাদের কলেজের ধারেকাছে মেয়ে ছিল না।' দাঁত বের করে হাসল সে। ছেলেটিকে ভাল করে দেখল অনিমেষ। নীল ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি পরনে, সাধারণ মানুষের তুলনায় যথেষ্ট বেঁটে। ওপরের দাঁতগুলো একটু উঁচু বলে মুখ খুললেই মনে হয় হাসছে। ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা সহজ ব্যাপার ছিল যে অনিমেষ রাগ করতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কলেজ আপনার ?'

'সিটি। কিন্তু নো আপনি-টাপনি। আমি শালা মেয়েদেরই ডাইরেক্ট তুমি বলছি।'

এর মধ্যে কখন পড়ানো থেমে গিয়েছিল বুঝতে পারেনি অনিমেষ। হঠাৎ ছেলেটি পা দিয়ে ওর পায়ে টোকা মারতে দেখতে পেল ক্লাশসুদ্ধু সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ তুলে তাকাতেই অধ্যাপকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। লম্বা মানুষটা নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু চাপা হাসি উঠল ঘরটায়, অনিমেষ বুঝতে পারছিল ওর মুখে রক্ত জমছে। অধ্যাপক এ বার হাতের বইটা টেবিলের ওপর মুড়ে রেখে খুব ধীরগলায় অনিমেষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব জরুরি কথা হচ্ছিল কি ?' উত্তর দিতে হলে উঠে দাঁড়াতে হয়, অনিমেষের মনে হল এর চেয়ে লজ্জা সে জীবনে কখনও পায়নি। ওই ছেলেটা যদি মিছিমিছি তার সঙ্গে কথা না জুড়ত তা হলে এই পরিস্থিতিতে ওকে পড়তে হত না। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'আমরা কিন্তু একটু জরুরি কথা বলছিলাম। ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেটা এখন মানা যায় না। এ ব্যাপারে তুমি বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবে।' অধ্যাপকের ঈষৎ সরু গলা অনিমেষকে কাঁপিয়ে দিল। ও অনুভব করছিল একটা বিরাট ফাঁদ ওর জন্য পাতা হচ্ছে এবং সেটা জানা সত্ত্বেও ওই ফাঁদে পা বাড়ানো ছাড়া তার কোনও উপায় নেই।

অধ্যাপক বললেন : 'আচ্ছা, আজকালকার একটা গল্পের কথাই ধরা যাক। তুমি ইদানীং যে সব গল্প পত্রপত্রিকায় পড়েছ তার মধ্যে কোন গল্পটা তোমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে, আমরা ওই গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।' অধ্যাপক ওর দিকে সহানুভূতির চোখে তাকালেন। সমস্ত ছেলেমেয়ের মুখ ওর দিকে ফেরানো। অনিমেষ বুঝতে পারছিল ওর সর্বাঙ্গে ঘাম জমছে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করে গত পূজাসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার সেই গল্পটা মনে করল। পড়তে পড়তে সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গিয়েছিল, পড়া শেষ হলে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। প্রথম দিন ওই অধ্যাপকের ক্লাশে এসে সেই গল্পটার সঙ্গে ওঁকে মেলাতে চেষ্টা করেছিল সে, মেলেনি। লেখকদের সঙ্গে লেখা মেলেনা বোধহয়। মন ঠিক করে ফেলল অনিমেষ, তারপর পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি সত্যি কথা বলতে পারি ?'

'আশ্চর্য! খামোকা মিথ্যে বলতে যাবে কেন ?' অধ্যাপক বিস্মিত হলেন।

এ বার অনিমেষের মনে দ্বিধা নেই, সে গল্পটির নাম উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের কপালে তিনটি ভাঁজ পড়ল, ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে নিঃশব্দে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। কয়েকটা মুহূর্তের অপেক্ষা, বোধহয় অধ্যাপকের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যই, হঠাৎ ক্লাশ ফেটে গেল হাততালিতে। সবাই প্রায় একসঙ্গে অনুরোধ করতে লাগল গল্পটি নিয়ে আলোচনা করতে। অধ্যাপক অনিমেষকে আর একবার দেখে টেবিল থেকে বই টেনে সবাইকে এক হাত তুলে থামালেন। তারপর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধিমানদেরও মনোযোগী হতে হয়। আচ্ছা, আমরা যেখানে থেমেছিলাম— ।'

আবার পড়ানো শুরু হল নতুন করে। অনিমেষ ধীরে ধীরে বেঞ্চিতে বসতেই পাশের ছেলেটি চাপা গলার বলে উঠল, 'গুরু, একটা লেগ দেখি!'

আর কথা বলতে এ বার ভয় হল। সে জড়োসড়ো হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকল। অধ্যাপক তাকে যে ভাষায় তিরস্কার করলেন সে ভাবে কোনও মানুষ তাকে কানও দিন করেনি। একটুও না

www.MurchOna.com

রেগে যে ঠিক জায়গায় শাসনটাকে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটা এই প্রথম অনুভব করল অনিমেষ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ও মুখ নামাল। অধ্যাপকের সরু গলার মধ্যে এমন মাদকতা আছে, শব্দগুলো এমন গল্প হয়ে যায় যে সত্যি অন্য দিকে মন দিতে ইচ্ছে করে না। সামনে সার সার মাথা, অনিমেষ ছোটগল্পের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে হঠাৎ কেঁপে উঠল। সামনের মাথাগুলোর সামান্য ফাঁক একটা সরলরেখায় অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। সেই রেখার শেষে যে বসে আছে তার দুটো চোখ এখন ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ। অমন আয়ত গভীর দৃষ্টি যেন মনে হয় সমস্ত হৃদয় ওই চোখে মাখানো—অনিমেষ বুকের মধ্যে অজস্র ঝরনার চাঞ্চল্য আবিষ্কার করল। দৃষ্টিটা সরছে না কিন্তু একটু বাদেই সরলরেখাটা ভেঙে গেল। মাথাগুলো সামান্য নড়াচড়া করতেই চোখদুটো হারিয়ে গেল। বুকের মধ্যে থম ধরে গেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়—অনিমেষ কোনও কারণ বুঝতে পারছিল না। এরকম হল কেন তার? অধ্যাপকের পড়ানোটা কান দুটোয় পৌঁছাচ্ছে না। যেন ওর সব ইন্দ্রিয় হঠাৎ অকেজো হয়ে গিয়েছে। শুধু দুটো চোখ একটা পদ্মফুলের মতো মুখের ওপর থেকে সরাসরি উঠে এসে তার রক্ত নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঘন্টা পড়েছে, অধ্যাপক ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কখন টের পায়নি অনিমেষ। কে একজন এসে ওকে বলল, 'স্যার তোমাকে পরে প্রফেসারস রুমে দেখা করতে বলেছেন।'

অনিমেষ বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ পিছন থেকে শুনল, 'লেগটা দিলে না গুরু?' সে অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সিটি কলেজের ছেলেটিকে দেখতে পেল।

'তোমাকে একটু প্রণাম করতাম। টি. জি-কে যেভাবে বোল্ড করলে গুগলি দিয়ে---তুমি মাইরি সাধারণ মাল নও।' সত্যি সত্যি হাসল ছেলেটি।

অনিমেষ বলল, 'আমার নাম অনিমেষ, তোমার নাম কী?

'পরমহংস রায়। পরম বলে ডাকাই ভাল, শেষেরটা শুনলে খারাপ লাগে।'

'পরমহংস?' অনিমেষের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এরকম নাম কোনও মানুষের হয়? ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, 'হ্যাঁ, শুদ্ধচিত্ত সংযতাত্মা নির্বিকার ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগীপুরুষ। আমার ঠাকুরদার আমাকে ওই ভূমিকায় দেখার বাসনা ছিল।'

আরও তিন-চারজন ছেলে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল, তারা এ বার খুব জোরে হেসে উঠল। ওরা যখন কথা বলছে তখন অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে করিডোরে যাওয়া-আসা করছে। বাংলা ক্লাশে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। অনিমেষ আড়চোখে তাদের দেখছিল। এখন সেই ঝিমঝিমে ভাবটা অনেক কম কিন্তু উত্তেজনা কমে গেলে ওর যেমন হয়, পেটের ভেতর চিনচিন করছিল। না, সেই চোখদুটোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত সে ক্লাশ থেকে বের হয়নি। এখন মুষ্টিমেয় ছাত্রী ওই ঘরে আছে, গেলেই দেখা হয়ে যাবে, কিন্তু অনিমেষের যেতে সাহস হচ্ছিল না। পরমহংস চা খাওয়ার প্রস্তাব করল কিন্তু অনিমেষের এখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না তার এরকমটা কেন হচ্ছে? স্কটিশে ওদের সঙ্গে প্রচুর মেয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকারের সুন্দরী ছিল। কিন্তু কখনও তাদের দেখে ওর মনে এরকম চাঞ্চল্য আসেনি। নীপা বলে একটা মেয়ে ওদের সঙ্গে বাংলা অনার্সে ছিল। প্রথম দিনের পরই সে ওদের সঙ্গে তুই-তোকারি করেছে, একটা ছেলের সঙ্গে নিজের কোনও তফাত রাখেনি। অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের সহপাঠীদের মধ্যে কেউই নীপাকে প্রেম নিবেদন করেনি। অথচ এখন ওই চোখদুটি দেখার পর থেকে ওর এরকমটা হচ্ছে কেন?

পরের ক্লাশ আরম্ভ হবার সময় অনিমেষ দেখল সুদীপ করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে। হাতে তেমনি আধপোড়া চুরুট। ওকে দেখে সুদীপ একটা হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলল। অনিমেষের পাশে তখনও পরমহংস ছিল। সে চাপা গলায় বলল, 'লিডার আসছে, তুমি চেনো নাকি?'

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে এক পা এগোতেই সুদীপ কাছে এসে গেল, 'তোমাকে খুঁজছিলাম, এইটে তোমার ক্লাশ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন কমরেড।'

একটা অবাক গলায় অনিমেষ বলল, 'কেন?'

'শোনো, তুমি অবশ্যই তিনটের সময় লনের মিটিং-এ যাবে আর বাঁ দিকের থামের নীচে দাঁড়াবে যাতে প্লাটফর্ম থেকে তোমাকে স্পষ্ট দেখা যায়।' নেবা চুরুটটা টানল সুদীপ।

www.MurchOna.com

## ছয়

তিনটের ক্লাশটা শেষ হলে অনিমেষ পরমহংসকে বলল, 'চলো একবার নীচের লনে যাই।'

পরমহংস বলল, 'ধ্যুৎ, ওখানে গিয়ে কী হবে! রোজ এক কথা, এস এফ বলবে তাদের মতো ভাল দল আর কেউ নেই, ছাত্র পরিষদ বলবে ওরাই ধোয়া তুলসীপাতা। এ সব শুনে আমার কী লাভ হবে? ও সব ছেঁড়াছেঁড়ি খাওয়া-খাওয়ির মধ্যে আমি নেই।'

অনিমেষ হেসে ফেলল বলার ধরনে, 'তুমি দেশের কথা ভাবো না?'

'দেশের কথা?' হাঁ করে তাকাল পরমহংস, 'তুমি তো হেভি খ্যাপা! দেশের কথা কেউ ভাবে নাকি! সবাই নিজের ধান্দা হাসিল করার জন্য দেশের নামটা ব্যবহার করে। যে যত দেশের কথা বলবে সে তত মাল গোটাবে।'

অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে, তবু মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে যাই চলো। তা ছাড়া, স্টুডেন্টস লিডাররা নিশ্চয়ই আমাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে, দেশের ব্যাপারটা তো এখানে জড়িত নয়।' অনিমেষের একা যেতে ভাল লাগছিল না। স্কটিশে সে অনেককে বক্তৃতা করতে দেখেছে কিন্তু সেগুলো কেমন ছেলেমানুষি ব্যাপার। শোনার ইচ্ছে হত না তেমন। আজ বিমানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর একটা কৌতূহল ওর মনে জেগেছে, ওরকম ধীর স্থির এবং সুবাসদার কথামতো পলিটিক্যালি কনশাস একটি ছেলে কেন একবারও দলের ছেলেদের বলল না কেউ ওর গায়ে হাত তোলেনি। নিশ্চয়ই হঠাৎ-ডাকা আজকের মিটিং-এ এ ব্যাপারে কিছু জানা যাবে।

পরমহংস বললেন, 'আচ্ছা, প্রথম দিন, তোমার কথা ফেলব না। কিন্তু ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট, তারপর কেটে পড়ব।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে পড়াশুনা করো?'

পরমহংস ঘাড় বেঁকিয়ে ওর মুখের দিকে পিটপিট করে তাকাল, 'তুমি মাইরি হয় ডুপ্লিকেট, নয় মেড ইন মফস্বল। কোনটা?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'প্রথমটা কী আমি বুঝতে পারছি না, তবে আমার বাড়ি ডুয়ার্সে।'

'তাই বলো! নইলে এ সব ফর্মা বেরোয় মুখ থেকে! বাংলা নিয়ে এম. এ. বেশির ভাগ ছেলে পড়ে কেন জানো না? পড়ে যাতে ক্লাশের বাকি সময়টা আড্ডা মারা যায়। যারা ফার্স্ট ক্লাশের ধান্দায় থাকে তাদের কথা আলাদা, সেকেন্ড ক্লাশ এম. এ-র জন্য পরীক্ষার আগে ছাড়া বাংলা পড়তে হয় না। আমি এখান থেকে বেরিয়ে কফি হাউসে যাব, তারপর হেঁটে চিৎপুরে গিয়ে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরব।' পরমহংস জিভে একটা তিক্কুটে শব্দ করল।

এতক্ষণে সব ছেলেমেয়েরা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেছে। আজ ওটাই শেষ পিরিয়ড ছিল। অনিমেষ দেখল তিনটি মেয়ে নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। তাদের একজনের মুখ নীচে নামানো, কিন্তু অনিমেষের বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না এই সেই মেয়ে। ওরা তিনজনই কিন্তু একবারও এদিকে ফিরে তাকাল না। মুখ না দেখতে পেলেও অনিমেষ শরীরটাকে পিছন থেকে দেখে সম্পূর্ণ চেহারাটা অনুমান করে ফেলল। অত সুন্দর চেহারার মেয়ে অমন করে ওর দিকে চেয়েছিল কেন? শুধুই কৌতূহল? তার উত্তর শুনে অন্য ছেলেমেয়েরা খুশি হয়েছিল যেমন, তেমনই ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিল এইমাত্র? কিন্তু ওই চোখদুটোর মধ্যে কেন অত কথা জমা থাকে?

পরমহংস ব্যাপারটা লক্ষ করছিল, চাপা গলায় বলল, 'পিচ খুব খারাপ গুরু। ডিফেনসিভ না খেললেই আউট হয়ে যাবে।'

থতমত হয়ে অনিমেষ বলল, 'মানে?'

পরমহংস পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ওনারা বেথুনের জিনিস। তিনদিনেই বুঝে গেছি নাকের ডগা আকাশে বেঁধে রেখে এসেছেন।'

ওরা লনে এসে দেখল তেমন কিছু ভিড় হয়নি। বড় জোর শ'খানেক ছেলে এবং কিছু মেয়ে একটা উঁচু চাতালের সমানে জমা হয়েছে। মাইকের কথা তখন নিষেধ করেছিল বিমান কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটা পোর্টেবল মাইক এসে গেছে। তাতে একজন ছাত্রবন্ধুদের কাছে সমানে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে সভায় দলে দলে যোগদানের জন্য। চাতালের পিছনে লাল কাপড়ে ছাত্র ফেডারেশনের ফেস্টুন টাঙানো। অনিমেষ আর পরমহংস সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। হঠাৎ পরমহংস

www.MurchOna.com

ওকে মনে করিয়ে দিল, 'এই, তোমাকে লিডার আদেশ করে গেল বাঁ দিকের থামের নীচে দাঁড়াতে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো ও পাশে গিয়ে দাঁড়াই।'

কথাটা তখন খেয়াল করেনি, এখন মনে পড়তে অনিমেষ দ্বিধায় পড়ল। সুদীপ তাকে ওই জায়গাটায় দাঁড়াতে বলেছিল যাতে মঞ্চ থেকে ওকে ওরা দেখতে পায়। মঞ্চ যদি এই চাতালটা হয় তা হলে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে দেখার কী দরকার? নাকি ওরা দেখতে চায় সে সভায় হাজিরা দিয়েছে, মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে? রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, সে এমন কিছু কথা দিয়ে আসেনি যে বিমানরা ওর ওপর এখন থেকেই কর্তৃত্ব করবে! মিটিং-এর বক্তব্য সে শুনতে চায়, কেউ দেখুক বা না দেখুক তার বয়ে গেল। সে পরমহংসকে বলল, 'এখান থেকেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ও দিকে যাওয়ার দরকার নেই।'

একটু বাদেই চাতালের পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়ের সমবেত শ্লোগানের পর বিমান এসে মাঝখানে দাঁড়াল হাতে কিন্তু মাইক নেই। সবাই চুপ করতে ওর গলা শোনা গেল, 'বন্ধুগণ, আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজকের এই সভার পিছনে কোনও প্রস্তুতি নেই, বিশেষ কারণে আমাদের মিলিত হবার প্রয়োজন হয়েছে।' একটু থামল বিমান, অনিমেষ লক্ষ করল বিমানের বলার ভঙ্গি খুব স্বচ্ছন্দ, যেন এক টেবিলে বসে কথা বলছে। তা ছাড়া ওর গলার স্বর যে ওইরকম পরদায় পৌঁছাতে পারে, না শুনলে অনুমান করা যায় না। ওরা যে এত দূরে আছে কিন্তু শুনতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। বিমান তখন কেন মাইক প্রয়োজন হবে না বলেছিল এখন বোঝা গেল।

'বন্ধুগণ! আপনারা জানেন ছাত্র ফেডারেশন কখনওই হিংসায় বিশ্বাসী নয়। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ এবং ছাত্রবন্ধুদের কাজ করতে চাই। মিথ্যে কুৎসা এবং ভণ্ডামিকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু আমাদের ওপর সেই সব জঞ্জাল চাপিয়ে দেবার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের কমরেডদের দিন-রাত প্ররোচনা করা হচ্ছে উত্তেজিত হতে। একবার যদি উত্তেজিত করতে পারে আমাদের কর্মীদের তা হলে যে ভুল তারা করবে তার ফসল তুলতে ওরা মুখিয়ে আছে। আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবেদন করছি কোনও অবস্থাতেই আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে আমরা নাকি ওদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছি এবং নবাগত বন্ধুরা সেই মহামূল্য পোস্টার দর্শনে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু কে কখন কী পোস্টার ছিঁড়ছে তার কোনও প্রমাণ ওঁরা আমাকে দেননি। আমরা হাওয়ার ওপর বাস করতে পারি না। আর তাদের পোস্টারে কী লেখা থাকে? না, তাদের উদ্দেশ্য বা কর্মপন্থার খবর সেখানে পাবেন না। নবাগত ছাত্রদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন আমাদের গালাগালি দিয়ে। একটা পোস্টারে যদি আশি ভাগ আমাদের কথা লেখা থাকে তা হলে সেটা ওদের পোস্টার কী করে হল! আমি ওদের কাছে সামান্য ভদ্রতা আশা করেছিলাম, কিন্তু উলটে ওরা আমাকে চোখ রাঙিয়ে গেল।

'নতুন বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি কাদের কথা বলছি। না, দক্ষিণপন্থী ছাত্র ফেডারেশন সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয় তখন তার মস্তিষ্ক স্থির থাকে না, না হলে আজ ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলাবে কেন? আমি ছাত্র পরিষদের কথা বলছি। ওরা বলে এই দেশে স্বাধীনতা ওরাই এনেছে, এই দেশকে সোনায় মুড়ে দেবার জন্য ওরা সংগ্রাম করছে। আমরা নাকি চিনের দালাল, দেশের শত্রু। এই কথা নিয়ে আমি অনেকবার সভায় বলেছি, আমাদের বক্তব্য আপনারা জানেন। চিন না আমেরিকা, সে প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। কিন্তু সোনায় মুড়ে দেবার ব্যাপারটা কার ক্ষেত্রে খাটে! দশটা পরিবারকে সোনায় মুড়ে দেবার জন্য ওরা এই দেশের মানুষকে ছিবড়ে করে দিয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে? আমাদের গালাগাল না দিয়ে ওরা ভেবে দেখুক তারা কার দালাল। ওদের হাতে সরকার আছে, পুলিশ আছে, শুধু গায়ের জোর আর ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক'দিন দমন করে রাখা যায়?' বিমান সামান্য থামল, শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোধ হয় বুঝতে চাইল। পরমহংস চাপা গলায় বলল, 'এ বার নির্ঘাত হাততালি পড়বে।' কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বিমানের বক্তৃতায় শ্রোতাদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হল বোঝা গেল না। কারণ, সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, বিমান আবার গলা তুলল, 'যারা আমাদের চিনের দালাল বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদের জেনে রাখা উচিত আমরা জনসাধারণের সুখ-দুঃখে তাদের সঙ্গেই আছি, কারণ আমরাই তাদের লোক, কয়েকজন শিল্পপতির দালাল নই। বন্ধুগণ, বর্তমান কংগ্রেস সরকার দেশের অর্থনীতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, সব জায়গায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান যাতে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ছাত্র পরিষদের বন্ধুরা সেই কাজই

www.MurchOna.com

করছে। আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি জঘন্য কাজের নমুনা উপস্থিত করতে পারি। এই সরকারের পুলিশ, ছাত্র পরিষদের পুলিশ যে কত নির্মম তার শিকার আমাদের এক ছাত্রবন্ধু, যিনি তাঁর জীবনের অমূল্য একটি বছর হারিয়েছেন। কমরেড অনিমেষ, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে এগিয়ে আসুন।'

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে একটা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর অনিমেষ আবিষ্কার করল ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পরমহংস ওর বাহু ধরে বলে উঠল, 'এই তোমার নাম করছে!' ওর কথা যাদের কানে গিয়েছিল তারা অবাক চোখে অনিমেষকে দেখতে লাগল। বিমানের ইচ্ছেটা বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মতন। ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তাকে মেরেছে কি না এই প্রশ্নের জবাবে সভা ডেকেছে বিমান। এখনও সে প্রসঙ্গে না গিয়ে হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকাডাকি কেন ? তার একটা বছর নষ্ট হয়েছে এটা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার, বিমানের এ ব্যাপারে কী বলার আছে! পুলিশ তো তাকে ছাত্র ধারণা করে গুলি করেনি।

বিমান আবার ডাকল, 'অনিমেষ, কমরেড, আপনি এগিয়ে আসুন। এটা দ্বিধা করার সময় নয়, সমবেত ছাত্রবন্ধুদের ব্যাপারটা জানানো দরকার।' বিমানের চোখ বাঁ দিকের থামের কাছে, সেখানে সুদীপকে ব্যস্ত হয়ে কাউকে খুঁজতে দেখা গেল। এ বার অনিমেষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল কেন সুদীপ তাকে ক্লাশে এসে ওখানে থাকতে বলে গেছে। কিন্তু বিমান তো মিটিং ডাকার কথা বলেছে তার ব্যাপারটা জানবার আগেই, তা হলে আসল প্রসঙ্গে না গিয়ে ওকে নিয়ে পড়ল কেন ?

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা এখন উসখুস করছে। ব্যাপারটা যেন খুব মজার, জেনারেল সেক্রেটারি যার নাম ধরে ডাকছে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিমানের মুখ লাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে সে চার পাশে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ছাত্র অনিমেষকে বলল, 'আপনার নাম কি অনিমেষ ?' ওর বদলে পরমহংস ঘাড় নাড়তে ছেলেটি বলল, 'আপনাকে বিমান ডাকছে শুনতে পাচ্ছেন না ?'

এ বার অনিমেষের মেজাজ গরম হয়ে গেল। তাকে ডাকলেই যেতে হবে ? আর এই পরমহংসটা যদি তার নাম উচ্চারণ না করত তা হলে এতক্ষণে ও পাশ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন আরও অনেকের চোখ এ দিকে পড়েছে। কী করা যায় ? পরমহংস চাপা গলায় বলল, 'ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের ভয় পেলে চলে না। সোজা ক্রিজে দাঁড়িয়ে ব্লক করতে শুরু করে দাও।'

এর মধ্যে সুদীপ ওখানে পৌঁছে গেছে। অনিমেষের এক হাত ধরে সে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল সামনে। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল অনিমেষ, 'আমি কী করব, আমাকে ডাকছেন কেন ?' সুদীপ কোনও জবাব দিচ্ছিল না। বিমান ওদের দেখতে পেয়ে আবার গলায় জোর পেল, 'এই যে, আমাদের বন্ধু কমরেড অনিমেষ এসে গেছেন। কোনও কোনও মানুষ প্রচার চান না, নীরবে কাজ করে যেতে ভালবাসেন, অনিমেষ সেইরকম একজন। অত্যন্ত লাজুক এই ছেলেটি তাই আমার ডাকে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। যা হোক, আমি যে মিথ্যে বলিনি সেটা একটু বাদেই আপনারা বুঝতে পারবেন।'

ততক্ষণে অনিমেষ চাতালের কাছে পৌঁছে গেছে। বিমান এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে চাতালে তুলে দিল। অনিমেষ এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। বিমান চাপা গলায় বলল, 'ডোন্ট গেট নার্ভাস। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সময়।' কোনও রকমে অনিমেষ বলতে পারল, 'আমি কী করব বিমানদা ?' বিমান কোনও উত্তর না দিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হাত মাথার ওপর তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল। গোলমাল একটু শান্ত হয়ে এলে বিমান আবার কথা শুরু করল, 'বন্ধুগণ, কমরেড অনিমেষ এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। উনি এ বছর বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়া শুরু করেছেন। কিন্তু এই বছর ওঁর সিক্সথ ইয়ার হওয়ার কথা ছিল। কে তার এই সর্বনাশ করল, না আমাদের উপকারী বন্ধু পুলিশ। বিনা প্ররোচনায় সম্পূর্ণ অকারণে অনিমেষকে গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা। যখন অনিমেষ মাটিতে পড়ে একটু নিশ্বাসের জন্য ছটফট করছেন তখনও তারা অত্যাচার থামায়নি। আমাদের সৌভাগ্য যে তবু তিনি বেঁচে গেছেন। আপনারা দেখুন, নিজের চোখে সেই বীভৎস অত্যাচারের নমুনা দেখুন। গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, সময় থেমে থাকেনি, কিন্তু সেই রক্তাক্ত অত্যাচার ওঁর শরীরে চিরকালের জন্য ছাপ রেখে গেছে। কোনও ভাঁওতা সেটা মুছে ফেলতে পারবে না। অনিমেষ, আপনি সঙ্কোচ করবেন না, আমাদের ছাত্রবন্ধুদের ওই দাগটি দেখান।'

www.MurchOna.com

কুলকুল করে ঘামতে লাগল অনিমেষ। ওর মাথায় আর কিছু ঢুকছিল না। কেন তাকে ওই দাগ দেখাতে হবে এবং সেটা করতে তার ইচ্ছে আছে কিনা এ সব কথা তাকে আলোড়িত করছে না। এখন যে-কোনওভাবে সে নেমে যেতে পারলেই বাঁচে। সামনে সারি সারি মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। পাশে বিমান ছাড়া সুদীপ এবং আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে। বিমান আবার চাপা গলায় কিছু বলল কিন্তু সেটা আর কানে ঢুকছে না অনিমেষের। কিন্তু তার পরনে প্যান্ট আর দাগটা হাঁটুর ওপরে, কী করে সহজ ভঙ্গিতে সেটা এত মানুষকে দেখানো যায়!

সুদীপ বলল, 'বৃষ্টিতে আমরা যে ভাবে প্যান্ট গুটিয়ে রাস্তায় জল ভাঙি সে ভাবেই না হয় প্যান্টটাকে গুটিয়ে নিন কমরেড।'

বক্তৃতা নয়, যেন নাটক দেখছে একটা, ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ হাজার গুণ বেড়ে গেল। ঠেলে ঠুলে চাতালের কাছে আসবার চেষ্টা করত লাগল সবাই, যেন কাছাকাছি হলে ভাল করে দেখা যাবে এবং সে সুযোগ কেউ হারাতে চাইছে না। প্রথমে যত শ্রোতা ছিল এখন তার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

সম্মোহিতের মতো নিচু হয়ে ও প্যান্টের তলায় হাত দিল। একটা একটা ভাঁজ ফেলতে ফেলতে প্যান্টটা হাঁটুর ওপরে উঠে এল। ততক্ষণে ভাঁজগুলো মোটা হয়ে গেছে বেশ, পরের ভাঁজটা করতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সামনের মানুষগুলোর মুখ থেকে। তেলতেলে বীভৎস চামড়াটাকে পরমুহূর্তেই আড়াল করে প্যান্টটাকে নামিয়ে আনল অনিমেষ। বিমান ততক্ষণে কথার সুতো ধরেছে, 'বন্ধুগণ আপনারা নিজের চোখে আজ দেখলেন। কিন্তু যারা গুলি করেছিল তারা জানে না ওই বীভৎস চিহ্নটা আগামিকালের একজন সৈনিক তৈরি করে দিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লন কাঁপিয়ে হাততালি উঠল। বিমান চিৎকার করল, 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল, 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।' সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক—নিপাত যাক নিপাত যাক।' 'দালালদের চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন।'

এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত অনিমেষের শরীরে যেন ফিরে আসছিল। ক্রমশ অন্ধ রাগ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া কান্না ওর দুটো চোখ ঝাপসা করে দিল। আজ প্রকাশ্যে যে কাজটা সে করল সেটা করার জন্য কোনও রকম মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না। মাঝে মাঝে স্নান করার সময় গোপনে ওই দাগটাকে সে দেখেছে, আঙুল বুলিয়ে সেই যন্ত্রণাকে সে স্পর্শ করেছে, কিন্তু সেটা ছিল তার একদম নিজস্ব ব্যাপার। সেটাকে এমন প্রকাশ্যে হাজির করে সবার করুণা কুড়োতে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা অপমান আছে যেটা এতক্ষণে তার ভিতর বাইরে জ্বলুনি ছড়াচ্ছে। নিজেকে সঙের মতো মনে হচ্ছে এখন। ছাত্র ফেডারেশনের জয়ধ্বনি দিয়ে জমায়েতটা তখনই শেষ হল।

ওরা চাতাল থেকে নেমে এলেও কিছু উৎসুক ছাত্র অনিমেষের চার পাশে ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চাইছে কী অবস্থায় পুলিশ গুলি করেছিল, তখন অনিমেষ কী করছিল এবং ব্যাপারটা কত দিন আগে ঘটেছিল—এই সব। বিব্রত অনিমেষকে সরিয়ে আনল সুদীপ। সে ছেলেদের বলল, 'আপনাদের আগ্রহ স্বাভাবিক, কিন্তু অনিমেষ একটু আপসেট হয়ে আছে, প্লিজ এ নিয়ে এখন আলোচনা করবেন না।' সুদীপ যখন ওকে নিয়ে এগোচ্ছে তখনও ছেলেরা পিছন পিছন আসছিল। তা দেখে সে অনিমেষকে বলল, 'ভিনি ভিডি ভিসি। এক দিনেই তুমি হিরো হয়ে গেলে। বাংলাদেশে ফিল্‌ম স্টারদেরই এই ভাবে ক্রাউড ফলো করে। কনগ্রাচুলেশনস।' সত্যি বলতে কী, অনিমেষের এখন একা হাঁটতে ভয় করছিল। এত লোক যদি তাকে নানান রকম প্রশ্ন শুরু করে তা হলে সে পাগল হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিমানের সঙ্গে কথা বলা দরকার। এই রকম একটা ব্যাপার করার আগে বিমান কেন তার সঙ্গে পরামর্শ করেনি? সুবাসদা তার সঙ্গে বিমানের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মাত্র, তার মানে এই নয় যে বিমান ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেবে। সুদীপ তাকে যেখানে নিয়ে এল সেটাই যে ইউনিয়ন রুম সেটা বুঝতে সময় লাগল। চতুর্দিকে নানা রকম ফেস্টুন, পোস্টার স্তূপ করে রাখা আছে। বেঞ্চিতে বেশ কিছু ছেলে সরবে আলোচনা করছে। গলার স্বরে বোঝা যায় তারা এখন খুব খুশি। ও পাশের একটা টেবিলে বিমান কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিল, ওদের দেখে হাসল, 'এসো অনিমেষ, প্রথমবার ইউনিয়ন অফিসে আসাটা একটু সেলিব্রেট করি। এই ক্যান্টিনে চা বলে এসো তো।' পাশের একটি ছেলেকে কথাটা বলতেই সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেল।

ওদের দেখে দুটো চেয়ার খালি হয়ে গিয়েছিল। তার একটাতে সুদীপ বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুরুটটা ঠিক করতে লাগল। অনিমেষ বসতেই বিমান বলল, 'তোমাকে অ্যাডভান্স কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে রাখি, নেক্সট ইউনিয়ন ইলেকশনে তোমাকে হারাতে পারে এমন কোনও ক্যান্ডিডেট নেই।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ হাঁ হয়ে গেল। ইলেকশন ? মানে ইউনিয়নের নির্বাচনের কথা বলছে বিমান ? সে ইলেকশনে দাঁড়াবে ? সে দাঁড়ালে ছাত্ররা তাকে ভোট দেবে ? চট করে বাবার মুখটা মনে পড়ে গেল ওর। কোনও রকম রাজনীতি কিংবা ইউনিয়নের মধ্যে যেতে তিনি পইপই করে নিষেধ করে গেছেন। এত দিন, স্কটিশে পড়ার এই সময়ে সে কখনওই সেই আদেশ অমান্য করেনি। করেনি তার কারণ শুধু বাবা নন, সে নিজে ব্যাপারটা ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না, পরবর্তী সময়ে দেশের কাজ করার যে ইচ্ছে শৈশবে ওর মনে জন্ম নিয়েছিল পনেরোই আগস্টের সকালে, নিশীথবাবু কংগ্রেসের পতাকার তলায় সেই ইচ্ছেটাকে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সুনীলদা বামপন্থী রাজনীতিতে তাকে আকৃষ্ট করেন। এখন সেই কলকাতায় বিগত কয়েক বছরের অরাজনৈতিক জীবনে সে নিজে মনে মনে অনেক কিছু ভাবত এবং সেই ভাবনাগুলো কংগ্রেস সমর্থনপুষ্ট ছিল না। তাই বলে কমিউনিস্ট পার্টিতে সরাসরি কাজ করবে কি না এ ব্যাপারটা কখনও স্পষ্ট ছিল না। ছাত্র ফেডারেশন করা মানে কমিউনিস্ট পার্টি করা নয়। কিন্তু এত দিনে সে জেনে গেছে যে কোনও ছাত্র সংগঠনের কর্মপদ্ধতি এক-একটা রাজনৈতিক দলের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনিমেষ বিমানকে সরাসরি বলে ফেলল, 'আপনি আজ যে কাজ করলেন সেটা আগে জানলে আমি উপস্থিত থাকতাম না।'

চা এসে গিয়েছিল, কাপটা এগিয়ে দিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল বিমান, 'মানে ?'

'এই ভাবে নিজেকে এক্সপোজ করে সিমপ্যাথি পাওয়া খুব লজ্জার। তা ছাড়া ওই বুলেটের দাগটা পুলিশ আমাকে ছাত্র হিসেবে দেয়নি। ট্রাম পুড়ছিল, ওরা ফায়ার করেছে, আমি আহত হয়েছি মাঝখানে পড়ে গিয়ে। এর সঙ্গে আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই।' অনিমেষ সোজা চোখে বিমানের দিকে তাকাল।

হেসে ফেলল বিমান, 'তুমি নেহাতই ভাল মানুষ। ঠিক আছে, তুমি তো শিশু নও, যখন আমি তোমাকে ডেকে দাগটা দেখাতে বললাম তখন প্রতিবাদ করলে না কেন ?'

মুখ নামাল অনিমেষ, 'তখন কেমন হয়ে গেলাম, আর তা করলে আপনাকে অপমান করা হত—।'

কথাটা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল বিমান। ঘরের সবাই এ বার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বিমান হাসি শেষ করে বলল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে তোমার কোনও মানসিক সুস্থিতি নেই। দ্যাখো, মহাভারতেই তো আছে ভালবাসা এবং যুদ্ধে কোনও রকম অন্যায় নেই। শঠতা সেখানে একটা জয়ের কৌশল মাত্র। আমরা চাই সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই সংগঠনের সঙ্গে আসুক যাতে আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারি। সব মানুষ যদি আজ কমিউনিস্ট পার্টির পাশে দাঁড়ায় তা হলে রাতারাতি দেশের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বুর্জোয়া দল তা হতে দেবে না। তারা বাধা দেবে কায়েমি স্বার্থের দুর্গ আগলে রাখতে। তাই এখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধে আনফেয়ার শব্দ অচল। তা ছাড়া পুলিশ যে তোমাকে গুলি করেছে এতে কোনও মিথ্যে নেই, তাই না ?'

ঠান্ডা চা মুখে দিতে ইচ্ছে করছিল না। বিমানের কথাগুলোর ঠিক কীভাবে প্রতিবাদ করা যায় বুঝতে না পেরে সে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল। হঠাৎ বিমান কেমন অন্যরকম গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি ইলেকশনে দাঁড়াতে ইচ্ছে নেই ?'

অনিমেষ সরল হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'কেন ? সুবাসদা বলে গেলেন তুমি আমাদের মত এবং আদর্শকে সমর্থন করো। তা হলে এটাই তো একমাত্র রাস্তা।' বিমান অবাক হল।

'দেশের কাজের সঙ্গে ইউনিয়নের কী সম্পর্ক ?'

'বাঃ, কোনও শিশু কি এক দিনেই হাঁটতে শেখে ? তাকে একটা নিয়মের মধ্যে বড় হতে হয়। ছাত্র ফেডারেশনে সক্রিয় কাজ করতে করতে তুমি ছাত্রদের প্রব্লেম নিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করবে। এটাকেই একটা মিনি দেশ ভাবো না কেন! সেই সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের দেশের রাজনৈতিক ফোকরগুলো যদি চিনিয়ে দাও, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি যদি সহানুভূতি আনতে সাহায্য করো তা হলে এরাই যখন পরবর্তী কালে দেশের নাগরিক হবে তখন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা সহজ হয়ে যাবে, তাই না ?'

এই সময় আরও কিছু ছেলে এসে বিমানের কাছে দাঁড়াল। ওদের দেখে বিমান অনিমেষকে বলল, 'কমরেড, আজ এই পর্যন্ত, আর এক দিন না হয় আমরা বসব। তুমি মন ঠিক করে নাও। দুর্বলতা থেকে কখনওই কোনও ভাল সৃষ্টি হয় না।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বিকেল শেষ হতে চলেছে। সামনের লন একদম ফাঁকা। কোনও ছাত্রছাত্রী ধারে-কাছে নেই। সাধারণত সে কলেজ স্ট্রিটের দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করে, আজ হেয়ার স্কুলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে বেরুল। দরজার সামনেই বিরাট পোস্টার, 'সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ভিয়েতনাম থেকে হাত ওটাও।' পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা আমেরিকান বেয়নেটের ডগায় ভিয়েতনামি শিশুকে গেঁথে রাক্ষুসে হাসি হাসছে। ছবিটা অনেকক্ষণ দেখল অনিমেষ। ভিয়েতনামের ঘটনা এত দিনে তার জানা হয়ে গেছে। হো চি মিন নামের একজন মানুষের নেতৃত্বে নিরক্ষর অসহায় ভিয়েতনামিরা আজ এক হয়ে আমেরিকান মিলিটারির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ভিয়েতনাম, তবু সেখানে সাম্রাজ্য অটুট রাখার বাসনায় আমেরিকা পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। কেন ? শুধু ক্ষমতার অহঙ্কার মানুষকে কতটা উন্মত্ত করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ছবিটা মাথায় নিয়ে অনিমেষ হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে চলে এল। ততক্ষণে ওর পরমহংসের কথা মনে পড়ল। সেই সুদীপ যখন ওকে চাতালের দিকে ধরে নিয়ে গেল তারপর আর ওর দেখা মেলেনি। তখন ওর ওপর খুব খেপে গিয়েছিল অনিমেষ কিন্তু এখন আর রাগটা নেই। পরমহংস তো ইচ্ছে করে তাকে বিপাকে ফেলবে বলে নাম ধরে ডাকেনি। ছেলেটার সঙ্গে আজই আলাপ কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে অনিমেষের। খুব সহজ হয়ে ফটাফট কথা বলতে পারে। মনে পড়ল পরমহংস বলেছিল মিটিং থেকে বেরিয়ে কফি হাউসে যাবে, সেখান থেকে টিউশনি। ওর পোশাক দেখে অবস্থা খারাপ বলে মনে হয় না, তবু টিউশনি করে কেন ? অনিমেষের মনে হল বাবার পাঠানো গোনাগুনতি টাকায় তাকে যখন খুব কষ্ট করে চালাতে হয় তখন সেও তো পরমহংসের মতো টিউশনি করতে পারে। কিন্তু তাকে কে টিউশনি দেবে ? কলকাতায় এসে কোনও পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়নি এক দেবব্রতবাবু ছাড়া। পরমহংসকে বললে হয়। অবশ্য জীবনে সে কখনও কাউকে পড়ায়নি, কিন্তু একটু দেখে নিলে স্কুলের যে-কোনও ছাত্রকে না পড়াতে পারার কোনও কারণ নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দেখল ট্রাম-বাসে বেজায় ভিড়। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সাধারণত ও যখন ফেরে তখন ভিড় থাকে না। এখন এখান থেকে ট্রামে ওঠা অসম্ভব। ঠিক উলটো দিকে ইন্ডিয়ান কফি হাউসের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল ওর। পরমহংসকে ওখানে গেলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছেলেটা যখন দেখল সে একটা বিপদে পড়েছে, তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে মিটিং শেষ না হওয়া অবধি ওর জন্য অপেক্ষা করল না কেন ? কলকাতায় বোধ হয় কেউ কারও বন্ধু হতে পারে না। পরমহংসের ওপর একটু অভিমান জমতে না-জমতেই হেসে ফেলল অনিমেষ। ছেলেটার সঙ্গে আজ দুপুরেই প্রথম আলাপ হল আর সে অনেক কিছু ভেবে বসছে। চট করে নিজের পছন্দমতো ভাবার এই স্বভাবটা যে সে কবে ছাড়তে পারবে!

ট্রামরাস্তা পেরিয়ে সে গলিটার মধ্যে চলে এল। কফিহাউসের দরজার পাশেই এক মাঝবয়সী মানুষ সিগারেট বিক্রি করছে। অনিমেষকে দেখে সে খুব পরিচিত হাসি হাসল। অবাক হল অনিমেষ, লোকটা তাকে চেনে নাকি, এমন ভঙ্গি করছে যেন আগেও দেখা হয়েছে। অনিমেষ মুখ নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়েও অবাক হয়ে গেল। পর পর অনেকগুলো লিটল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন, প্রত্যেকেই এক-একটা দারুণ বিস্ফোরক সংখ্যা বের করছে বলে দাবি করছে। দোতলায় উঠতে মনে হল একটা বাজার কাছাকাছি রয়েছে। খুব চেঁচামেচি করে কেনা-বেচা চলছে সেখানে। দরজায় দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে গেল অনিমেষ। বিরাট হলঘর জুড়ে টেবিল-চেয়ার আর তাতে ভরতি মানুষ। এত বড় রেস্টুরেন্ট সে কখনও দেখেনি। সবাই একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আর সেই শব্দরাশি অনেক উঁচু ছাদের তলায় পাক খেয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলছে। অনিমেষ এই ভিড়ের মধ্যে পরমহংসকে দেখতে পেল না। চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরে যাবে বলে ভাবছে, তখন লক্ষ করল কয়েকজন ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। সে মুখ ঘোরাতেই একজন উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বসবেন ?' নিজেদের টেবিল দেখাল সে। একটু ঘাবড়ে গিয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না।

'আপনাকে আজ মিটিং-এ দেখলাম।' হাসল ছেলেটি। 'আপনার কোনও অসুবিধা হয় না?' সে তার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল। অনিমেষ এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চায় না, সে দ্রুত ঘাড় নেড়ে দরজার দিকে ফিরে গেল। খুব বিরক্তি লাগছিল তার, এখন থেকে কত লোককে যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে! নিজের কোনও গোপন দুঃখ বা যন্ত্রণা যদ্দিন নিজের থাকে সে একরকম, কিন্তু সেটা জানাজানি হয়ে গেলেই তার ধার কমে যায়।

www.MurchOna.com

দরজার বাইরে এসে অনিমেষ দেখল ওপরের সিঁড়ি দিয়ে কিছু ছেলেমেয়ে হইহই করে নীচে নামছে। তার মানে তেতলাতেও বসার জায়গা আছে! কৌতূহল নিয়ে অনিমেষ পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এল। দু'দিকে দুটো দরজা। ডান দিকেরটা দিয়ে ঢুকতেই লবি মতন একটা জায়গা, দু'পাশে দুটো ব্যালকনি, অনেকটা ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আদলে। তেতলায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি, কারণ প্রতিটি টেবিলে শাড়ি চোখে পড়ছে। ঠিক এই সময় নিজের নাম শুনতে পেল অনিমেষ। চিৎকার করে যে ডাকছে সে পরমহংস তাতে সন্দেহ নেই। অনিমেষ দেখল বাঁ দিকের ব্যালকনির একদম কোনায় একটা বিরাট ফ্যানের সামনে টেবিলে ওরা বসে আছে। পরমহংস আর তিনটে মেয়ে। ও ইতস্তত করে ঘাড় নেড়ে পরমহংসকে উঠে আসতে বললে পরমহংস তেমনি চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে একটা চেয়ার আছে, চলো এসো।'

অপরিচিত মেয়েদের মধ্যে গিয়ে বসতে অনিমেষের সঙ্কোচ হচ্ছিল, কিন্তু এর পরে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনটি মেয়েই এ বার তাকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। অগত্যা পায়ে পায়ে সে ওদের টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খালি চেয়ারটায় কতগুলো বই রাখা ছিল, মেয়েরা সেগুলো তুলে নিতে পরমহংস বলল, 'তুমি তো গুরু বর্ণচোরা আম। প্রথম আলাপে আমাকে এমন ভড়কি দিলে যে আমি ভাবলাম—। যাক, মাঠে নেমেই তা হলে সেঞ্চুরি করে ফেললে! বসো বসো।

পরমহংস সব সময় হাসে কি না বোঝা যায় না দাঁত উঁচু থাকাব জন্য। কিন্তু অনিমেষ বুঝল কথাটার মধ্যে একটু ঠাট্টা মেশানো আছে। চেয়ারে বসে সে বলল, 'তুমি না বলে চলে এলে কেন?'

'যাচ্চলে। তোমাকে ভি আই পি রিসেপশন দেওয়া হচ্ছে আর আমি ফেকলুর মতো দাঁড়িয়ে থাকব। আমি ভাই জনতার লোক, রাজনীতি বুঝি না। তা হঠাৎ এখানে?'

'তোমাকে খুঁজতে এলাম।'

'সত্যি?'

'বাঃ, মিথ্যে বলতে যাব কেন? তখন বললে না কফিহাউসে আসবে।'

'নাঃ, তোমার দ্বারা রাজনীতি হবে না। আজকের ও সব ব্যাপারের পর তো তোমার আমার কথা খেয়ালই করা উচিত নয়। যাক, ও সব ব্যপারে পরে কথা বলব। তুমি তো এদের কাউকে চেনো না!' পরমহংস মেয়েদের দিকে হাত দেখাল।

এক পলক মুখগুলো দেখে নিয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না। পরমহংস বলল, 'আমিও চিনতাম না, এরা সবাই বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়ে, অন্য সেকশনে।'

ওদের মধ্যে যার চেহারা খুব রোগা সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিও কি বাংলা?'

অনিমেষ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মেয়েটি বলল, 'বাংলায় এম. এ. যে সব ছেলেরা পড়ে তাদের নিয়ে দারুণ দারুণ গল্প আছে।'

পরমহংস বলল, 'সেই চিড়িয়াখানার বাঘের গল্প তো! ও পুরনো হয়ে গিয়েছে।'

বাকি দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠল পরমহংসের বলার ধরনে। অনিমেষ গল্পটা শুনেছে কিন্তু ও পরমহংসের দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল। গল্পটা শুনলেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকারটা ভারী হয়ে আসে, কিন্তু ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা মজা আছে যে মনটা খারাপ হওয়ার সুযোগ পেল না।

রোগা মেয়েটা পরমহংসকে বলল, 'আপনি পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো ওর সঙ্গে!'

পরমহংস হাত উলটে বলল, 'আমাকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল? আমি তো নিজে থেকে আপনাদের টেবিলে এসে জুড়ে বসলাম।'

এ বার আর একটি মেয়ে জবাব দিল, 'আপনি পরমহংস, চোখ-কানগুলো বন্ধ করে রেখেছেন, সবাই তো তা নয়।'

পরমহংস বলল, 'অ। ইনি হচ্ছেন নবনীতা, আত্রেয়ী এবং অনন্যা। আর এর নাম অনিমেষ স্কটিশ থেকে পাশ করেছে। আর খুব বড় নেতা হবার সুযোগ ওর সামনে অপেক্ষা করছে।'

রোগা মেয়েটি, যার নাম আত্রেয়ী, বলল, 'বুঝলাম না।'

পরমহংস বলল, 'যারা ব্রিটিশ আমলে এক দিন জেল খেটেছিল তারাই মন্ত্রী হবার সুযোগ আগে পেয়েছে স্বাধীনতার পর। আর এখন যারা পুলিশের হাতে ধোলাই খাবে তারা মন্ত্রী হবে আগামিকালে। অনিমেষের পায়ে বিরাট দাগ আছে পুলিশের বুলেটের। ওকে কে মারে!'

তিনজনই অবাক চোখে অনিমেষকে দেখল। অনিমেষ পরমহংসের ওপর রাগতে পারছে না কিন্তু এখানে কিছু বলাও যায় না। আত্রেয়ী বলল, 'আপনাকে পুলিশ গুলি করেছিল কেন? আপনি কি অ্যাকশন করেছেন কখনও?'

অ্যাকশন! অনিমেষ ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, 'না, না, ওটা একদম নিছক দুর্ঘটনা। পরমহংস বাড়িয়ে বলছে।' তারপর কথা ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কোন কলেজে পড়তেন?'

অনন্যা জবাব দিল, 'বেথুন।'

শব্দটা শুনেই অনিমেষের সেই চোখ দুটো মনে পড়ল। পরমহংস বলছিল সেও নাকি বেথুন থেকে এসেছে। অনিমেষ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কলেজে কি বাংলার ছাত্রী বেশি?'

আত্রেয়ী জবাব দিল, 'না আমরা পাঁচজন এক সেকশনে আছি। অন্য সেকশনে আরও ন'জন আছে। সবসুদ্ধ চোদ্দো, কেন?'

প্রশ্নটা অনিমেষকে একটু বিপাকে ফেলে দিল। সে একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'না মানে, আরও কয়েকজন বেথুন থেকে এসেছেন শুনে মনে হল ওখানে বাংলার ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি।'

আত্রেয়ী বলল, 'কী বোকা বোকা কথা বলছেন, চোদ্দোজন মোটেই বেশি নয়।'

নবীনতা বলল, 'আর কাদের কথা শুনেছেন?'

অনিমেষ পরমহংসের দিকে তাকালে সে চোখ টিপে বলে উঠল, 'ছাড়ো তো যত আজেবাজে কথা। অনিমেষ, মেয়েদের কাছে মেয়েদের সম্পর্কে কখনও কৌতূহল দেখাবে না।'

আত্রেয়ী বলল, 'আপনার খুব অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে?'

পরমহংস মাথা নেড়ে বলল,'শরৎচন্দ্র থেকে বিমল মিত্তির আমি গুলে খেয়েছি।'

কথা বলার ধরনে সবাই হেসে উঠলে অনিমেষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হঠাৎ পরমহংস অনিমেষকে চটজলদি বলে উঠল, 'এই, চোখ বন্ধ করো তো।'

'কেন?' অনিমেষ অবাক হল।

'করো না! একটা মজার জিনিস বলব। এই কফি হাউসটা এককালে বক্তৃতার জায়গা ছিল। বড় বড় নেতারা এখানে বক্তৃতা দিতেন। এর নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। সেই সব বক্তৃতা নাকি সারা দেশে সমুদ্রের ঢেউ তুলত। এখনও এত দিন বাদে এই কফিহাউসে বসে সেই সমুদ্র গর্জন শুনতে পাবে।' পরমহংস বলল।

সবাই একসঙ্গে অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'কী রকম?'

পরমহংস ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে বলল, 'প্রথমে দুটো কান হাতের চেটোয় চেপে ধরো, ধরেছ, হ্যাঁ, এ বার চোখ বন্ধ করো। এক মিনিট বাদে চোখ না খুলে কান থেকে হাত সরিয়ে নাও।'

ওর কথামতো ওরা ঠিকঠাক করে গেল। চারজনই একসঙ্গে এ রকম ব্যাপার করছে—দৃশ্যটা ভেবে হাসি পাচ্ছিল অনিমেষের। কিন্তু সে যখন কান থেকে হাত সরিয়ে নিল চারপাশে কেমন গুমগুম শব্দ শুনতে পেল। যেন কিছু গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আর আসছে। এটা যে বিভিন্ন টেবিল থেকে ওঠা কথার আওয়াজ সেটা বুঝে বেশ মজা লাগছিল ওর। এমনি আচমকা টের পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ কান বন্ধ থাকায় ব্যাপারটা এই চেহারা নিয়েছে।

পরমহংস বলল, 'কী, সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে?'

চোখ খুলে অনিমেষ হেসে বলল, 'আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি, তাই ঠিক—।'

অনিমেষের কথা আটকে গেল। ও দেখল একটি ছেলের সঙ্গে নীলা ওপাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই কয় বছরে নীলার স্বাস্থ্য ভরাট হয়ে অন্য রকম আদল এনেছে। ওর সঙ্গের ছেলেটিকে সে কখনও দেখেনি। খালি টেবিল না পেয়ে নীলা চারপাশে চোখ বোলাতে অনিমেষকে দেখতে পেল। যেন নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না নীলার চোখমুখের অভিব্যক্তি এইরকম।

## সাত

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়েছিল। নীলাকে অনেক দিন বাদে দেখছে সে। ওর সেই প্রেমিকের অনুরোধের পর আর যাওয়া হয়নি দেবব্রতবাবুর বাড়িতে। কিন্তু নীলার সঙ্গে এখন যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে সে কে? ওর প্রেমিকের নামটা মনে করতে চেষ্টা করল অনিমেষ। হ্যাঁ, শ্যামল, শ্যামল এখন কোথায়? শ্যামলের সঙ্গে নীলার কি সম্পর্ক তৈরি হয়নি? না হলে শ্যামল আত্মহত্যা কিংবা খুন দুই-ই করতে পারে বলে মনে হয়েছিল তখন। সেরকম কিছু হলে অবশ্যই কাগজে খবরটা পড়ত সে।

এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অভদ্রতা। অনিমেষ পরমহংসকে বলল, 'আমি একটু আসছি।'

চেয়ারগুলো বাঁচিয়ে নীলাদের কাছাকাছি আসতেই সে একটা ঠাট্টার গলা শুনতে পেল, 'আরে ব্বাস, আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি কি ঠিক দেখছি?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'এত অবাক হবার কী আছে ? এখানে তো সবাই আসতে পারে। তারপর ?'

'আগে তো কখনও এখানে দেখিনি!' নীলার বিস্ময় যেন কাটছিল না।

'আমি আজ প্রথম এলাম।' জানাল অনিমেষ, 'এসে অবশ্য মাথা ধরে যাচ্ছে। কী চিৎকার চেঁচামেচি, লোকে বসে থাকে কী করে!'

নীলার সঙ্গী বলল, 'আপনি আজ প্রথম এলেন ? অবশ্য প্রথম দিন ওরকম মনে হয়, পরে এমন নেশা ধরে যায় এখানে না এলে ভাল লাগে না। বাংলা সাহিত্য শিল্পের আঁতুড়ঘর হল কফিহাউস। এখানে লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলন করে এক-একজন বড় সাহিত্যিক হয়েছেন। রোজ এলে বুঝবেন নেশার ধরনটাই আলাদা।'

নীলা তখনও একদৃষ্টে অনিমেষকে দেখছিল। সেটা লক্ষ করে অনিমেষ বলল, 'বাবা কেমন আছেন ?'

'আমার সঙ্গে কখনও দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবে বলে এতদিন অপেক্ষা করছিলে ? জানতে ইচ্ছে করলে তো নিজেই যেতে পারতে।' নীলা চোখ সরাচ্ছিল না।

'আসলে যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠে না।' অনিমেষ পাশ কাটাতে চাইল।

এইসময় একটা টেবিল খালি হতেই নীলার সঙ্গী দ্রুত গিয়ে সেটা দখল করে ডাকল, 'চলে আয়, ভ্যাকেন্সি হয়ে গেছে।'

নীলা হেলতে দুলতে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। অনিমেষ লক্ষ করল নীলাকে একজন পূর্ণযুবতী মহিলার মতো দেখাচ্ছে। বালিকাদের শরীরে যে সব ছেলেমি ভাব থাকে তার বিন্দুমাত্র ওর মধ্যে নেই। ভরাট লাবণ্যময়ী নদীর মতো শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গেল নীলা। ওই টেবিলে যে সব মেয়ে এখনও বসে আছে তারা কেউ এখনও এই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। নীলাকে এখন চট করে ফিল্ম স্টার অথবা বনেদি বাড়ির বউ হিসেবে ভেবে নেওয়া যায়।

নীলাদের টেবিলে গিয়ে বসবে, না পরমহংসদের কাছে ফিরে যাবে, দোমনা করছিল অনিমেষ। এত দিন বাদে নীলাকে দেখে ভাল লাগছে, ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আবার পরমহংসদের টেবিলে ফিরে গেলে এক ফাঁকে ওকে টিউশনি জোগাড় করে দেবার কথা বলে রাখা যেত। সামান্য আলাদা রোজগার এখন বিরাট সাহায্যের হবে। অনিমেষ দেখল নীলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। অনিমেষ ঠিক করল প্রয়োজন তো চিরকাল থাকবে কিন্তু এই মুহূর্তের ইচ্ছেটাকে জোর করে দাবিয়ে রাখা আরও মূর্খামি। সে নীলাদের টেবিলে এসে বসল। নীলা এখনও হাসছে। দুটো উজ্জ্বল চোখ কী রকম কৌতুকে হেসে ওঠে।

অনিমেষ একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী হল ?'

নীলা ঘাড় কাত করে আরও একটু দেখে নিয়ে বলল, 'কলকাতার জল পেটে পড়লে কী রকম পরিবর্তন হয় তাই দেখছি।'

নীলার সঙ্গী বলল, 'তোর মাইরি এই পেছনে লাগা হ্যাবিটটা গেল না।'

নীলা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'চেহারা অনেক চকচকে হয়েছে, চোখের চাহনি, কথাবার্তা এবং মাথার চুল অনেক মার্জিত হয়েছে। মোটামুটি কলকাতা শহর তোমাকে একজন প্রেমিকের চেহারা দিয়ে দিয়েছে।'

অনিমেষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'চমৎকার আবিষ্কার।'

হঠাৎ নীলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'কফি হাউসে প্রথম দিন এসেই ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারতে আরম্ভ করেছ। তোমার মেয়ে-ভাগ্য খুব ভাল দেখছি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল অনিমেষ। কোনও মেয়ে এরকম কথা ছেলেদের সঙ্গে বলতে পারে ? কথাটা এমনিতে মনে হয় নিরীহ কিন্তু অশ্লীল ইঙ্গিতটুকু তো এড়ানো যায় না।

নীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করল, 'কলকাতায় প্রথম এসে অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলে। আজ অবধি কেউ কখনও শুনেছে কোনও নার্স গায়ে পড়ে একজন পেশেন্টের খবর তার পরিচিতের কাছে পৌঁছে দেয় ? তারপর যখন জ্ঞান এল তখন চোখ খুলেই আমাকে দেখতে পেলে। অবশ্য তখন তোমার চোখের দৃষ্টি ছিল নিপাট ভালমানুষের। এর পর এত কলেজ থাকতে বেছে বেছে স্কটিশে ভরতি হওয়া হল। কফি খাবে তো ?'

একই ভঙ্গিতে শেষ প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে অনিমেষ চট করে জবাব দিতে পারল না। ও দেখল পিছনে একটা উর্দিপরা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে নীলা তিনটে কফি দিতে বলল। তারপর হেসে অনিমেষকে জানাল, 'অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম বিপ্লবীকে। যদি বাসনা থাকে তবে প্রমীলা-রাজ্যে ফিরে যেতে পারো।'

নীলার সঙ্গী বলল, 'বাঃ, কফি বলে দিয়ে এখন যেতে বলছিস কেন?'

নীলা বলল, 'আমি তো যেতে বলছি না। বলেছি যদি চায় তো যেতে পারে, কি, তাই বলিনি অনিমেষ? এ কী, এমন ঝিমিয়ে গেলে কেন?'

নীলার বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল অনিমেষ। মেয়েরা খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে কথা বললে তাদের একটা সৌন্দর্য আসে। নীলাকে তাই এখন সুন্দরী দেখাচ্ছে। কোনও ওপরচালাকি নয়, নীলা যে কথাগুলো বলল প্রতিটির ওপর যেন পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল ওর। অনিমেষ খুব আস্তে আস্তে অথচ স্পষ্ট গলায় বলে ফেলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে নীলার ভ্রূ দুটোয় কুঞ্চন লাগল। আর নীলার সঙ্গী হো হো করে হেসে বলে উঠল, 'রাইটলি সার্ভড। নীলা, এ-ভাবে তোকে রিটার্ন দিতে আর কাউকে দেখিনি।'

নীলা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। কলকাতার জল যে এরকম ভিজে বেড়াল করে দেয় তা জানতাম না। তা বেশ, আমাকে সুন্দর দেখে কী করতে ইচ্ছে করছে?'

অনিমেষ কথাটা একদম না ভেবে উচ্চারণ করেছিল। সত্যি, নীলাকে ওর খুব সুন্দরী মহিলা মনে হচ্ছে। সামান্য মোটা হওয়ায় চাপা গায়ের রঙের ওপর শোভন পালিশ এসেছে। মুখের কোথাও দাগ নেই, বুকের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হয়। কিন্তু কথাটা নিয়ে এমন ঠাট্টা জুড়ে দেবে নীলা সেটা বুঝতে পারলে সে সতর্ক হত। ও দেখল নীলার সঙ্গে কথা বললে খুব স্মার্টলি বলতে হবে যাতে ওকে কোনও সুযোগ না দেওয়া হয়। আক্রমণই খুব বড় প্রতিরোধ। সে মুখ তুলে বলল, 'বেড়াল তো চিরকাল ভিজে থাকে না যদি তার গায়ে জল ঢেলে না দেওয়া হয়। আমি তো কোনও বেড়ালকে সাধ করে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখিনি। তা তুমি যদি এরকম চেহারা করতে পারো তো আমি নাচার, বলতেই হবে।'

'কী রকম চেহারা?' নীলা ঠোঁট কামড়াল।

'বেশ বুক-থমথমে চেহারা।' অনিমেষ সাহসী হল।

'প্রেমে পড়ে গেছ?'

অনিমেষ খুব জোর সামলে নিয়ে বলল, 'পড়ে গেলে তো হাত পা ভাঙবে, তখন কি আর উপভোগ করা যায়? তার চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাওয়া ভাল।'

নীলা আচমকা চোখ বন্ধ করল, তারপর বলল, 'শ্যামলের সঙ্গে এক দিন দেখা হয়েছিল?'

অনিমেষ অভিনয় করল, 'শ্যামল? কোন শ্যামল?'

নীলা বিরক্তি-চাপা গলায় উত্তর দিল, 'আমার এক বন্ধুর দাদা যার কথা এক দিন বলেছিলাম।'

অনিমেষ নীলার সঙ্গীর দিকে তাকাল। ছেলেটার মুখচোখ ভদ্র, দু' আঙুলে সিগারেট চেপে ওদের কথা শুনছে। এর সঙ্গে নীলার সম্পর্কটা কী ধরনের? দু'জনে যদি প্রেম-ট্রেম করে তবে তুই-তোকারি করছে কেন? ছেলেটার চোখের চশমা বেশ পুরু কিন্তু মুখের আদলে এখনও কৈশোর মাখানো। শ্যামলের প্রসঙ্গ নীলা ওর সামনে তুলতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করছে না যখন তখন অনিমেষ স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। সে বলল, 'হ্যাঁ, একটি ছেলে যে নিজের নাম বলেছিল শ্যামল, আমার কাছে এসেছিল।'

'কী কথা হয়েছিল?'

'ঠিক মনে নেই, অনেক দিন হয়ে গেল। কেন?'

'তোমার কি বলতে আপত্তি আছে?'

'না, না। মনে আছে, খুব পাগলামো করেছিল। তোমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা কিংবা খুন অথবা এ দুটোই করতে পারে বলে জানিয়েছিল।'

'কোনওটাই করেনি এবং করবে না সেটা জানতাম।' নীলা হাসল।

'কী রকম?'

'যারা প্রেম প্রেম বলে গলাবাজি করে তাদের সেটা তলানিতে ঠেকে গিয়েছে।'

অনিমেষ নীলাকে পূর্ণ চোখে দেখল। কী নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো উচ্চারণ করল ও। চোখ না সরিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'শ্যামলের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই?'

'আশ্চর্য! এত কথার পর এই প্রশ্নটা তোমার মাথায় এল?' অনুযোগের ভঙ্গিতে অনিমেষকে একবার দেখে নিয়ে বেয়ারাকে জায়গা করে দিল নীলা কফির কাপ রাখতে।

www.MurchOna.com

অনিমেষের খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কেন নীলা শ্যামলকে ত্যাগ করেছে ? যে প্রেমের জন্য শ্যামল অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেই প্রেমে কি সততা ছিল না ? সৎ না হলে মানুষ কখনও বুকের ভেতর থেকে কথা বলতে পারে ? নাকি নীলাই শ্যামলকে নিয়ে খেলা করেছে, খেলার ইচ্ছে শেষ হলে আর সম্পর্ক রাখেনি। ওর মনে পড়ল শ্যামল সেদিন জানিয়েছিল নীলা নাকি অনিমেষের অনুরক্ত। সে কথা নীলাই শ্যামলকে জানিয়েছে। ব্যাপারটা যে হাস্যকরভাবে মিথ্যে, এ কথা শ্যামলকে বলেছিল অনিমেষ।

নীলা এখন কফি করছে কিন্তু তার হাবভাবে একটুও আগের আলোচনার ছায়া নেই। খুব সহজে, যেন একটা বাসে চেপে কিছু দূর এগিয়ে অন্য বাস ধরার মতো প্রসঙ্গ পালটে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওর। অনিমেষ ভাবল নীলাকে এ বার সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে কেন তার নাম করে সে শ্যামলকে অজুহাত দেখিয়েছিল ? নীলার সঙ্গে তো সেরকম সম্পর্ক তার কোনও দিন গড়ে ওঠেনি!

কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে নীলা বলল, 'থাক ছেড়ে দাও ও সব কথা। তুমি কেমন আছ বলো ?'

'ভালই।' কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে অনিমেষের খেয়াল হল তার পকেটে খুব সামান্য পয়সা পড়ে আছে। যদি নীলা তাকে দামটা দিয়ে দিতে বলে তা হলে খুব ফ্যাসাদে পড়ে যাবে সে। এই কফির কাপগুলোর দাম তার জানা নেই।

নীলা বলল, 'মিষ্টি ঠিক হয়েছে ? তোমাকে বাড়িতে দু' চামচ দিতাম।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

এতক্ষণে নীলার বন্ধু কথা বলল, 'আপনি কি স্কুল থেকেই ছাত্র ফেডারেশন করছেন ?'

অনিমেষ অবাক হল, 'ছাত্র ফেডরেশন ? না তো! আমাদের স্কুলে ও সব ছিল না।'

নীলা বলল, 'ও জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ত। মফস্বলের ছেলে খুব তাড়াতাড়ি কালার চেঞ্জ করে, কলকাতায় এলে কোনও থিয়োরি খাটে না।'

অনিমেষ বলল, 'অনর্থক গালাগাল দিচ্ছ। আমি কোনও কালেই পার্টি করিনি।'

ছেলেটি এবার হেসে উঠল, 'তাই নাকি ? কিন্তু আপনার মিথ্যে কথাটা খুব কাঁচা হল।'

'মিথ্যে ?' অনিমেষ উত্তেজিত হল, 'আপনি আমার চেয়ে আমাকে বেশি জানেন ?'

'তা কী করে সম্ভব ?' ছেলেটি হাসল, 'কিন্তু একটু আগে আমরা আপনাকে দেখে এসেছি। সাধারণ কোনও ছেলে হলে বিমান অমন ভেঙ্কি দেখাত না।'

অনিমেষ বুঝতে পারল আজ বিকেলে ইউনিভার্সিটি লনের ঘটনাটা ছেলেটি দেখেছে। আমরা বলতে কি নীলাও ওর সঙ্গে ছিল ? কিন্তু এতক্ষণ ও বিষয়ে নীলা কোনও কথা বলেনি কেন ?

নীলা অনিমেষকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি।'

ছেলেটি নীলাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আলাপ অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। আমার নাম শচীন, আপনার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র। আপনার নাম আজ ইউনিভার্সিটির সবাই জেনে গিয়েছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না আপনার ভূমিকাটা কী, হিরো অর ক্লাউন!'

নীলা বলল, 'সিনিয়র বলে বাড়তি কিছু দাবি করার চেষ্টা কোরো না। অনিমেষ অ্যাকসিডেন্টের জন্য একটা বছর নষ্ট করেছে। আসলে ও আমাদের ব্যাচের।'

শচীন বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট ? মানে বিমান যে ঘটনাটাকে ক্যাপিটাল করল ?'

নীলা ঘাড় নাড়ল।

অনিমেষ শচীনকে খুব ঠান্ডা এবং নিরীহ বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন এই সব কথাবার্তা বলার ধরনে ওর ধারণা পালটে গেল। ছেলেটা প্রসঙ্গ পেলে খুব অ্যাগ্রেসিভ কথাবার্তা বলে, তখন তার হুল গভীরে বিদ্ধ হয়। বিমান সম্পর্কে যে বক্রোক্তি শচীন করল তা থেকে মানে এইরকম দাঁড়ায় সে ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থক নয়। কিন্তু নিরাসক্ত হলে কেউ আক্রমণ করে না, তা হলে সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও দলকে সমর্থন করে।

অনিমেষ এবার নীলাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আজ ওখানে ছিলে ?'

নীলা কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

'তোমার কী রি-অ্যাকশন ?'

'কোনও রি-অ্যাকশন নেই। কারণ, পৃথিবীতে একটি জিনিসের ওপর আমার কোনও আগ্রহ নেই, সেটা পলিটিক্স।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ একটু জেদি গলায় বলল, 'পলিটিকস ছেড়ে দাও, ছাত্র ফেডারেশনের সভায় বিমান আমাকে ডেকে মঞ্চে তুলে সবাইকে বুলেট মার্ক দেখাল, তুমিও দেখলে, তাতে তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি ?'

নীলা হেসে বলল, 'এমন প্রশ্ন কোরো না যার মাথামুণ্ডু নেই। একটা ইয়াং ছেলের পুরুষ্টু থাই দেখতে কোন মেয়ের খারাপ লাগবে ?'

বজ্রাহতের মতো বসে থাকল অনিমেষ। এরকম একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে আর নীলা কী অকপটে অন্য কথা বলে ফেলল। তখন সবার সামনে দাঁড়িয়ে যা হয়নি এই মুহূর্তে অনিমেষ আবিষ্কার করল ওর দু' কানে রক্ত জমছে গরম হয়ে যাচ্ছে। শচীন হেসে ফেলল নীলার উক্তি শুনে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা নীলার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত। স্কটিশচার্চে মেয়েদের মুখে শালা শুনেছে অনিমেষ। ত্রিদিব বলে কোনও কোনও মেয়ে নিজেদের মধ্যে এত মুখ খারাপ করে কথা বলে যে ছেলেরা শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। হয়তো ঠিক। কিন্তু নীলা যে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথাটা বলল তাতে কোনও অন্যায়বোধ মাখানো নেই কিন্তু মেয়েদের মুখে শুনতে অস্বস্তি হয়।

শচীন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কী রি-অ্যাকশন ?'

অনিমেষ শচীনকে বলল, 'দেখুন, আমি কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম। যেদিন এলাম সেদিন এখানে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। যারা আন্দোলন করছিল তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছিল। কিন্তু আমার এক হাতে বেডিং অন্য হাতে স্যুটকেস, আমি যে বোম ছুড়তে যাচ্ছিলাম না তা একটি বালকও বুঝবে, তবু পুলিশ আমাকে গুলি করল। গুলিটা আর একটু ওপরে লাগলে আজ এই কথাগুলো আমি বলার সুযোগ পেতাম না। কী দোষ ছিল আমার ? পুলিশ যদি আমায় অ্যারেস্ট করে প্রশ্ন করত তা হলেই জানতে পারত সত্যি কথাটা। আমার জীবন, আমার ক্যারিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করল ওরা। এমনকী হাসপাতালে পুলিশ যে সব প্রশ্ন করেছে, যে ভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে, আমি তা কখনও ক্ষমা করতে পারব না। আপনি বলছেন হিরো না ক্লাউন আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার বুলেটের দাগ যদি আরও কিছু ছেলের মন তৈরি করতে সাহায্য করে তা হলে আমার ক্লাউন সাজতে আপত্তি নেই।'

কথাগুলো এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল যে অনিমেষ নিজেই অবাক হয়ে গেল। সামান্য আগেও সে ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে ভাবেনি। বিমানের ঘটনাটা তার মনে খুব অস্বস্তি এনে দিয়েছিল, রাগও হয়েছিল তার। কিন্তু যেই শচীন এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করল সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই একটা প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেল। আর কিছু না হোক, তার জীবনের একটা বছর সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে ওই গুলিটার জন্যে এ কথা তো ঠিক।

শচীন কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না।'

অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল, 'তার মানে ?'

শচীন বলল, 'আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই এই সত্য ভুলে গিয়ে যদি আপনি হাত পুড়িয়ে আগুনকে গালাগালি দেন তা হলে সেটা হাস্যকরই হবে। আপনি যখন দেখলেন পুলিশের সঙ্গে কিছু লোকের সংঘর্ষ চলছে, বোম ফাটছে, তখন আপনার সেই স্পটে যাওয়াটাই তো অন্যায়। গোলমালের মধ্যে পুলিশের পক্ষে কী করে জানা সম্ভব কে নির্দোষ, কে দোষী ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি সেদিনই প্রথম কলকাতায় এসেছি, এখানকার হালচাল কিছুই জানতাম না। তা ছাড়া—।'

নীলা এতক্ষণে কথা বলল, 'শুনেছিলাম সেদিন কার্ফু ছিল এবং তুমি দৌড়চ্ছিলে।'

অনিমেষ বলল, 'ওরকম পরিস্থিতিতে না দৌড়ে উপায় ছিল না।'

শচীন বলল, 'তা হলে বুঝুন। কার্ফুতে বাইরে বেরিয়ে আপনি প্রথম অন্যায় করেছেন। সে সময় পুলিশ স্বচ্ছন্দে আপনাকে গুলি করতে পারে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে। মুশকিল হল, আমরা নিজেদের ত্রুটিগুলো কখনওই লক্ষ করি না।'

অনিমেষ অস্বস্তিতে পড়ল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এ দিক দিয়ে চিন্তা করলে শচীনের যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছে না অনিমেষ। দেশের মানুষ খাবারের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে সাড়া না পেয়ে ফুঁসে উঠেছিল। সরকার তাদের খাবার না দিয়ে কার্ফু জারি করে পুলিশ লেলিয়ে দিল—এই ব্যাপারটাই মেনে নেওয়া যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে আপনি পুলিশের কাজকর্ম সমর্থন করছেন ?'

www.MurchOna.com

'এই ক্ষেত্রে করছি, তবে সব সময় যে পুলিশ গঙ্গাজল হয়ে থাকে তা বিশ্বাস করি না। এরকম ঘটনার প্রচুর নিদর্শন আছে। একটা সরকার—যেটা জাতীয় সরকার—তার কোনও ভাল কাজ নেই এ হতে পারে না। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল ? আজ যদি ওরা ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের সব অভাব এক দিনে দূর হয়ে যাবে ? প্রতিটি মানুষ সৎ বিবেকবান নাগরিক হয়ে যাবে ? পুলিশ তার চরিত্র পালটাবে ? নেভার। পুলিশ চিরকাল পুলিশই থাকবে। দু শো বছর ধরে ইংরেজ এই দেশ থেকে যে জিনিসটা সযত্নে মুছে দিয়ে গেছে সেটা হল প্রশাসনযন্ত্রের মর‍্যালিটি। সেটা ফেরত পাওয়া খুব সোজা ব্যাপার নয়, অনিমেষ।' শচীন খুব শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

অনিমেষ বলল,'তাই বলে নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাতে হবে ?'

শচীন হেসে ফেলল, 'দরকার হলে করতে হবে বইকী। লেনিনকে পৃথিবীর সব মানুষ শ্রদ্ধা করে। লেনিন একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব: নিজের হাতে দেশ গড়েছেন। কমিউনিস্টরা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে। ওয়েল, বিপ্লবের পর সেই লেনিন কী বলেছিলেন ? রাশিয়ায় তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। এ দিকে যেখান থেকে খাবার আসবে সেখানে গোলমাল শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রেলওয়েম্যানরা ধর্মঘট শুরু করেছে। ধর্মঘট যে-কোনও শ্রমিকের হাতিয়ার—এ কথা লেনিন এক সময় বলেছেন। তাই কিছু করা যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তে এমন সময় নেই যে ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত ফয়সালা করা যায় দাবিগুলোর। লেনিনকে জানানো হলে তিনি বললেন ওদের ধর্মঘট তুলে নিতে বলো। যদি তা না করে তা হলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো। দেশের সাধারণ মানুষ যখন অনাহারের সম্মুখীন তখন তাদের কথাই আগে ভাবতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজনে গুলি চালাতে যেন পুলিশ কোনও দ্বিধা না করে। মনে রাখবেন কথাগুলো লেনিনের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। খাদ্য নিয়ে তিনি কমিউনিস্ট থিয়োরিতে বিশ্বাস করেননি। এই ভূমিকা যদি এ দেশের সরকার নেন তা হলে চিৎকার উঠবে ফ্যাসিস্ট ফ্যাসিস্ট বলে। আমার জানতে ইচ্ছে হয় আপনারা কী চান ? একটা সুখী ভারতবর্ষ, না নিজেদের জগাখিচুড়ি মতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে মুনাফা ?'

অনিমেষ মন দিয়ে শচীনের কথা শুনল। লেনিনের এই কাজ সে অকপটে সমর্থন করছে, ব্যাপারটা তার ভাল লেগেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইজমের চেয়ে মানবতা অনেক বড়, এই সত্য লেনিন মেনে নিয়েছিলেন বলে সে খুশি হল। চোখ বন্ধ না করেই সে দেখতে পেল খাদ্যবাহী একটি গাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ধর্মঘটি শ্রমিকেরা বাধা দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এর ফলে নতুন সরকার নিশ্চয়ই দাবি মেনে নেবে। লেনিনের নির্দেশে পুলিশ তাদের বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। ধর্মঘট যেহেতু শ্রমিকের হাতিয়ার ওরা নির্ভয় ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পুলিশ গুলি চালাল। অবাক শ্রমিকের চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনগুলো বেরিয়ে আসছে স্টেশন থেকে। দেশের না-খেতে-পাওয়া মানুষের দরজায় খাবার পৌঁছে দিতে ট্রেনটি গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে। ছুটন্ত ট্রেনটির নাম মানবতা।

শচীন এবং নীলা অনিমেষকে লক্ষ করছিল। অনিমেষের হুঁশ হতে সে অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ইদানীং এই ব্যাপারটা বেড়ে গেছে। কথা বলতে বলতে বা একা একাই হঠাৎ কোনও প্রসঙ্গ বা ঘটনা মন ছুঁয়ে গেলেই নিজের অজান্তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয় তখন। কফি খেতে খেতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী যেন বলছিলেন ?'

শচীন আবার বলল, 'আপনি কেন রাজনীতি করবেন ? একটা সুখী ভারতবর্ষ পেতে, না কতগুলো ফর্মুলার পিছনে ছুটতে ? মার্কস, মাও সে তুং কিংবা লেনিন যে কথা বলেছেন সেই নির্দেশিত পথে এই দেশকে মানুষ করতে চান ?'

অনিমেষ বলল, 'কেন নয় ? ওঁরা তো সেভাবেই নিজেদের দেশ গড়েছেন।'

এতক্ষণ নীলা একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ সে ঘাড় নেড়ে বেয়ারাকে ডেকে দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার কথা বলো, আমি যাচ্ছি।'

অনিমেষ অবাক হল, 'মানে ?'

'মাথা ধরে গেছে। এই সব ইউজলেস কথাবার্তা বলে তোমরা কী আনন্দ পাও জানি না, কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। অনর্থক সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই।' নীলা ব্যাগ হাতে তুলে নিল।

শচীন বলল, 'কিন্তু তুই কোথায় চললি ? এরকম তো কথা ছিল না।'

নীলা বলল, 'কোনও কথা কি আদৌ ছিল ?'

শচীন বলল, 'না, আমি ভেবেছিলাম তুই আমার সঙ্গে সেখানে যাবি।'

www.MurchOna.com

'না, আজ আর ভাল লাগছে না। এখন একটু রাস্তায় হাঁটব।' নীলা বলল।

'আমি সঙ্গে যাব?' শচীন উঠে দাঁড়াল।

'না। একা একা হাঁটতেই ভাল লাগবে। অনিমেষ—।' নীলা ফিরে তাকাল।

অনিমেষও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না নীলাকে। এতক্ষণ কথা বলার নেশায় নীলার কথা সত্যি ভুলে গিয়েছিল সে। মেয়েরা কি উপেক্ষা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না? এতক্ষণ চুপ করে থেকে নীলা আচমকা ওর অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য উঠে চলে যাচ্ছে! সে নীলার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'বলো।'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল!' নীলা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল।

'বলো।'

'এখন নয়।'

'ও, এখন তো তুমি একা একা হাঁটবে।' নীলার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ হাসিটা জিইয়ে রাখল।

নীলা দুটো চোখ বড় করে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কাল চারটে নাগাদ ইউনিভার্সিটির সামনের বাস স্ট্যান্ডে এসো।'

নীলা আর দাঁড়াল না। শচীনকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। সেটা লক্ষ করে অনিমেষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

কাঁধ নাচালো শচীন, 'ও এইরকম। কোনওভাবেই অ্যাসেসমেন্ট করা যায় না। আমরা যারা ওর খুব ঘনিষ্ঠ তারাও ওকে বুঝতে পারি না। বরফের মতো। মুঠোয় ধরে অনুভব করতে করতেই জল হয়ে আঙুল গলে বেরিয়ে যায়। যাক, ছেড়ে দিন এ সব কথা। আপনি তা হলে এর আগে কখনও অ্যাকটিভ পার্টি করতেন না?'

প্রসঙ্গ ফিরে আসায় অনিমেষ অবাক হল, 'না।'

'আমার যুক্তি আপনার কেমন লাগল?'

'সমস্ত যুক্তির পাল্টা যুক্তি আছে।'

'বেশ। এক দিন আসুন না, আরও খোলাখুলি আলোচনা করা যাবে।'

'আচ্ছা।' অনিমেষ হাসল, 'আলোচনা করতে কোনও অসুবিধা নেই।'

শচীন বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে কফি হাউসের দিকে তাকাল। চারধার গমগম করছে। প্রতিটি টেবিলের একান্ত কথা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে এই হলের মধ্যে ছোটাছুটি করছে। অনিমেষ দেখল পরমহংস তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি, এখন দেখল ওদের টেবিলে লোক কমেছে। একটি মেয়ে যার নাম নবনীতা, সে বোধ হয় এর মধ্যে কখন উঠে গেছে। এই হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরেটা ঠিক বোঝা যায় না তবে সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ এটা ঠিক। এই সময়েও মেয়েরা সমানে আড্ডা মেরে যাচ্ছে, ওদের বাড়িতে কেউ কিছু বলে না বোধ হয়। আটটার মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে হবে। এটা অবশ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের জন্য আবশ্যিক নয়, তবু অনিমেষ কোনও দিন নিয়ম ভাঙেনি।

পরমহংস বলল, 'চোট খেলে গুরু?'

অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল। পরমহংসের কথাবার্তা কোত্থেকে শুরু হয় সেটা আন্দাজ করা মুশকিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'মহারানি তোমাদের মাটিতে বসিয়ে রেখে দিব্যি হাওয়া হয়ে গেলেন।'

ওর কথা শেষ হতে না-হতেই মেয়েরা একসঙ্গে হেসে উঠল, যেন ব্যাপারটা খুব মজার।

অনিমেষ কিছু বুঝতে না পেরে একবার পরমহংস আর একবার মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল।

সেটা লক্ষ করে আত্রেয়ী বলে উঠল, 'আপনার মাথায় যেন কিছুই ঢুকছে না।!'

অনিমেষ বলল, 'সত্যি কিছু ঢুকছে না।'

আত্রেয়ী চোখ ছোট করল, 'ওই মেয়েটিকে আপনি কত দিন চেনেন?'

'কেন?'

'নীলা মুখার্জি তো বিদ্যাসাগর থেকে এসেছে, স্কটিশ থেকে নয়। তা ছাড়া ও আমাদের এক বছরের সিনিয়র। আগে বলুন, চেনাশোনা হল কী করে?'

'পারিবারিক সূত্রে আমরা পরিচিত।' অনিমেষ বিস্তারিত বলল না।

তিনটে মুখই যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। আত্রেয়ীর খুব স্বাভাবিক হবার চেষ্টাটাই অনিমেষের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল। পরমহংস বলে উঠল, 'সরি গুরু, সেমসাইড হয়ে গেছে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল। একটা কিছু ওরা হঠাৎ চেপে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে সে সহজ হবার ভান করল, 'কেন, ব্যাপারটা কী? অনেক বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হল!'

'তোমার রিলেটিভ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না, না। জাস্ট পরিচিত।'

এ বার আত্রেয়ী বলল, 'তা হলে একটা কথা বলি, নীলা মুখার্জি থেকে দূরে থাকবেন।'

'কেন?' অনিমেষের এ বার মজা লাগছে।

পরমহংস এ বার গুছিয়ে বসল, 'আরে গুরু, ইউনিভার্সিটিতে পা দিয়েই যার গল্প শুনলাম সে হল ওই নীলা মুখার্জি। যুব-হৃদয় সম্পর্কে স্পেশালিস্ট। অধ্যাপক থেকে বেয়ারা সবাই ওর কাছে নেতিয়ে থাকে। অথচ ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে, আর নীলা মুখার্জি তো মোটামুটি শ্যামলাই। তবু মাইরি মেয়েটার মধ্যে এমন একটা চমক আছে, যেটা চুম্বকের মতো টানে সবাইকে। কোনও ছেলেকে ওর সঙ্গে সাত দিনের বেশি দেখা যায় না। সেই রাক্ষসের মতো, যার প্রতিদিন একটা করে মানুষ লাগত। নীলা মুখার্জি সম্পর্কেও এই ধারণাটা চলতি আছে।'

শুনতে শুনতে অনিমেষের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। ও বলল, 'আচ্ছা?'

আত্রেয়ী বলল, 'সেই মক্ষীরানির সঙ্গে আপনাকে এতক্ষণ বসতে দেখে কফি হাউসের অনেকের বুকে সমবেদনা জমেছে। বিভিন্ন টেবিলে এমন অনেকে বসে আছে যারা এক দিন আপনার ভূমিকায় ছিল।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ওর সঙ্গে একজন ছেলে-বন্ধু ছিল।'

আত্রেয়ী জানাল, 'বোধহয় লেটেস্ট কেউ।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আপনারা অনেক খবর রাখেন তো। তবে আমার সঙ্গে নীলার সম্পর্ক এমন ধরনের যে কোনও দিন আমাকে ওই ভূমিকায় দেখবেন না।'

অনন্যা এ বার কথা বলল, 'মফস্বলের ছেলেরা দারুণ মিচকে হয়।'

হঠাৎ কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখে লাফিয়ে উঠল পরমহংস, 'আরে ব্বাস, আমার চাকরি চলে যাবে!'

আত্রেয়ী অবাক হয়ে বলল, 'চাকরি? এই সময়ে চাকরি?'

পরমহংসের দাঁত সামান্য উঁচু হওয়ায় মুখটা সব সময় হাসি হাসি দেখায়, 'তোমাদের মতো আলালের ঘরের দুলালী নই তো খুকি, আমাদের খেটে খেতে হয়। দেড়শো টাকার টিউশনি—না গেলে বাম্পার ছুড়বে বুড়ো।'

অনন্যা ফুঁসে উঠল, 'আলালের ঘরের দুলালী মানে?'

পরমহংস মাথা ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'বাপের পয়সায় এম-এ পড়তে এয়েছ বেশ মোটা একটা কাতলা বিয়ের বাজারে গাঁথবে বলে। তোমাদের আর কী চিন্তা!'

অনন্যা তিক্ত গলায় বলল, 'কী অদ্ভুত জ্ঞান! সেদিন দশটার সময় বাসে আসছিলাম, আধবুড়ো লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, অপিস টাইমে মেয়েছেলে ওঠা কেন? যেন আমরা চাকরি করে বাপ মা ভাইকে খাওয়াই না। এইট্টিনথ সেঞ্চুরির মানসিকতা নিয়ে প্রগতির গলাবাজি করতে বাংলাদেশের পুরুষদের জুড়ি নেই।'

পরমহংসের মুখটা এই প্রথম নিষ্প্রভ দেখাল। অনিমেষ এতক্ষণ অনন্যাকে ভাল করে লক্ষ করেনি, এই কথা শোনার পর এক নিমেষে অন্যরকম ধারণা জন্মাল।

আত্রেয়ী বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছিস। যাক, আমরা সবাই উঠব। বেয়ারাটাকে ডাকুন, দাম মিটিয়ে দেওয়া যাক।'

পরমহংস খুব দ্রুত নিজের অবস্থা সামলে বলে উঠল, 'আমি বাদ।'

আত্রেয়ী বলল, 'মানে?'

পরমহংস আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমরা মাইরি অন্নপূর্ণার জাত আর আমি চিরকাল ভিখিরি শিব। তোমাদের ভিক্ষে নিয়েই তো চলে আমার।'

অনন্যা ফুঁসে উঠল, 'ইস। অন্নপূর্ণা-শিবের রিলেশনটা জানা আছে? অত শস্তা না। ঠিক আছে, আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

পরমহংস বলল, 'কেন, অনিমেষ শেয়ার করবে।'

www.MurchOna.com

অনন্যা মাথা নাড়ল, 'কেন ? উনি তো এখানে কিছু খাননি!'

বিল মিটিয়ে নীচে নামতে অনিমেষের মনে হল সে যেন অদ্ভুত শান্ত এক জগতে পা দিল। সামনে ট্রাম বাস রিকশা চলছে, কিন্তু সেটা কফি হাউসের তুলনায় এত নির্জন যে দুটো কান খাঁ খাঁ করতে লাগল। মেয়েরা চলে যেতে পরমহংসের সঙ্গে ট্রাম ধরার জন্য রাস্তা পেরিয়ে অনিমেষ কথাটা বলে ফেলল।

পরমহংস বলল, 'টিউশনি! তোমারও অবস্থা টাইট নাকি ?'

অনিমেষ স্বীকার করল, 'পেলে খুব উপকার হত। অবশ্য আমি আগে কাউকে পড়াইনি।'

পরমহংস বলল, 'দূর, ওর জন্য কোনও প্রবলেম লাগে না। যে যত ভাল ম্যানেজমাস্টার সে তত ভাল টিউটর। ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

একটা রানিং ট্রামে ওঠার জন্য সে দৌড় শুরু করল। অনিমেষ সেই চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল, ওর পায়ে খচ করে উঠেছে, চোখ বন্ধ করে ব্যথাটা সামলাল সে।

## আট

পরমহংস চলে যাওয়ার পর অনিমেষ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাদুড়ঝোলা বাস ট্রামে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। টনটন করছে অপারেশনের জায়গাটা। এত দিন দিব্যি ছিল, কখনও কষ্ট হয়নি। আজ ট্রামে ওটার চেষ্টা করতে গিয়ে আচমকা এই ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু সামনে পা ফেললে মনে হচ্ছে চোখের সামনে লক্ষ আগুনের ফুলকি নাচছে। জোড়া হাড়টা কি খসে গেল ? যাঃ, তা যদি হত তা হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ তার হুঁশ থাকত না। সোজা হয়ে থাকলে ব্যথাটা সব সময় থাকছে না, মাঝে মাঝে থাই থেকে একটা ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার বলেছিল ষাট বছর বয়স অবধি কোনও অসুবিধা হবে না। তারপর ওখানে বাতের যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর বাদেই এই রকমটা হয়ে গেল ? হয়তো পা বেকায়দায় পড়েছিল, অনিমেষ ঘামে ভিজে চোখ বন্ধ করল। এই যদি শরীরের অবস্থা হয় তা হলে সে জীবনে কোনও কিছুই করতে পারবে না। একটা অক্ষম পঙ্গু মানুষের পক্ষে কোনও স্বপ্ন দেখা বড় রকমের ভ্রান্তি।

নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে অনিমেষ ব্যাকুল হয়ে উঠল। অথচ হেঁটে যে এখান থেকে হোস্টেলে ফিরে যাবে তা অসম্ভব। অনিমেষ দেখল দূরে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দু'জন বৃদ্ধা রিকশাওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। রিকশা করে হোস্টেলে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। এখান থেকে যা দূরত্ব তাতে ওরা এক টাকার কম নিশ্চয়ই নেবে না। অথচ পকেটে শুধু সেটুকুই রয়েছে। কাছেপিঠে আর রিকশা নেই। অনিমেষ অপেক্ষা করছিল যদি ওই বৃদ্ধারা বিফল হয়ে রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু ওর নাকের ডগা দিয়েই রিকশাওয়ালা তাদের নিয়ে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢুকে গেল।

অনিমেষ যখন সাতপাঁচ ভাবছে তখন হাওয়া উঠল। এতক্ষণ লক্ষ করেনি কোন ফাঁকে আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমেছিল, এখন সেগুলো ভরাট হয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি এসে যাবে এই আশঙ্কায় রাস্তাঘাটের চেহারা পালটে যেতে লাগল দ্রুত। বাসস্টপে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা মরিয়া হয়ে এক-একটা বাসে ওটার চেষ্টা করছে। বৃষ্টি নামার আগেই সবাই বাড়ি ফিরতে চাইছে। অনিমেষ হাল ছেড়ে দিল। তার পক্ষে যখন কিছু করা অসম্ভব তখন খামোখা চিন্তা করার অর্থ হয় না। আসুক বৃষ্টি, একসময় রাত আরও গভীর হলে নিশ্চয়ই ট্রাম খালি হবে, তখন কোনওরকমে উঠে পড়লেই হবে। হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে গেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সত্যি কথা বলে দিলেই হবে, তাতে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন তা হলে হবেন। পেছনে ফুটপাতের ওপর যে বই-এর দোকানগুলো হয়েছে তার একটায় ভাল ছাউনি আছে। অনিমেষ চেষ্টা করল সেই ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়াতে। বৃষ্টি এলে নিশ্চয়ই হুটোপুটি শুরু হয়ে যাবে।

ব্যথাটা এখন আর পাক দিয়ে উঠছে না। কিন্তু হাঁটা যাচ্ছে না কিছুতেই। অনিমেষ পাশ ফিরতেই মনে হল একটা গাড়ি দ্রুত গতিতে ওর সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কেউ চেঁচামেচি করছে শুনে সে গাড়িটার দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল। থম্বোটোর সেই রুমমেট ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকছে হাত নেড়ে। পেছন থেকে বোঝা যাচ্ছে থম্বোটোর বন্ধু একা নেই। অনিমেষ এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে প্রথমে সেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কী

www.MurchOna.com

করবে। বাসস্টপে দাঁড়ানো কয়েকজন ছুটে গেল ট্যাক্সিটার কাছে। থম্বোটোর বন্ধু হাত নেড়ে তাদের না বলল। ও নিশ্চয়ই হোস্টেলে ফিরছে, অনিমেষের মনে হল আকাশ থেকে যেন দেবদূত থম্বোটোর বন্ধুর চেহারা নিয়ে এসেছে, এরকমটা ভাবাই যায় না। এক পা এগোতেই অনিমেষের থাই থেকে কোমর অবধি একটা আগুনের বল ছুটে গেল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল, চোখে জল এসে যাওয়ার উপক্রম। সে দেখল থম্বোটোর বন্ধু ট্যাক্সির দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে ওর কাছে চলে এল, 'হোয়াত্ হ্যাপেন্ড ?'

এক হাত দিয়ে নিজের পা দেখাল অনিমেষ, 'আই ক্যান নট ওয়াক্। অফুল পেইন।'

থম্বোটোর বন্ধু ডান হাতে অনিমেষের পিঠে একটা বেড় দিয়ে বলল, 'সাপোর্ট, সাপোর্ট।'

ব্যথার পা মাটি থেকে সামান্য ওপরে রেখে থম্বোটোর বন্ধুর কাঁধে ভর রেখে অনিমেষ অন্য পায়ে লাফাতে লাফাতে ট্যাক্সির দিকে এগোল। অনিমেষ লক্ষ করল এতে আর ব্যথাটা লাগছে না। শুধু থাই-এর কাছটায় শিরশির করছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল এই ছেলেটির সঙ্গে গত কাল রাত্রে থম্বোটোর ঘরে তার প্রায় মারামারি হবার উপক্রম হয়েছিল। ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা হীন মন্তব্য এর মুখ থেকে বেরিয়েছিল। সেই মুহূর্তে এই ছেলেটিকে ওর খুব বাজে টাইপের মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন এইরকম পরিস্থিতিতে ও যে ভাবে ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে অযাচিত ভাবে তাকে সাহায্য করছে গত কালের ঘটনার পর তা কি আশা করা যায়? মানুষের চরিত্র চট করে বোঝা মুশকিল এই সত্য আর একবার প্রমাণিত হল। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ টের পেল থম্বোটোর বন্ধুর শরীর থেকে অদ্ভুত নেশা-ধরানো একটা অচেনা গন্ধ বের হচ্ছে। এরকম গন্ধ সচরাচর কোনও চেনা মানুষের শরীরে অনিমেষ পায়নি। ট্যাক্সিতে উঠে কোনওরকমে বসতে না বসতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু হলে যেমন বিশৃঙ্খল অবস্থা শুরু হয়ে যায় তেমনি বাসস্টপে দাঁড়ানো মানুষেরা এলোমেলো দৌড়ে একটা ছাউনি খুঁজতে লাগল। থম্বোটোর বন্ধু দরজা বন্ধ করে সামনের সিটে গিয়ে বসতেই অনিমেষ ট্যাক্সির অন্য যাত্রীর দিকে তাকাল। পেছনের সিটের ও পাশের জানালা ঘেঁষে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। এরকম আধুনিক বেশবাসের মহিলাদের উত্তর কলকাতায় দেখা যায় না। অনেক সময় ব্যয় করলে এই রকম প্রসাধন করা যায়। মাথার চুল কোমরের সামান্য নীচে, ফুলে ফেঁপে মেঘের মতো হয়ে রয়েছে। হাতকাটা জামা শঙ্খরঙা, বাহুকে এমন সুঠাম সৌন্দর্য দিয়েছে যে চোখ সরানো দায় হয়ে ওঠে। চোখাচোখি হতেই ওর রক্তাক্ত ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে চিকচিকে দাঁতের প্রান্ত দেখা গেল। অনিমেষ অনুমান করল মহিলা হাসছেন।

থম্বোটোর বন্ধু ড্রাইভারের পাশে বসে এ দিকে শরীরটাকে ঘোরাল, 'এনি অ্যাক্সিডেন্ট ?' সব কথা সব জায়গায় বলতে ইচ্ছে করে না, অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। 'নো ব্লিডিং ?' আবার প্রশ্ন করে থম্বোটোর বন্ধু উত্তর শুনে নিশ্চিন্ত হল। বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সিটা কিছু দূর যেতেই দাঁড়িয়ে গেল। সামনে জ্যাম। ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে গাড়িগুলো। বৃষ্টির ছাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনিমেষ ওর দিকের জানলার কাচ তুলে দিতে দিতে খেয়াল করল থম্বোটোর বন্ধুর নামটাই তার জানা হয়নি অথচ ওর ট্যাক্সিতে সে লিফ্ট নিচ্ছে।

থম্বোটোর বন্ধু বিরক্ত গলায় বলল, 'ভেরি ব্যাড ট্রাফিক সিস্টেম, ভেরি ব্যাড।' এই মুহূর্তে অনিমেষেরও সেটাই মনে হচ্ছে। যেরকম বৃষ্টি চলছে তাতে আর কিছুক্ষণ বাদেই ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যাবে। তখন হবে আর এক মুশকিল। ট্যাক্সিওয়ালা বেশ বৃদ্ধ, বোধ হয় উত্তরপ্রদেশের লোক, তেমন জল জমে গেলে যদি যেতে রাজি না হয় তা হলেই সোনায় সোহাগা।

এই সময় বেশ শব্দ করে কোথায় বাজ পড়তেই মহিলা আঁতকে উঠলেন, 'ও গড, আমার ভয় করছে।' মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ দেখল ভদ্রমহিলা সত্যিই ভয় পেয়েছেন। দুটো হাতে কান চাপা দিয়েছেন, চোখ আধবোজা। খুব সুন্দরী মেয়েদের ভয় পাওয়া চেহারাটা আদৌ সুন্দর হয় না এটা জানা ছিল না।

থম্বোটোর বন্ধু ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ ইজ ইয়োর পেইন ?'

না, এখন আর ব্যথাটা লাগছে না। হেলান দিয়ে বসতে পেরে শরীরে স্বস্তি ফিরে এসেছে। অনিমেষ ঘাড় নেড়ে হাসতেই ছেলেটা বলল, 'দেন, মিট মাই ফ্রেন্ড, শীলা সেন। ভেরি হোমলি, রিয়েল সুইট।'

এইভাবে কারও সঙ্গে কখনও পরিচিত হয়নি অনিমেষ, মহিলার দিকে তাকিয়ে সে দুটো হাত জোড় করল, 'আমার নাম অনিমেষ।'

www.MurchOna.com

সামান্য মাথা-দুলিয়ে মহিলা অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর কপালে দুটো রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অসুস্থ ?'

অনিমেষ না বলতে গিয়েও পারল না, 'পায়ে একটু আঘাত লেগেছে।'

'পায়ে ? কোথায় ?' মহিলা এতক্ষণে যেন সিরিয়াস হলেন।

অনিমেষ প্যান্টের ওপর দিয়ে জায়গাটা দেখাল।

'ওখানে, ওখানে আঘাত লাগল কী করে ? ওখানে তো কোনও জয়েন্ট নেই!'

'লাগল, লেগে গেল। অনিমেষ হাসল।

হঠাৎ থম্বোটোর বন্ধু বলে উঠল, 'আই কান্ট ফলো ইউ। ইংলিশ, ইংলিশ প্লিজ।'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত নেকি গলায় মহিলা বলে উঠল, 'ইস, সব যেন ওকে বুঝতে হবে! আমরা ভাই বাংলায় কথা বলব, না ? কেলে ভূতটা ইংরেজিও ভাল জানে না।'

চমকে উঠল অনিমেষ। ভদ্রমহিলা একী ভাষায় কথা বলছেন ? হয়তো এই মহিলার জন্যে কাল রাত্রে থম্বোটোর বন্ধু হইচই করেছিল। এই মহিলাকেই সম্ভবত দারোয়ান রাত আটটার পর আটকে দিয়েছিল। যার জন্যে থম্বোটোর বন্ধু অত আন্তরিকভাবে ক্ষিপ্ত হতে পারে তার মুখ থেকে এ ধরনের কথা কল্পনা করা যায় না। তা হলে কি মহিলা শুধুমাত্র কোনও স্বার্থের জন্য এই বিদেশি আফ্রিকান ছেলেটির সঙ্গে মিশছেন ? কী স্বার্থ হতে পারে সেটা ? হঠাৎ ওর খেয়াল হল কলকাতা শহরটা একটা বিচিত্র জায়গা। ক'দিন আগে একটা কাগজে পড়েছিল এখানে কয়েক হাজার সুন্দরী কলগার্ল বাস করেন যাঁদের চেহারা এবং কথাবার্তা খুবই অভিজাত এবং চাক্ষুষ কিছু বোঝা সম্ভব নয়। ইনি কি সেই শ্রেণীর ? না, তা হতেই পারে না। সেই বাল্যকাল থেকে, জলপাইগুড়ির বেগুনটুলির পাশের গলিতে যাওয়া ইস্তক, অনিমেষের একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, মেয়েরা অভাবের তাড়নায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও মেয়ে-ওই জীবনযাপন করতে কেন চাইবে ? এই মহিলা যে পোশাক এবং প্রসাধন ব্যবহার করেছেন তাতে দারিদ্র্যের কোনও চিহ্ন নেই। সে রকম মেয়ে হলে সুদূর আফ্রিকা থেকে এসে থম্বোটোর বন্ধু কেন একে বন্ধু বলে পরিচয় দেবে ?

মহিলা হাসলেন এবার, সত্যি সত্যি, 'কী ভাবছেন ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না তেমন কিছু না।'

মহিলা বললেন, 'তা হলে কিছু একটা তো বটেই! আপনিও কি ওর সঙ্গে একই হোস্টেলে থাকেন ? মানে যে হোস্টেলে সব বাচ্চারা থাকে ?'

থম্বোটোর বন্ধু এবারে অধীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ইংলিশ, ইংলিশ।'

'শাট আপ।' মহিলা ধমক দিলেন। গলার স্বর চড়ায় উঠলে একটুও পেলবতা থাকে না অনিমেষ লক্ষ করল। 'ডোন্ট বিহেভ লাইক এ কিড।' উচ্চারণে সামান্য জড়তা নেই এবং আশ্চর্য ব্যাপার, সাপের মাথায় ধুলোপড়ার মতো থম্বোটোর বন্ধু কেমন মিইয়ে গেল বকুনি শুনে। জুলজুল চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করতে মহিলা স্তোক হাসি হাসলেন 'ইউ নটি বয়!' অনিমেষ দেখল থম্বোটোর বন্ধু তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে সোজা হয়ে বসে সামনের গাড়িগুলো লক্ষ করতে লাগল এবার।

মহিলা বললেন, 'এরা এমনিতে খুব রাফ হয়, কিন্তু ট্যাক্‌ল্ করতে পারলে এদের মতো সহজ শিশু পৃথিবীতে আর নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনাদের হোস্টেলের অমন নিয়ম কেন ?'

অনিমেষ বলল, 'ওটা কলেজ স্টুডেন্টদের থাকার জায়গা। তাই কিছু কিছু নিয়ম করতেই হয়। আমরা যারা কলেজ ছাড়িয়ে গেছি তারাও নিয়মটাকে মানি।'

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কলেজে পড়েন না ?'

'এটা এক রকমের কলেজ বটে, আমি এম এ পড়ি।'

'ও মা, তাই নাকি! কী ভাল ছেলে গো! হোস্টেলে থাকো, তোমার বাড়ি কোথায় ভাই ?'

'জলপাইগুড়ির কাছে একটা চা-বাগানে।'

'চা-বাগান ? ও মা, নিজেদের চা-বাগান আছে ?' মহিলা দ্রুত অনিমেষের গা ঘেঁষে এসে বসলেন, 'চা-বাগান খুব সুন্দর জায়গা, না ? দার্জিলিঙে যেতে আমি দু চোখ ভরে দেখেছি। কেমন স্বপ্নের মতো দেখতে না ? আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল মহিলার ভাবভঙ্গিতে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে প্রতিবাদ করতে গেল যে তাদের নিজেদের কোনও চায়ের বাগান নেই। চায়ের বাগানের মালিকরা প্রচুর টাকার মালিক, তার বাবা একটি ইউরোপীয় মালিকানায় পরিচালিত চা-বাগানে চাকরি করেন মাত্র। কিন্তু এ

www.MurchOna.com

কথাগুলো বলার আগেই থম্বোটোর বন্ধু চিৎকার করে উঠল সামনের সিট থেকে। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল অভিনব দৃশ্য। থম্বোটোর বন্ধু তিড়িং করে লাফিয়ে জুতোসুদ্ধ গাড়ির সিটের ওপর বসে বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় অনর্গল কিছু বলে যেতে লাগল যার এক বর্ণ অনিমেষ বুঝতে পারছে না। উত্তেজিত এবং ভয় পাওয়া মুখ, দুটো আঙুল সামনের পা রাখার জায়গার দিকে উঁচিয়ে ধরেছে। বুড়ো ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল কালো সাহেবের চালচলন দেখে। কিন্তু সিটের উপর জুতো তুলে উঠে বসতে দেখে সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছিল। কারণ সাহেবের উত্তেজনার কারণটা অনুসন্ধান করতে তাকে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে দেখা গেল। অনিমেষ উঠে ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল। এখন কোনওরকম নড়াচড়া আবার যন্ত্রণাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ভদ্রমহিলা ট্যাক্সির মধ্যে যতটা পারেন উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনও হদিশ পাচ্ছেন না। ওইটুকু জায়গায় ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে চেষ্টা করায় তাঁর শরীরের অনেকটা অনিমেষের ওপর চেপে গেছে, একজন রমণীর শরীর নয় শুধুমাত্র, প্রবল চাপের জন্যই অনিমেষের প্রাণ বেরুবার দায়। এতক্ষণে ড্রাইভার বস্তুটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটি নধর কালো কুচকুচে আরশোলা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে বিরক্তির সঙ্গে একবার সবাইকে দেখিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

যেন সোডার বোতল খুলে গেল হঠাৎ, মহিলা খিলখিল করে উন্মাদ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতেই পেছনের সিটে লুটিয়ে পড়লেন। অনিমেষ দেখল ওঁর গায়ের আঁচল নীচে লুটিয়ে পড়েছে, বড় গলার কালো সিল্কের ব্লাউজ তাঁর বিশাল বক্ষকে আবদ্ধ করতে পারছে না। অনিমেষ নিজের অজান্তেই সেদিকে তাকিয়েছিল। হাসতে হাসতেই সেটা লক্ষ করে মহিলা অদ্ভুত ভঙ্গিতে অনিমেষকে টুসকে দিয়ে আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, কী বীরপুরুষ রে! একটা আরশোলা দেখে ভিরমি খাচ্ছেন, আবার মুখে বড় বড় বাত—সিংহের দেশের লোক আমি, গরিলার দেশের লোক আমি।'

বাইরে ফুটপাতের পাশে পড়ে থাকা আরশোলাটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়েছিল থম্বোটোর বন্ধু। উত্তেজনাটা এখন থিতিয়েছে। তারপর পা দুটো সন্তর্পণে নীচে নামিয়ে আর একবার ভাল করে দেখে নিল জায়গাটা, দেখে পেছনের সিটের দিকে ফিরে মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল, 'আই কান্ট স্ট্যান্ড।'

'খুব গর্বের কথা, আবার চেঁচিয়ে বলা হচ্ছে!' মহিলা টিপ্পনী কাটলেন। এতক্ষণে ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করেছে। সামনের জট খুলতেই গাড়িগুলো শামুকের মতো এগোচ্ছে। একটু বাদেই মনে হল ওরা বিরাট নদীর মধ্যে এসে পড়েছে। ফুটপাট দেখা যাচ্ছে না জলের ঢেউ দু' পাশের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ার উপক্রম। থম্বোটোর বন্ধু সোৎসাহে বলে উঠল, 'হাউ ফানি, উই আর সেইলিং।'

অনিমেষেরও মজা লাগছিল কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল, যদি ইঞ্জিনে জল ঢুকে যায় তা হলে চিত্তির। এখানে জলবন্দি হয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। ড্রাইভার সমানে নিজের মনে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে জল ভেঙে গাড়ি এগোচ্ছে যেন কতটা পথ আসা হল। অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়িয়ে আসতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখন আর জল কিংবা জ্যাম নেই। ভেজা রাস্তা দিয়ে এগোতে দেখা গেল সারবন্দি হয়ে ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ বলল, 'খুব জোর বাঁচা গেল।'

মহিলা চোখ বড় করে বললেন, 'গাড়িটা আটকে থাকলে খারাপ লাগত নাকি? বেশ তো আমরা অনেকক্ষণ গল্প করতে পারতাম!'

অনিমেষ এর উত্তরে কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসল। হাসি অনেক কিছুর উত্তর হতে পারে, যে যেমন বুঝে নেয়।

বিবেকানন্দ রোডের কাছে গাড়িটা আসতেই মহিলা বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি, পায়ে যখন এত যন্ত্রণা, হাঁটা যাচ্ছে না তখন একা একা হোস্টেলে থাকা যাবে কী করে! ওটা তো আর বাড়ি নয় যে কেউ সেবাশুশ্রূষা করবে!'

অনিমেষ বলল, 'না, না, একটু শুয়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহিলা বললেন, 'যদি না হয়! আমার ইচ্ছে করছে বাড়িতে নিয়ে যাই। কারও কষ্ট হচ্ছে, ভাবলে এত খারাপ লাগে, মন কেমন হয়ে যায়!'

অনিমেষ লজ্জা পেল, 'আপনি কিছু ভাববেন না।'

www.MurchOna.com

মহিলা বললেন, 'ভাবব না কী কথা! আলাপ হল আর ভাবব না ? ঠিক আছে, কেমন থাকা হচ্ছে আমায় যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তা হলে নিশ্চিন্ত হই। আমার নম্বর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চারটে শূন্য। মনে থাকবে ? খুব সোজা। শুধু এক্সচেঞ্জ নম্বরটা মনে রাখলেই হল, তারপর সব ফাঁকা। ইংরেজিতে বললাম না, সামনের দুটো কান এ দিকে খাড়া হয়ে আছে।' কথা বলতে বলতে গলার স্বর নীচে নেমে এল, ফিসফিস শোনাল।

এত অল্প পরিচয়ে বলতে গেলে মাত্র কয়েক মিনিটের বলা যায়, কোনও মহিলা এ রকম আন্তরিক ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানাতে পারে ? অনিমেষের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হল তার নিজের মনে নিশ্চয়ই কু আছে। মহিলা তার আহত হবার সংবাদ শুনে স্নেহপ্রবণ হয়ে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চাইতে পারেন—তাতে অস্বাভাবিক কী আছে ? সে হয়তো মিছেই ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

হেদোর আগের গলি দিয়ে ট্যাক্সিটাকে ঘোরাতে বললেন মহিলা। স্কটিশের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি অনেকটা এগিয়ে একটা লাল রঙের বাড়ির সামনে থামতেই মহিলা একটু অপ্রসন্ন চোখে বৃষ্টির দিকে তাকালেন। এখন বৃষ্টির সেই তেজটা নেই, কিন্তু যেভাবে পড়ছে তাতে একটু হাঁটলেই ভিজে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বৃষ্টির মধ্যেই থম্বোটোর বন্ধু লাফিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। নেমে গাড়িটাকে পাক দিয়ে এ-পাশের দরজায় এসে সেটাকে খুলে ধরল, 'মে আই গো উইদ ইউ ?' মহিলা পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লেন, 'নট টুনাইট ডার্লিং।' তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বললেন, 'চলি ভাই, মনে থাকে যেন!' কথা শেষ করেই উনি প্রায় দৌড়ে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে লাল বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। অনিমেষ দেখল নামবার আগে মহিলা দ্রুত হাতে আঁচলটাকে ঘোমটার মতো আড়াল করে নিয়েছিলেন এবং চলে যাওয়ার সময় একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। বৃষ্টির জন্য রাস্তা ফাঁকা, রকগুলোতেও কেউ নেই।

থম্বোটোর বন্ধু অকপটে সেই চলে যাওয়া দেখল। বৃষ্টিতে ভিজে যে একশা হয়ে গেছে সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। তারপর শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিমেষের পাশে উঠে বসল। সিট ভিজে যাচ্ছে বলে ড্রাইভার বিরক্তি প্রকাশ করতেই সে ঘাড় নেড়ে হাউহাউ করে নিজের ভাষায় কিছু বলে সোজা হয়ে বসল। অনিমেষ ড্রাইভারকে কিছু মনে না করতে বলে হোস্টেলের ঠিকানাটা জানিয়ে দিতে আবার ট্যাক্সি চলা শুরু করল।

থম্বোটোর বন্ধু অনিমেষের হাতের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'শি টক্‌ড্ অ্যাবাউট মি ?'

অনিমেষ বুঝল মহিলাকে জরিপ করার চেষ্টা করছে ছেলেটা। সে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

'টেল মি হোয়াট শি টোলড্ ইউ!'

অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে ওর দিকে তাকাল। মহিলার কথাবার্তা খুব স্বচ্ছন্দ ছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল থম্বোটোর বন্ধু সম্পর্কে মহিলার কিছুমাত্র আন্তরিক ধারণা নেই। কিন্তু ও সব কথা এই ছেলেটিকে কী করে বলা যায়। এর হাবভাবে মহিলাটি সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ স্পষ্ট। এ রকম চললে শেষ পর্যন্ত হয়তো চূড়ান্ত আঘাত পাবে ছেলেটি। অনিমেষের মনে হল কথাটা থম্বোটোকে খুলে বলা যায়। যদি কিছু সাবধানবাণী ওকে শুনতে হয় তা হলে তা থম্বোটোর মুখ থেকেই শোনা ভাল। কিন্তু এখন একে কী বলা যায়! তীব্র চাহনি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'শি টোলড্ মি দ্যাট ইউ আর এ ভেরি গুড বয়। অ্যান্ড অল দিজ প্রেইজি ওয়ার্ডস।'

চোখ বন্ধ করল থম্বোটোর বন্ধু। তারপর খুব গাঢ় গলায় বলল, 'আই নেভার লভ্‌ড্ ওম্যান বিফোর হার। শি ইজ সামথিং।'

হোস্টেলের সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতে থম্বোটোর বন্ধু ভাড়া মিটিয়ে দিল। প্রায় পনেরো টাকার মতো মিটারে উঠেছে। অনিমেষ দেখল ওর পার্সে থোকা থোকা নোট। চট করে অনুমান করা যায় না টাকার অঙ্কটা। এত টাকা কোনও দিন একসঙ্গে হাত দিয়ে ধরেনি অনিমেষ। পার্সটা যেভাবে ছেলেটা হিপ পকেটে গুঁজে রাখল তাতে বিন্দুমাত্র সতর্কতা নেই। ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়েই সমস্ত শরীর দুলে উঠল অনিমেষের। এতক্ষণ যে বসেছিল সেটা ছিল এক রকম, ব্যাথাটার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এখন মাটিতে পা দিয়ে শরীরের ভার রাখতেই মনে হল থাই থেকে একটা আগুনের গোলা পাক খেয়ে কোমরে উঠে এল। যন্ত্রণাটাকে দাঁতে চেপে সামলাল অনিমেষ। দু চোখে পলকেই জল এসে গেল। থম্বোটোর বন্ধু সমস্ত ঘটনাটা চুপচাপ লক্ষ করছিল। এখন বৃষ্টি টুপটাপ পড়ছে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অদ্ভুত কায়দায় ছেলেটা অনিমেষকে কাঁধে তুলে নিল। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক এবং

www.MurchOna.com

সহজ ভঙ্গিতে ঘটল যে অনিমেষ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খুব কায়দা করে ওকে ধরে ছেলেটি সিঁড়ি অবধি হেঁটে গেল। থম্বোটোর বন্ধুটি মোটেই স্বাস্থ্যবান নয় কিন্তু ওর গায়ে যে এত শক্তি আছে তা অনুমান করা যায় না। সাবধানে সিঁড়ির গোড়ায় ওকে নামিয়ে দিয়ে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াটস্ ইয়োর রুম নাম্বার?'

অনিমেষ জানাতেই সে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। রেলিং ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। হোস্টেলের গেটটা ভেজানো ছিল, থম্বোটোর বন্ধু সেটাকে ঠেলে ঢুকেছে। বাঁ দিকে দারোয়ানের ঘর থেকে তুলসীদাসী রামায়ণের সুর ভেসে আসছে। এখন বোধ হয় প্রায় ন'টা বেজে গেছে। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এবার অনিমেষের মনে হল আবার কি ওকে হাসপাতালে গিয়ে এক বছর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে? প্রচণ্ড আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। এইভাবে পঙ্গুর মতো সমস্ত জীবন কাটানোর চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভাল। সারা জীবন টিপটিপ করে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

নানারকম কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপরে, অনিমেষ দেখল ত্রিদিব আরও কয়েকজনকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে আসছে। এক দৌড়ে কাছে এসে অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল ত্রিদিব, 'কী হয়েছে? শুনলাম খুব উন্ডেড হয়েছে?' অনিমেষ দেখল আরও কয়েকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আর প্রত্যেকের মুখচোখে উদ্বেগ স্পষ্ট। অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল, এরকমটা হবে ভাবেনি সে। সিঁড়ির ওপর দিকে থম্বোটোর বন্ধু নির্লিপ্তের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, চোখাচোখি হতে হাত নেড়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। যেন ওর কর্তব্য শেষ, এরকম ভাব।

অনিমেষ বলল, ট্রামে উঠতে হঠাৎ জখম পায়ে ব্যথা হল। তার পর থেকে আর হাঁটতে পারছি না। এখন যন্ত্রণাটা না হাঁটলে হচ্ছে না।'

ত্রিদিব ধমকে উঠল, 'নিশ্চয়ই রানিং ট্রামে উঠছিলে?'

অনিমেষ অস্বীকার করল না, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না জোড়া হাড় ভাঙল কি না!'

ভিড়ের মধ্যে দুর্গাপদ ও গোবিন্দকে দেখতে পেল অনিমেষ। গোবিন্দ ত্রিদিবকে বলল, 'সিক রুমে নিতে হবে?'

অনিমেষ বলল, 'না, না, সিক রুমে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা একটু হেল্প করো, নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ি।'

ওরা কোনও কথা শুনল না, অনিমেষকে ধরাধরি করে মাথার ওপর তুলে সন্তর্পণে ওঁর ঘরে ফিরিয়ে আনল। খাটে শুইয়ে দিয়ে ত্রিদিব ভিড়টাকে সরাল। ঘরে শুধু গোবিন্দ আর দুর্গাপদ রয়ে গেল। ত্রিদিব গোবিন্দকে ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যথাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে?'

অনিমেষ হাত দিয়ে থাই দেখাতে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অনিমেষের মনে হল এরা খুব ঘাবড়ে গেছে।

ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটা দেখেছ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তার নিজের পক্ষে প্যান্টের পা গুটিয়ে থাই দেখা সম্ভব নয়। আর নিশ্চয়ই জায়গাটার বাইরে কিছু হয়নি, রক্তটক্ত বেরুবার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

ত্রিদিব বলল, 'ইজি হয়ে শুয়ে থাকো, কোনও চিন্তা কোরো না, আমি দেখছি।'

দুর্গাপদ ওর শার্ট খুলে নিল, ঘামে গেঞ্জি সপসপ করছে। সেটাকে খুলে ফেলতে বেশ আরাম লাগল। ত্রিদিব প্যান্টের বোতামে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আন্ডার প্যান্ট পরা আছে?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলল অনিমেষ। কাল রাত্রে মদ্যপান করে এসে ত্রিদিবরা ওর ওপর যখন জুলুম করেছিল, জোর করে উলঙ্গ করেছিল তখন এ কথা একবারও চিন্তা করেনি। অথচ আজ খুব ভদ্রভাবে জেনে নিচ্ছে যাতে অনিমেষ লজ্জায় না পড়ে। ওকে হাসতে দেখে ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী হল?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু না। আন্ডার প্যান্ট পরাই আছে। তোমরা আমাকে একটু ধরো, আমি নিজেই প্যান্ট চেঞ্জ করে নিচ্ছি।'

ওরা সে কথায় কান না দিয়ে প্যান্টটা সন্তর্পণে অনিমেষের শরীর থেকে এমনভাবে খুলে নিল যাতে ওর একটুও ব্যথা না লাগে। দুর্গাপদ অনিমেষের থাই-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে বলল, 'কোথাও তো ফোলা দেখছি না, কিন্তু তোমার বুলেট মার্কের নীচে বেশ কিছুটা জায়গা লাল হয়ে আছে। বোধ হয় ওখানেই কিছু হয়েছে।'

www.MurchOna.com

ত্রিদিব লাল জায়গাটায় হাত রেখে বলল, 'ওরে ফাদার! একদম ফার্নেস হয়ে রয়েছে। একদম নড়াচড়া করবে না, চুপচাপ শুয়ে থাকো। একটা পাতলা চাদর নিজের বিছানা থেকে তুলে এনে সে অনিমেষের কোমর অবধি ঢেকে দিল।

একটু বাদেই গোবিন্দ ফিরে এল, সঙ্গে হোস্টেলের ডাক্তার আর হোস্টেলের সুপার মিস্টার দত্ত। হোস্টেলের ডাক্তারকে সবাই আড়ালে ঘোড়ার ডাক্তার বলে। ওঁর চিকিৎসায় নাকি কখনও কোনও রুগি সারে না। সব রকম অসুখেই তিনি একই মিকশ্চার আর ট্যাবলেট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। এককালে ছেলেরা এ নিয়ে রাগারাগি করেছে, কোনও ফল হয়নি। উনি ছেলেদের কাছ থেকে কোনও ফি নেন না, হোস্টেলের সঙ্গে তাঁর একটা মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। অথচ এই হোস্টেলের কারও কোনও অসুখ হলে বাইরের অন্য কোনও ডাক্তারকে ডাকা যাবে না, ইনি যদি সুপারিশ না করেন।

ডাক্তার সেন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে ?' একটা কথা দুবার বলা তাঁর অভ্যেস, কথা বলেন হড়বড়িয়ে। ত্রিদিব বলল, 'ওর পায়ে খুব লেগেছে ট্রামে উঠতে গিয়ে, হাঁটতে পারছে না।'

'লেগেছে মানে কী ? ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছে ?' একটা চেয়ার বিছানার পাশে টেনে এনে বসলেন ডাক্তার সেন।

ত্রিদিব বলল, 'না, উঠতে গিয়ে—'

'পেশেন্ট কে, পেশেন্ট কে ? পেশেন্টকে বলতে দিন।' ডাক্তার সেন বললেন।

অনিমেষ যতটা পারে সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতেই ডাক্তার 'হুম্' বলে মিস্টার দত্তের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, 'মশা মারতে কামান দাগা মশাই। এর জন্যে আমাকে ডাকার কোনও দরকার ছিল না, কোনও দরকার ছিল না। সিম্পল ব্যাপার, শিরায় টান লেগেছে, ছেলেমানুষের কারবার।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর সেন। অনিমেষ বন্ধুদের চোখে মুখে প্রতিক্রিয়া দেখে দ্রুত বলে ফেলল, 'আমার পায়ের ঠিক এই জায়গার হাড় পাঁচ বছর আগে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল।'

'অ্যাঁ ?' চমকে উঠলেন ডক্টর সেন, 'ওখানকার হাড় ? হাউ ?'

'অ্যাক্সিডেন্টে।' অনিমেষ মিস্টার দত্তের সামনে বুলেটের কথাটা বলতে চাইল না। আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে অনিমেষের পা থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন ডক্টর সেন। পুরনো অপারেশনের জায়গাটা চোখে পড়তেই বিড়বিড় করে বললেন, 'মেজর অপারেশন হয়েছিল দেখছি।' তারপর ধীরে ধীরে দুহাত দিয়ে অনিমেষের পা ধরে সেটাকে ভাঁজ করলেন, 'লাগছে? ফিলিং পেইন ?'

'না, হাঁটুর কাছে কোনও ব্যথা নেই,' অনিমেষ জানাল।

এবার থাই-এর মাংস ঠুকে ঠুকে দেখলেন ডাক্তার সেন আর একই প্রশ্ন করে চললেন। কিন্তু অনিমেষ কোনও ব্যথা অনুভব করছিল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে ডাক্তার সেন নাকের ডগা মুছে নিয়ে অন্য পকেট থেকে প্যাড বের করলেন। তারপর খসখস করে প্রেসক্রিপশান লিখে অনিমেষের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ রাত্রে খুব ব্যথা যদি হয় তবে অ্যানাসিন টাইপের কোনও ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ো। চলি।' আর দাঁড়ালেন না তিনি, মিস্টার দত্তের সঙ্গে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

অনিমেষের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ত্রিদিব চেঁচিয়ে সবাইকে পড়ে শোনাল, 'অ্যাডবাইস—কন্‌সাল্‌ট এনি অর্থপেডিক ইমিডিয়েটলি। যা শালা! এর জন্য তোকে ডাকব কেন? ঘোড়ার ডাক্তার!'

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়ার ডাক্তার হলে তবু কথা ছিল, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই কাকেদের চিকিৎসা করে। কারণ, কাকেদের কখনও অসুখ করে না।'

দুর্গাপদ এগিয়ে এসে অনিমেষের বিছানায় বসল, 'তোমার কি এখন কোনও অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষ ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি উঠে দাঁড়ালে বুঝতে পারব।'

দুর্গাপদ বলল, 'তা হলে ওঠার দরকার নেই। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে যদি কারও হাড় ভাঙে তবে তা সেট না করা পর্যন্ত যন্ত্রণা অসহ্য হয়। আমার মনে হচ্ছে তোমার পায়ের কোনও লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। আমার দাদার একবার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন লিগামেন্ট ছিঁড়লে যেন কখনও মালিশ না করা হয়, ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখাই যথেষ্ট।'

ত্রিদিব বলল, 'কিন্তু ব্যান্ডেজটা করবে কোথায় ?'

www.MurchOna.com

দুর্গাপদ এবার অনিমেষের পা নিয়ে পড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সে থাই-এর নীচের দিকে হাঁটুর সামান্য ওপরে একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলল যেখানে হাত দিলেই অনিমেষ চিৎকার করে উঠছে। জায়গাটায় কোনও বড় শিরা নেই। চিৎকারের সময় অনিমেষের মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে এটা লক্ষ করল সবাই।

ত্রিদিব চাপা গলায় বলল, 'সাধে কি ঘোড়ার ডাক্তার বলেছি, খালি বাকতাল্লা!'

গোবিন্দ বলল, 'গরম সেঁক দিলে হয় না ?'

দুর্গাপদ বলল, 'সেঁক দিলে খারাপ হবে না তো ?'

গোবিন্দ বলল, 'বাড়িতে তো সবাইকে সেঁক দিতেই দেখেছি।'

দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিচেন থেকে একটা ছোট্ট কয়লার উনুন নিয়ে আসা হল।

দুর্গাপদ যখন সেঁক দিচ্ছে তখন বেশ আরাম হচ্ছিল অনিমেষের। অনেকক্ষণ পরে স্বস্তি আসায় ওর দু-চোখ বুজে এল একসময়।

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'অনমেষ, তুমি খাবে না ?'

এখন ঘুম ছাড়া আর কিছু ইচ্ছে করছে না অনিমেষের। সে চোখ বুজে মাথা নাড়ল, না, খাবে না। দুর্গাপদ আর পীড়াপীড়ি করল না।

তখন নিশ্চয়ই মধ্যরাত, অনিমেষের ঘুম ভেঙে গেল। হুঁশ ফিরতেই ওর মনে হল পেটে ছুঁচো ডন মারছে। ধীরে ধীরে উঠে বসতেই সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। ত্রিদিবের বিছানায় বসে গোবিন্দ আর দুর্গাপদ তাস খেলছে। পাশে মাটিতে রাখা কয়লার উনুনটা নিবে গেছে কখন। ত্রিদিব তাতেই ভাঁজ করা কাপড়টা গরম করার চেষ্টা করে তার পায়ে সেঁক দিয়ে চলেছে। অনিমেষ এমন হতভম্ব হয়েছিল যে মুখ থেকে তার কথা সরল না। এই ছেলেগুলো তাকে সেবা করার জন্য একটা রাত জেগে আছে! অথচ গত কাল এদেরই অন্যরকম চেহারা ছিল, মাতাল তিনটি যুবক অশ্লীলতার চূড়ান্ত করেছিল।

ওকে জাগতে দেখে ত্রিদিব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন, আরাম পাচ্ছ ?'

অনিমেষ থাই-এর তলায় হাত দিয়ে আবিষ্কার করল, সেই পিন-ছোঁয়া যন্ত্রণা একদম নেই, শুধু জায়গাটা অসাড় হয়ে আছে। লজ্জিত গলায় অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক হয়ে গেছি, তোমাদের আর রাত জাগতে হবে না, এবার শুয়ে পড়ো।'

খেলা থামিয়ে গোবিন্দ বলল, 'আরে গুরু, রাত আর কোথায় ? আর মাত্র এক ঘণ্টা, তার পরেই ফুড় ত করে আকাশ ফরসা হয়ে যবে। বাট, তুমি ফিট তো ?'

দুটো হাতে বিছানায় ভর দিয়ে অনিমেষ বলল, 'একবার উঠে দাঁড়ালে বুঝতে পারব।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল ত্রিদিব, 'না, না, আজ রাত্রে উঠতে হবে না।'

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? উঠে দেখুক গড়বড় আছে কিনা!'

'কাল সকালে দেখবে। উঠলে যদি ব্যথা লাগে তা হলে এখনই মন খারাপ হয়ে যাবে আমার। যতক্ষণ অনিমেষের ব্যথা না হচ্ছে ততক্ষণ মনে হবে ও সুস্থ হয়ে গেছে।' ত্রিদিব হাসল।

দুর্গাপদ চাপা গলায় বলে উঠল, 'কবিরা মাইরি এক নম্বরের এস্কেপিস্ট।'

খিদে পাচ্ছে খুব, কিন্তু ঘরে কিছু নেই যা খাওয়া যায়। ত্রিদিবের স্টকে অবশ্য বিস্কুট থাকে, ক্রিম দেওয়া বিস্কুট। হোস্টেলের ঠাকুরকে ডাকতে গেলে মারতে আসবে। অনিমেষ ত্রিদিবকে বলল, 'কয়েকটা বিস্কুট দাও তো খাব।'

'বিস্কুট ?' অবাক চোখে তাকাল ত্রিদিব, 'এত রাতে বিস্কুট কেন ? ওহো, তুমি তো রাত্রে কিছু খাওনি। যা শালা!' এক লাফে উঠে গিয়ে ত্রিদিব তার শেলফ থেকে চৌকো টিনটা বের করে ঢাকনা খুলল। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'ইস, বিকেলে কিনব ভেবেছিলাম, একদম ভুলে গেছি। মাপ করো গুরু, একদম ইয়াদ ছিল না, দু-তিনটে ভাঙা পড়ে আছে।'

খাবার কিছু না পেয়ে অনিমেষ ভাবল চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুমালে খিদে লাগবে না। কিন্তু খিদে যখন প্রবল হয় তখন যে ঘুম আসতে চায় না! সে এক গ্লাস জল চাইল। জল খেয়ে পেট ভরানো যাক।

দুর্গাপদ বলল, 'খালি পেটে জল খাবে ? তার চেয়ে একটু মাল দিয়ে জল খাও। ওতে প্রোটিন আছে, পেটও ভরবে, নার্ভ ঠিক থাকবে আর যন্ত্রণা দূর হবে।'

ত্রিদিব সম্মতির ঘাড় নেড়ে লুকোনো জায়গা থেকে কালকের বোতলটা বের করে দ্রুত হাতে একটা গ্লাসে সামান্য ঢেলে জল মিশিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'আঃ, দারুণ ফ্লেভার, খেয়ে নাও, অমৃত।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ অবিশ্বাসের গলায় বললে, 'যাঃ, খামোকা মদ খেতে যাব কেন ?'

ত্রিদিব বলল, 'মদ কথাটা খারাপ। টেক ইট অ্যাজ মেডিসিন, অ্যাজ হেল্‌থ্‌ টনিক। শরীর সুস্থ করার জন্য খাওয়া। নাও, হাঁ করো, সেবা করতে দাও।'

## নয়

প্রায় পাঁচ বছর অনিমেষ কলকাতা শহরকে দেখছে। যদিও যাতায়াতের চৌহদ্দিটা খুব সীমিত তবু একটা ধারণা ওর মনে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে এখানকার মানুষ অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে আর কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। আর আগ্রহ বলে যেটা মনে হয় সেটার জন্য যদি কিছু মূল্য দিতে হয় তবে তারা সে ব্যাপারে নিজেদের জড়াবেই না। খুব সামান্য কারণে পথে-ঘাটে ভিড় জমে যায়, কিন্তু যখনই জনতা বোঝে এর পর তারা জড়িয়ে যাবে তখনই তারা সরে পড়তে আরম্ভ করে।

নির্জন দুপুরে ত্রিদিবের আনা একটা পত্রিকা পড়ছিল অনিমেষ। কলকাতা শহরের বয়েস বড় জোর দেড় শো বছর। তার আগে ইতস্তত কিছু জায়গায় মানুষের বসতি ছিল। কলকাতার অরিজিন্যাল বাসিন্দা বলে কেউ নিজেদের দাবি করতে পারে না। চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমানের কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবার যাঁদের অর্থকৌলীন্য চাষের দৌলতে পরিচিত ছিল তাঁরাই ইংরেজের সঙ্গে কর্মসূত্রে মিলিত হবার জন্য কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কলকাতার চেহারা খুলল। তখন শ্যামবাজার থেকে বউবাজার অঞ্চলের বাসিন্দারাই ছিলেন শহরের মাতব্বর। ব্রাহ্মণদের তখনও কলকাতায় আগমন হয়নি ব্যাপক হারে। আসলে বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রামে যে সব তর্কালঙ্কার কিংবা ন্যায়রত্নরা ধর্মের দোহাই পেড়ে আধিপত্য করতেন তাঁদের বংশধররা পড়েছিলেন বিপাকে। তাঁদের অহঙ্কার সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর অব্রাহ্মণরা জীবিকার প্রয়োজনে দ্রুত ওই শিক্ষা গ্রহণ করে। রাজপুরুষের অনুগ্রহ না থাকলে কোনও ধর্মই আধিপত্য পায় না, ফলে সেইসব তর্কালঙ্কারের সন্তানাদিরা ইংরেজিশিক্ষার দিকে যখন ঝুঁকলেন তখন অন্যান্যেরা অনেক এগিয়ে গেছে। বাঙালির চরিত্রে চাকরি করার যে প্রবণতা জন্ম নিল তা তার রক্তে মিশে গেল। ধর্মের দোহাই দিয়ে যখন আর বাঁচা যায় না তখন বাংলা দেশের দূর-দূরান্ত থেকে শুরু হল কলকাতা অভিযান। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর বাবার হাত ধরে হেঁটে আসতে হয়েছিল কলকাতায় শুধু পয়সার অভাবে।

কলকাতা হল সরগরম। শ্যামবাজার থেকে বউবাজারকে বলা হল ঘটি এলাকা। পূর্ববঙ্গের মানুষ তখনও কলকাতায় বিদেশি এবং কালীঘাট-বেহালার কিছু মানুষ অনেক আগেই থেকেই রয়ে গেলেও তাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কলকাতার চেহারা রাতারাতি পালটে গেল। হু হু করে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ আসছে। কলকাতা বেলুনের মতো ফুলে জায়গা করে নিচ্ছে। এই নেওয়া এখনও শেষ হয়নি। উত্তর কলকাতার মানুষ যাদের আভিজাত্যের গর্ব ছিল আকাশছোঁয়া তাদের কলসি গড়িয়ে গড়িয়ে তলানিতে ঠেকল। নতুন সম্প্রদায় জন্ম নিল দক্ষিণ কলকাতায়, পূর্ববঙ্গের ধনবান শিক্ষিত মানুষেরা এসে দেশের ওপরতলার চেয়ারগুলো দখল করে নিজেদের আলাদা গোত্রের বলে চিহ্নিত করে নিলেন। নতুন এক ধরনের অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠল যাঁদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ থাকল না। স্বাধীনতার পর কলকাতা অন্যরকম চেহারা নিয়ে নিল। বেলঘরিয়া থেকে যে কলকাতার শুরু তা থমকে দাঁড়াচ্ছে গড়িয়ায় গিয়ে। কিন্তু এই কলকাতার চেহারাটা কতগুলো খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল যেটা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাবে না। বেলঘরিয়া-দমদম এলাকার সঙ্গে টালিগঞ্জ-যাদবপুর-গড়িয়ার মানুষদের চরিত্রগত মিল বেশি, কারণ এইসব এলাকার মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে এসে কলোনি স্থাপন করেছিলেন। দেশত্যাগের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা এঁদের জীবনযাত্রার ধরন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের থেকে অনেক ধারালো করে দিয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জেদি হওয়ায় ক্রমশ এঁরা কলকাতার ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরের কলকাতা কোনও ভাবপ্রবণতার সঙ্গে জড়িত থাকল না। উত্তরে চিৎপুরের গোড়া থেকে কাশীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল অবাঙালি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। বড়বাজারের সঙ্গে উত্তর ভারতের কোনও শহরের তেমন পার্থক্য নেই। বস্তুত কলকাতার বাঙালিরা বড়বাজারের কোনও কোনও এলাকাকে বিদেশ বলে মনে করে। মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের ওখানে একচ্ছত্র আধিপত্য। পূর্বে রাজাবাজার

এলাকায় কয়েক হাজার অবাঙালি মুসলমানের বসবাস। ট্যাংরা চিনে পাড়া হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মতলা এলাকায় বাঙালি পরিবার গোনাগুনতি। পাশেই পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ইংরেজ শাসনের আর এক ফসল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব এলাকা। খিদিরপুর-মোমিনপুর এলাকায় অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার। ক্রমশ রাসবিহারী এভিন্যু এবং তার সন্নিহিত এলাকা দক্ষিণ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হতে চলেছে। অর্থাৎ মূল কলকাতার যে এলাকা সেখানে বাঙালিরা খুবই সংখ্যালঘু। প্রবন্ধের শেষে লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে যে, এই কস্‌মোপলিটন শহর বিক্ষিপ্তভাবে কোনও ঘটনায় ফুঁসে উঠতে পারে কিন্তু কখনও একই ভাবপ্রবণতায় আলোড়িত হতে পারে না।

এখন ঘরে কেউ নেই। ত্রিদিব কলেজে চলে গিয়েছে। কাল রাত থেকে জব্বর ঘুমিয়েছে অনিমেষ। ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় এগারোটা। ওর যাতে অসুবিধে না হয় তাই ত্রিদিব ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেছে। মাথার পাশে কিছু পত্রিকা আর একটা চিরকুট পেয়েছিল অনিমেষ। 'ঠাকুরকে বলে গেলাম খাবার ঘরে দিয়ে যাবে। আজ হাঁটার চেষ্টা কোরো না।'

হাঁটার কথাটা পড়তেই চলকে এল চিন্তাটা। তার পা গত কাল দারুণ জখম হয়েছিল, হাঁটতে গেলে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছিল সে। সারা রাত শুয়ে থাকায় সে এ কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল। হাত দিয়ে শুয়ে শুয়েই পা টিপে দেখল অনিমেষ। না, কোথাও লাগছে না। কিন্তু মাটিতে পা পেতে দাঁড়ালেই ওটা মালুম হবে। যেন ব্যাপারটা ভোলার জন্যেই সে বিছানা ছেড়ে উঠছিল না। দু-তিনটে পত্রিকা উলটে-পালটে সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু কতক্ষণ এ ভাবে পারা যায়! হাতমুখ ধোয়া দরকার, তা ছাড়া বাথরুমে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অনিমেষ আশা করছিল এখনই ঠাকুর খাবার নিয়ে আসবে। ঠাকুর এলে তার কাঁধে ভর দিয়ে ও সব সেরে নিতে বাথরুমে যেতে পারবে সে। কিন্তু ঠাকুরের জন্যে আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

অনিমেষ ঘরে একবার নজর বুলিয়ে নিল। না, একটা লাঠি জাতীয় কিছু নেই যেটায় ভর দিয়ে হাঁটা যায়। কপালে যা আছে তাই হবে এইরকম ভেবে অনিমেষ প্রথমে ভাল পা মাটিতে রাখল। তারপর সন্তর্পণে অন্য পা নামিয়ে ভাল পায়ে শরীরের ভার রেখে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। না, এখনও কোন যন্ত্রণা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে সেটা দাঁত বসাবে। অনিমেষ কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। এতক্ষণ যেটা সামান্য ছিল, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সেটা প্রবল হল। বাথরুমে যাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। বিপদটা ইচ্ছে করে ডেকে না এনে আর একটু শুয়ে থেকে ঠাকুরের অপেক্ষা করা যদি যেত! দ্বিধায়, ভয়ে ভয়ে সে জখম পা সামান্য বাড়িয়ে একটু একটু করে শরীরের ভার রাখতে লাগল। না, ব্যথা লাগছে না, ধীরে ধীরে সমস্ত ভার ছেড়ে দিতে থাই-এর কাছটায় সামান্য চিনচিন করতে লাগল মাত্র। অনিমেষ এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওই মুহূর্তে সে সব প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে নিজের পা দুটো লক্ষ করতে লাগল। কী আশ্চর্য! কালকের যন্ত্রণাটা এখন বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল ? অনিমেষ দুরুদুরু বুকে পায়ের ওপর আবার চাপ রাখল। হয়তো দাঁড়িয়ে আছে বলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, হাঁটতে গেলেই টের পাওয়া যাবে। ঠিক এই সময় ঠাকুর হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। এক হাতে খাবারের থালা, অন্য হাতে জলের গ্লাস। অনিমেষকে দাঁড়াতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল যেন, 'ত্রিদিববাবু কইল আপুনি হাঁটিতে পারবা নাই, ঠ্যাং ভাঙ্গি গেছে!'

ত্রিদিব কী বুঝিয়েছে অনুমান করে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'সবটা ভাঙেনি, তুমি খাবারটা টেবিলে রেখে এসে আমাকে একটু ধরবে ?'

ঠাকুরের হাঁটা-চলা সব সময় দ্রুত মুহূর্তেই সে অনিমেষের কাঁধ জড়িয়ে ধরল। অনিমেষ হাঁসফাঁস করে উঠল, 'আরে, এ ভাবে নয়। তুমি চুপচাপ দাঁড়াও, আমি তোমাকে ধরে হাঁটব।'

কিন্তু সেটা ঠাকুরের পছন্দ নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁটিবার কী কারণ ?'

অনিমেষ বলল, 'বাথরুমে যাব।'

ঠাকুর হাসল, 'আপনার খাটিয়ার নীচে একটা পাত্র রাখি গেছে জমাদার। ওইটার মধ্যে করি ফেলেন।'

খবরটা জানত না অনিমেষ। কিন্তু ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল না তার। সে একটু জোরেই আদেশ করল, 'যা বলছি তাই শোনো, তুমি বাথরুমের দিকে হাঁটো।'

www.MurchOna.com

ঠাকুরের শরীরে ভর রেখে কয়েক পা হাঁটতেই অনিমেষ আবিষ্কার করল কালকের সেই মারাত্মক ব্যথাটা মোটেই নেই। থাই-এর কাছে কোনও শিরা সামান্য চিনচিন করা ছাড়া তার কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। এটা কেমন করে সম্ভব মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু অদ্ভুত একটা স্বস্তিতে মন এখন শান্ত হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ যখন খুব প্রবল হয় তখন বিস্ফোরণে নয়, চুপচাপ সেটার অনুভবেই বোধ হয় পূর্ণতা পায়। অনিমেষ ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চারপাশে এখন কড়া রোদ ছড়ানো, দু চোখ বন্ধ করে আলো সইয়ে নিল সে।

ভরদুপুরে স্নান করে ভাত খেয়ে বেশ আরাম হল। একটা সিগারেট পেলে বেশ হত। অনিমেষ খোলা জানলার পাশে চেয়ার পেতে মৌজ করে বসেছিল। কাল যে দারুণ ভয় সে পেয়েছিল সেটা মিথ্যে হওয়ায় এখন খুব হালকা লাগছে। ট্রামে উঠতে গিয়ে এমন কিছু বেকায়দায় লাগেনি যে পায়ের জোড়া হাড় ফের ভাঙতে পারে। কিন্তু ব্যথা হওয়া মাত্র সে কথাটাই মনে এসে বদ্ধমূল হয়েছিল। এমনকী, হোস্টেলের ডাক্তার পর্যন্ত স্পেশালিস্ট দেখিয়ে দিলেন। এই জন্যেই বোধ হয় সবাই তাঁকে ঘোড়ার ডাক্তার বলে। অনিমেষ সিদ্ধান্তে এল, ওটা নিশ্চয়ই মাস্‌ল্ পেইন, শিরায় টান ধরেছিল আচমকা। মানুষ কত সহজে ভয় পেয়ে যায়!

আজ ক্লাশ কামাই হল। এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে এখন আর একরকম আলস্যি এসে গেছে। কালকের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল অনিমেষ। বিমান ধরেই নিয়েছে সে ছাত্র ফেডারেশন করবে। এ কথা ঠিক সে ছাত্র ফেডারেশনকে সমর্থন করে এই কারণে যে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কোনও যুক্তি তার কাছে নেই। কিন্তু তাই বলে যে ভাবে বিমান তাকে সবার কাছে উপস্থিত করল সেটা কখনওই শোভন নয়। নাকি তাকে সামনে খাড়া করে বিমানরা একটু যুদ্ধে এগিয়ে গেল। সুবাসদার সঙ্গে কাল যদি অমন করে দেখা না হয়ে যেত তা হলে এ সব ঘটনা ঘটত না। অনিমেষের মনে পড়ল সুবাসদা বলেছিলেন যাওয়ার আগে সন্ধেবেলা তার সঙ্গে দেখা করে যাবেন হোস্টেলে এসে। কিন্তু সুবাসদা আসেননি। হয়তো বৃষ্টির জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। বিমানদের চেয়ে সুবাসদাকে তার অনেক গভীর এবং কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অথচ ওরা দুজনেই এক দলের সক্রিয় কর্মী। ছাত্র ইউনিয়নের কথা ভাবতেই শচীনের কথাগুলো মনে পড়ল। কংগ্রেসের সমর্থনে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে শচীন যাই বলুক, নিশ্চয়ই তার পালটা বক্তব্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু শচীনের কথাগুলো আরও ভাল করে শোনা দরকার। শচীনের কথা মনে হতেই চট করে নীলার মুখ ভেসে এল। নীলা একা পায়চারি করতে ওদের ফেলে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথাটা ভাবতেই অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। আজ নীলা তাকে বাসস্টপে অপেক্ষা করতে বলেছিল। কথাটা স্মরণেই ছিল না তার। এখনও সেখানে যাওয়ার যথেষ্ট সময় আছে, কিন্তু অনিমেষ আবিষ্কার করল বেরুতে একদম ইচ্ছে করছে না। আলসেমি এমন পেয়ে বসেছে যে ইচ্ছে করছে আবার শুয়ে পড়ে। নীলা নিশ্চয়ই বাসস্টপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং অনিমেষ না গেলে বিরক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। কেউ আসবে বলে না এলে মেজাজ ঠিক থাকে না। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে কোথাও ওর জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেনি। এবং যে মেয়ে সোজাসুজি কথা বলে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবলেই এক ধরনের বুক-ভরা আনন্দ হয়, তবু অনিমেষ দোনামোনা করতে লাগল। এ কথা ঠিক, তার পায়ের দোহাই দিয়ে সে নীলার রাগ কমাতে পারবে। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগছে না বটে কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে ট্রাম-বাসে চড়তে গেলে যদি আবার কালকের মতো যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়! সবাই বলবে তার আজকের দিনটা অন্তত রেস্ট নেওয়া উচিত এবং সে তাই করছে। অনিমেষ এত সব যুক্তি খাড়া করেও ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়বে বলে অনিমেষ যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন দরজায় শব্দ হল। আস্তে আস্তে জায়গাটুকু পেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দারোয়ানকে দেখতে পেল সে। তার শরীরের দিকে দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর ঠিক আছে বাবু ?'

তার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে সবাই খবর নিতে আসছে দেখে অনিমেষের ভাল লাগল, 'এখনও ঠিক—তবে কালকের থেকে ভাল।'

'আপনি গেটে যেতে পারবেন ?'

'কেন ?'

'একজন মেয়েছেলে আপনার খবর নিতে এসেছে।'

'মেয়েছেলে ?' অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। মেয়েছেলে মানে নিশ্চয়ই নীলা। কিন্তু ও খবর পেল কী করে ? তিনটে বাজতে তো এখনও কিছু দেরি আছে। ওর পরিচিতি এই হোস্টেলের কোনও

www.MurchOna.com

ছেলেকে নীলা চেনেনা যে তার মুখে খবর পেয়ে দেখতে আসবে। নাকি মেয়েদের সেনসিটিভনেস এত বেশি যে ঠিক মনে মনে জেনে যায় কী হয়েছে। মেয়েরা যাদের ভালবাসে তাদের সম্পর্কে তারা নাকি এই রকম অনুভব করতে পারে। কিন্তু নীলার সঙ্গে তো তার সেরকম সম্পর্ক নয়। অনিমেষ দারোয়ানকে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো, সিঁড়ি ভেঙে নামতে সাহায্য লাগতে পারে।'

ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল অনিমেষ। দারোয়ানের সাহায্য লাগল না। কিন্তু নীচে নামার পর থাই টনটন করতে লাগল। অনিমেষ আশঙ্কা করছিল এই বুঝি আবার যন্ত্রণাটা শুরু হল। সিঁড়ির মুখে একটু সময় নিল সে। ওপর থেকে নীচে নামার চেয়ে নীচে থেকে ওপরে ওঠায় কষ্ট বেশি হবে। এই হোস্টেলের খুব কড়া নিয়ম কোনও মেয়েকে কারও ঘরে গিয়ে দেখা করতে দেওয়া হবে না। এমনকী, তিনি যদি কোনও আবাসিকের মা হন তবুও নয়। নিয়মটা হয়তো ভাল কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় হওয়া উচিত—এই মুহূর্তে অনিমেষ অনুভব করল। পরক্ষণেই থম্বোটোর বন্ধুর কথা মনে পড়ায় হেসে ফেলল সে। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আধভেজানো গেটের সামনে কেউ নেই। মেঘের ছায়ামাখা রোদ সেখানে নেতিয়ে আছে। এই ভরদুপুরে কলকাতা ভীষণ নির্জন হয়ে যায়, কেমন ভার হয়ে থাকে চারধার। অনিমেষ দারোয়ানের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সে গেস্টরুমটা দেখিয়ে দিল। কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরতেই গেস্টরুমের খোলা দরজা দিয়ে যাকে অনিমেষ দেখতে পেল ক্ষীণতম কল্পনাতেও তাকে আশা করেনি সে। হতভম্ব হয়ে যাওয়ার ভাবটা লুকোতে পারল না অনিমেষ। তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে গেস্টরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি?'

উঠে দাঁড়ালেন মহিলা 'দেখতে এলাম, পা কেমন আছে?'

অনিমেষের সব গোলমাল হয়ে গেল। শীলা সেনের দিকে সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। গতকাল সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে সামান্য আলাপ আর সেইটুকুনিতেই তিনি ছুটে এসেছেন তার শরীরের খবর নিতে। কলকাতার মানুষ মাত্রই যে স্বার্থপর নয় এটা বোধ হয় তার একটা নজির। ওঁর মতন সুন্দরী মহিলা, যিনি নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল, এতটা করবেন ভাবা যায় না। ভেতরে ভেতরে যখন আলোড়ন ওঠে তখন মুখে কথাগুলো মিলিয়ে যায়। চেষ্টা করলেও সে সময় শব্দ আসে না। আবেগটা কমাতে সময় লাগল তার।

মহিলা একটু বিস্মিত হলেন, 'আমি কি এসে অন্যায় করলাম কিছু?'

দ্রুত ঘাড় নাড়লেন অনিমেষ, 'না, না, এ কথা ভাবছেন কেন? আপনি বসুন।' গেস্টরুমটা মোটেই সাজানো নয়। কিছু চেয়ার-টেবিল এদিক-ওদিকে ছড়ানো। অনিমেষ চৌকো টেবিলের গা ঘেঁষে থাকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে আর একটায় বসল। বসে বলল, 'আপনি সত্যি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন।'

শীলা সেনের দুই ভ্রূর মাঝখানে চট করে কয়েকটা আঁচড় জাগল, 'কেন? আমি এলাম তাই? আশ্চর্য! কালকে যাকে অমন অসুস্থ দেখে গেলাম তার খোঁজ নেব না।'

অনিমেষ আপ্লুত গলায় বলল, 'সচরাচর তো দেখা যায় না এমন!'

শীলা সেন তাঁর টান-টান খোলা চুলের রাশটাতে সামান্যঢেউ তুলে বললেন, 'আমি অন্যরকম। তা আমার প্রশ্নটার উত্তর পেলাম না কিন্তু?'

'এখন ভাল আছি। এই তো ওপর থেকে হেঁটে নীচে নেমে এলাম।' অনিমেষ জানাল। নিজের শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ওর।

'কিন্তু কালকে কী হয়েছিল, একা হাঁটতে পারা যাচ্ছিল না দেখলাম।' শীলা সেনের মুখের প্রতিটি রেখায় আন্তরিকতার ছাপ।

'শিরায় টান পড়েছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি। এমন কিছু নয়।'

'নিশ্চয় সামান্যও নয়, নইলে আজ কলেজ যাওয়া হত। শীলা সেন ভ্রূভঙ্গিতে সন্দেহটা জানিয়ে দিলেন, 'যাক বাবা, নিশ্চিন্ত হলাম। কালকে বাড়িতে ফেরার পর বারবার করে মনে হচ্ছিল বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকা হয় জেনেও আমি কিছু করলাম না। কারও কষ্ট হলে এত খারাপ লাগে, মনটা কেমন হয়ে যায়।'

এই ভরদুপুরে অনিমেষ মহিলাকে ভাল করে দেখল। কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত কোনও বাঙালি মহিলার একজন নিগ্রো যুবকের সঙ্গে এমন যোগাযোগের সম্ভাবনা নেই যার ফলে ছেলেটি আসক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। শীলা সেন কি তা হলে মধ্যবিত্ত নন? উনি যে পাড়ায় এবং যে বাড়িতে বাস করেন সেটাকে কিছুতেই অতি আধুনিক বলা যায় না। উনি এখন যে ভাষায় কথা

www.MurchOna.com

বলছেন তা কোনও সোসাইটি মেয়ে বলে কিনা অনিমেষের জানা নেই। তবু থম্বোটোর বন্ধুর সঙ্গে একটা ট্যাক্সি চেপে আসার সাহস এঁর আছে। থম্বোটোর বন্ধু এঁর বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব করার সাহস রাখে। তা হলে ইনি কী ? গত কাল মুহূর্তের জন্য হলেও অনিমেষের মনে হয়েছিল শীলা সেনের পুরুষ-ধরা জীবিকা। গতকাল ট্যাক্সিতে এঁকে খুব রহস্যময়ী এবং মোহিনী বলে মনে হয়েছিল। আজ এই দুপুরে সামনাসামনি বসে অবশ্য কোনও রহস্য দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু মহিলা দু' হাতে টান-টান করে সৌন্দর্যের লাগাম ধরে রেখেছেন। বয়সে নিশ্চয়ই বছর দশেকের বড় হবেন, কিন্তু লাবণ্য হল এমন একটা জিনিস যা সহজেই নিচু হয়ে দশ বছর নেমে আসতে পারে।

অনিমেষ বলল, 'আপনি এসেছেন জানলে থম্বোটোর বন্ধু অবাক হয়ে যাবে।'

শীলা সেন বললেন, 'থম্বোটোর বন্ধু ? ও, মোসাম্বার কথা বলা হচ্ছে ? সে আছে নাকি হোস্টেলে ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক জানি না। সকাল থেকে দেখা হয়নি। খোঁজ করব ?'

শীলা সেন হেসে উঠে দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না, না, তার দরকার নেই। আমি এসেছিলাম তাও বলতে হবে না। এই ছেলেগুলো এত প্যাশনেট হয় যে রিজন্ বুঝতে চায় না।'

বলি বলি করে অনিমেষ বলে ফেলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি কিছু মনে না করেন ?'

আবার ভ্রূভঙ্গি হল, 'মনে করার হলে নিশ্চয়ই মনে করব।'

'তা হলে থাক।'

'উম্! বেশ, কথাটা কী ?'

অনিমেষ প্রশ্নটা সাজাতে সময় নিচ্ছিল। সেই ফাঁকে শীলা সেন হেসে উঠলেন, 'নিশ্চয় বলা হবে কী করে ওর সঙ্গে আলাপ হল, আমি কী করি— এই সব তো ? ঠিক আছে, আমিই জবাব দিয়ে দিচ্ছি—প্রশ্ন করতে হবে না। আমি একটা ট্রাবেল এজেন্সিতে আছি যাদের সঙ্গে এই সব আফ্রিকান কানট্রিগুলোর ভাল রিলেশন আছে। ওর দেশ থেকে যে-সব ছেলে এখানে পড়তে আসে আমরা তাদেরও ব্যবস্থা করি। আর এই সব করতে গেলে শুচিবাই হলে চলে না। কিছু বোঝা গেল ?

অনিমেষ স্বীকার করল, না, এত কথাতেও তার কাছে কিছুই স্পষ্ট হল না। শুধু চাকরি করতে গিয়ে কেউ কি এরকম প্রশ্রয় দেয় অচেনা পুরুষকে ? তা ছাড়া শীলা সেন মোসাম্বার কাছে তাঁর এই উপস্থিতি লুকিয়ে রাখতে চান। সেটাও কি স্বাভাবিক ? সে মহিলার মাথার দিকে তাকাল। সিঁথি দেখে ও কিছুতেই বুঝতে পারে না কেউ বিবাহিতা কিনা। স্বর্গছেঁড়া কিংবা জলপাইগুড়ির মতো সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর এখানকার মেয়েরা পরে না। চুলের আড়ালে যদি কোনও সিঁদুর টিপ থেকেও থাকে তবে তা খালি চোখে দেখা যায় না। শীলা সেন বিবাহিতা কিনা জিজ্ঞাসা করা অশোভন। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল সে এত কৌতূহলী হচ্ছে কেন ? এই মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী ? কিছুই না। মাত্র এক দিনের আলাপ। তার মতো সাধারণ অবস্থার ছেলের পক্ষে এইরকম মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। কথাটা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করল অনিমেষ, 'কিন্তু আপনি এসেছেন এ কথা জানতে পারলে মোসাম্বা খুব আহত হবে। তার চেয়ে—।'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন শীলা সেন, 'আই অ্যাম ফেড আপ। ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে আমার পেছনে। ও সব কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আমরা বরং চা-বাগানের গল্প করি। একটা চা-বাগান অনেকখানি জায়গা নিয়ে হয়, না ?'

অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আট-দশ মাইল জায়গা নিয়েও একটা চা-বাগান হতে পারে।'

'বাব্বা! তা হলে তো অনেক টাকার দরকার হয়, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আগে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি এক-একটা চা-বাগানের মালিক ছিল। স্বাধীনতার পর ওরা দেশি কোম্পানির কাছে বাগানগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছু চা-বাগান আছে।' অনিমেষ তথ্যটা জানাল।

শীলা সেন বললেন, 'সত্যি, আমরা কিছুই খবর রাখি না। রোজ সকালে এক কাপ চা না খেলে চলে না অথচ সেটা কী করে তৈরি হচ্ছে সে খবর রাখার প্রয়োজন অনুভব করি না। যে জায়গায় থাকা হয় তার চারধারে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, তাই না ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূভঙ্গি হল, 'হাসা হল কেন ?'

'আপনি আমাকে তুমি বলুন। ও ভাবে কথা বললে অস্বস্তি হয়।'

www.MurchOna.com

'ও মা, তাই নাকি! আমি ভাবলাম তুমি বললে রাগ হয়ে যাবে। আজকাল ছেলেরা ভীষণ অভিমানী হয়ে গেছে, আত্মসম্মান আত্মসম্মান করেই মরল। তোমাকে তুমি বলতে পেরে আমি বেঁচে গেলাম।' তৃপ্তির ছাপ ওঁর চোখে।

অনিমেষ বলল, 'আমাদের ওখানে কাছাকাছি কোনও পাহাড় নেই, তবে পাহাড়ি আবহাওয়া মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। আর সারা দিন আমরা এমন কত জিনিস ব্যবহার করি যার সম্বন্ধে খোঁজ নেবার খুব প্রয়োজন পড়ে না। এই যেমন আমি এখনও জানি না টেলিফোনের সিস্টেমটা সঠিক কী! এরকম তো কত কিছু আছে! তাই চা তৈরির সিস্টেমটা না জেনেও অনেকে খুব চমৎকার চা তৈরি করতে পারেন, তাই না?'

দাঁতে ডান গাল কামড়ে আলতো করে ছেড়ে দিলেন শীলা সেন, 'তুমি তো খুব সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারো। তোমার কি এখন কোনও কাজ আছে?'

অনিমেষ মাথা নেড়ে না বলল।

'তা হলে চলো আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে।' শীলা সেন উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু আমার তো হাঁটতে কষ্ট হবে। কালকে অমন হল, আমি আজ বেরুতে চাই না।' অনিমেষ আপত্তি জানাল।

শীলা সেনের কথাটা একদম পছন্দ হল না, 'ইস্ জোয়ান ছেলের এত ভয় করলে চলে! আর কিছু হলে তো আমি আছি। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোমাকে একপাও হাঁটতে হবে না। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। উনি এতক্ষণ এখানে বসে আছেন বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে! আশ্চর্য ব্যাপার! এতক্ষণে তো প্রচুর মিটার উঠে গেছে। কিন্তু যেতে যে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। সে হেসে বলল, 'আজকে আমাকে ভীষণ আলসেমিতে পেয়েছে। আজ থাক।'

শীলা সেন সর্বাঙ্গে তাকে দেখলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, 'জানো, আজ অবধি কেউ আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেনি। শুধু সবাই যেচে এসে আমাকে এইরকম আমন্ত্রণ জানায়, আমি রাজি হলে কৃতার্থ হয়ে যায়। আর নিজে থেকে যদি কাউকে বলি সে আকাশ হাতে পায়। তুমি যে বলতেই আমার কথায় রাজি হলে না এতে তোমার ওপর আমার অন্যরকম ধারণা হল। আচ্ছা, আজ তা হলে চলি ভাই, তোমার যখনই ইচ্ছে হবে আমাকে টেলিফোন কোরো, সারাটা সকাল আমি বাড়িতে থাকি।'

শীলা সেনের পেছন পেছন গেট অবধি এল অনিমেষ। ট্যাক্সি ড্রাইভার সিটের ওপর শরীর এলিয়ে শুয়েছিল। ওঁকে দেখে সোজা হয়ে বসল।

গাড়িতে ওঠার সময় শীলা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, 'টেলিফোন নম্বরটা মনে আছে তো? থ্রি ফাইভ আর চারটে শূন্য।'

নির্জন গলি দিয়ে ট্যাক্সিটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল অনিমেষ। এতক্ষণ কথা বলেও মহিলাকে সে একটুও বুঝতে পারল না। উনি কেন ওর কাছে এলেন, কেন বারেবারে টেলিফোন নম্বর দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য কী হতে পারে? নিছক ভদ্রতায় কেউ এতটা করে না। অনিমেষের সন্দেহ হল উনি তাকে এমন কিছুতে জড়াতে চাইছেন যাতে ওঁর কোনও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। সেটা কী তা জানা যাচ্ছে না কিন্তু তার মতো আদার ব্যাপারির জাহাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও কারণ থাকতে পারে না। মহীতোষ বা সরিৎশেখর এরকম মহিলার সঙ্গে অপ্রয়োজনে তার আলাপের কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু এতক্ষণ ভাবা সত্ত্বেও অনিমেষ অনুভব করল শীলা সেন সম্পর্কে তার কৌতূহল কিছুতেই কমছে না।

ফিরে আসার জন্য অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াতেই দারোয়ানের সঙ্গে চোখাচোখি হল। লোকটা যে মিটিমিটি হাসছে এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না। প্রায় চার-পাঁচ বছর সে লোকটাকে দেখছে কিন্তু এরকম মুখ করতে কোনও দিন দেখেনি। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

'মেয়েছেলেটা আপনার কে হয়, বাবু?'

'চেনাশোনা, কেন?'

একটু ইতস্তত করল দারোয়ান, তারপর বলে ফেলল, 'ও মেয়েছেলেটা ভাল না।'

'কেন?'

'ও মেয়েছেলেটা নিগ্রোসাহেবের সঙ্গে খুব ঢলাঢলি করে। একদিন আটটার পর নিগ্রো সাহেব জোর করে ওকে নিয়ে ঢুকতে চেয়েছিল ঘরে। ভাল মেয়েছেলে হলে রাজি হবে কেন? তা ছাড়া একদিন মাল খেয়ে এসেছিল।'

www.MurchOna.com

'মাল খেয়ে ? নেশা করেছিল ?' অনিমেষ অবাক।

'হ্যাঁ বাবু, নিগ্রো সাহেবও মাল খেয়েছিল। সেদিন অবশ্য মেয়েছেলেটা ট্যাক্সি থেকে নামেনি, কিন্তু আমার চোখ এড়াতে পারেনি।'

'তুমি কী করে বুঝলে উনি মদ খেয়েছেন ?'

'এ আপনি কী কথা বললেন বাবু। আমি শুকনো নেশা করি বলে ভিজে নেশার গন্ধ টের পাব না! হে হে হে।'

শীলা সেন মদ খান কি না খান, ভাল মেয়ে কি খারাপ মেয়ে তাতে তার কী এসে যায়। একটা ব্যাপার সে অনুভব করতে পেরেছে, শীলা সেন তাঁকে খুঁজতে এই হোস্টেলে হয়তো আর আসবেন না। কিন্তু তিনি অনিমেষের টেলিফোনের প্রতীক্ষায় থাকবেন। ফাঁদ হোক বা নাই হোক, অনিমেষ আর সেখানে পা বাড়াচ্ছে না।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে কষ্ট হল না। এতক্ষণে কালকের হারানো মনের জোরটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরে যে আলসেমি ঘুম-ঘুম ভাবটা কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সেটা আর নেই। জানলার ধারে এসে দাঁড়াতেই ফাঁকা ছাদগুলো আর সিসে রঙা আকাশটা দেখতে পেল। এইরকম শূন্য দুপুরে কেমন ফাঁকা লাগে কলকাতায়। নীলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাসস্টপে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছে! কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে অনিমেষের অস্বস্তি আরম্ভ হল। শীলা সেনের আসার আগে তার এমনটা হয়নি। পরিষ্কার পাজামার ওপর একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এল সে। দরজায় তালা দিয়ে নামতে নামতে খেয়াল হল ত্রিদিবরা এসে তাকে না দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু একটা মেয়ে তার জন্যে বাসস্টপে অপেক্ষা করে আছে আর সে ঘরে বসে থাকবে ? তার পা এখন যথেষ্ট সুস্থ, শীলা সেনের সঙ্গে দেখা করতে সে যদি অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে যেতে পারে তা হলে নীলা কী দোষ করল!

ট্রামে ওঠার পর অনিমেষের মনে হল সে বোধ হয় একটু দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছে। কারণ, এখন পা বেশ ভার-ভার ঠেকছে। ও নিজেকে প্রবোধ দিল এটা শুধু মানসিক ব্যাপার। স্কুলে মন্টু একটা থিয়োরি দিয়েছিল। এক হাতে খুব যন্ত্রণা হলে সেটা কমাতে অন্য হাতে খুব জোর চিমটি কাটতে হয়। নতুন জায়গায় ব্যথা হলে পুরনোটার ধার কমে যায়। ব্যাপারটা করলে কেমন হয়! কিন্তু অনিমেষ সাহস পেল না।

ইউনিভার্সিটির সামনে স্টপে নেমে পড়ল অনিমেষ। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নীলাকে খুঁজল। না, নীলা নেই। তাকে আসতে বলে নীলা চলে যাবে ? অনিমেষের বুকে অভিমান জমতে শুরু করতেই সে একজনের হাতের ঘড়ি দেখতে পেল। চারটে বাজতে সামান্যই দেরি এখন। তা হলে নীলা এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে নিশ্চয়ই চলে গেছে। অভিমান চেহারা পালটে ফেলল আচমকা। নিজেকে খুব অসহায় এবং হৃতসর্বস্ব বলে মনে হচ্ছে। যদি নীলা তার জন্যে অপেক্ষা করে কোথাও চলে যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই খুব বেশি সময় আগে নয়। নীলা এখন কোথায় থাকতে পারে ? পর পর যে জায়গাগুলো চোখে ভাসল সেগুলো হল কফি হাউস, লাইব্রেরি কিংবা ওর নিজের বাড়ি। এমনও হতে পারে ও চলে গিয়েও আর একবার ফিরে আসতে পারে অনিমেষ এল কিনা দেখবার জন্য। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল সে। নীলার মতো মেয়ে তা করবে না। সময়মতো না আসায় অনিমেষকে ও আর আশা করবে না।

অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা নিয়ে অনিমেষ দাঁড়িয়ে ছিল। চারধারে মানুষের ব্যস্ততা, ট্রাম-বাসের আওয়াজ, ছেলে-মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে, অনিমেষ একটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। আধ ঘণ্টা আগেও নীলার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার ব্যস্ততা ছিল না। কিন্তু এখন সেই নীলাকে দেখতে না পেয়ে সব কিছু ফাঁকা মনে হচ্ছে। অনিমেষের মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে সব কিছুই তার জন্যে অপেক্ষা করবে কিন্তু সে সময়মতো সেই অপেক্ষার জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না। আর এ সব কথা কাউকে বলা যায় না, শুধু বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াতে হয়।

## দশ

অন্যমনস্ক হয়ে আংটিটা ঘোরাচ্ছিল অনিমেষ। ঘোরাতে ঘোরাতে সচেতন হতেই সেটায় নজর গেল। আঙুলের যে অংশটায় ওটা চেপে আছে সেটা সাদা হয়ে গেছে কখন। ঘাসের ওপর কিছু চাপা থাকলে রং কিছু দিন পর যেরকম হয়। চট করে দেখলে জায়গাটা নিজের বলে মনে হয় না।

www.MurchOna.com

দীর্ঘকাল কোনও কিছু আবদ্ধ থাকলে এমনি করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে? হাতের অন্য অংশের চেয়ে এই জায়গাটা বেশ ফরসা ফরসা লাগছে, কিন্তু সেটা যে দৃষ্টিকটু তা মানতেই হয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে বোধ হয় এইরকম বোধ কাজ করে। যা সহজ তা সব সময়েই শ্রেয়, যা চেপে বসে তার ফলশ্রুতি যতই মনোরম হোক তাকে মেনে নেওয়া যায় না। আংটির মাঝখানে ছোট্ট অথচ নিটোল অক্ষরটাকে দেখল সে। এত দিন ধরে আংটিটা আঙুলে আছে কিন্তু এমন সতর্ক চোখে দেখা হয় না। অ অক্ষরটা সুন্দর করে লেখা। অ মানে না। সবকিছুতেই না? না মানে বিদ্রোহ? তবু সব কিছু মেনে নিতে হয়? ছোটমা পরিয়ে দিয়েছিল এইটে। এখনও এতদিন পরে সেই দিনটার উত্তাপ অনুভব করতে পারল অনিমেষ। কেমন একটা সঙ্কোচ এবং আদরের সঙ্গে ছোটমা ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল আংটিটা। নিজের মায়ের মুখ এখন ঝাপসা হয়ে গেছে অনিমেষের কাছে, বুকের মধ্যে সেই টনটনানি ভাবটা কখন হারিয়ে গেছে। ছোটমা যখন এল ত^নকার সব কিছু ওর স্পষ্ট মনে আছে। সৎমা বা ওই জাতীয় কোনও মনোভাবের কথা ভাবলেই হাসি পায়। একটু একটু করে কখন ছোটমা ওর বন্ধু হয়ে গেছে। ছুটিছাটায় জলপাইগুড়ি গেলে প্রথম দেখায় হেসে ছোটমা বলবেই, 'ইস, মাছবাবু কী রোগা হয়ে গেছ!' অনিমেষ মানে যেহেতু মাছ তাই মাছবাবু। ছোটমা ওকে খ্যাপায়, 'তুমি তো মাছেরই মতো, কোনও কিছু তোমাকে স্পর্শ করে না। পাঁকাল মাছ।'

পরে অনিমেষ ভেবেছে কথাটা একদম মিথ্যে নয়। ইদানীং তার মনের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো খুব বড় হয়ে থাকছে না। এই যেমন দাদু সরিৎশেখরকে ও এত ভালবাসে বা হেমলতার কাছে সেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হল, কলকাতায় থাকতে থাকতে এমনও হয়েছে দীর্ঘকাল ওঁদের কথা চিন্তায় আসেনি। দাদু তাকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু উত্তর দেব দেব করে এত দেরি হয়ে যায় যে সেই আবেগের দীনতাটা ধরা পড়ে যায়। তার মানে এই নয় যে সে শ্রদ্ধা কম করে বা ভাল না বাসে, ওই লেখা হয়ে ওঠে না এই মাত্র। ক্রমশ সব কিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে একটু একটু করে। মাছেরই মতো। আংটিটার দিকে তাকাতেই স্বর্গছেঁড়ার সেই মাঠ, মাঠে ছোটমার সঙ্গে হেঁটে আসা এবং তারপরই সীতার বিয়ে মনে পড়তেই হেসে ফেলল অনিমেষ। সীতার কথা ওর একদম মনে ছিল না। কেমন আছে, কোথায় আছে মেয়েটা? তার প্রথম প্রেম অথচ সে-কথা ওরা কেউ মুখে বলেনি। সেই বালক বয়সেই প্রথম না হয়েছিল, না মানে অ, অ থেকে অনিমেষ।

শুয়ে থাকলেই যত রাজ্যের গপ্পো মাথায় আসে। বিশেষ করে জানালাটা দিয়ে যদি আকাশ দেখা যায় আর ঘরে কেউ না থাকে। খাট থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল অনিমেষ। বইপত্র তেমন কিছু কেনা হয়নি, এম এ-তে যে ক'টি নেহাত না কিনলে নয় তার বেশি কেউ কেনেও না। এখন থেকে লাইব্রেরিতে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে। আজ রবিবার। ত্রিদিব সেই ভাত খেয়েই প্রিয়ার ম্যাটিনি শো দেখতে গেছে। এই উত্তর থেকে সেই দক্ষিণে। ইদানীং ত্রিদিবের দক্ষিণমুখো মন, উত্তর কলকাতা ওর ঠিক বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। প্রায়ই বলে, দক্ষিণের ছেলেমেয়েদের মনে অনেক ডেপ্‌থ আছে, কথাবার্তা বললে সুখ পাওয়া যায়। আর কিছু না হোক, গড়িয়াহাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই সময়টা কখন টুপ করে চলে যায় যে টের পাবে না। তা ছাড়া ওদিকের বাবা-মারা অনেক বেশি উদারচেতা, মানিয়ে চলতে পারে।

অতএব দুপুরে একা একা কাটাচ্ছিল অনিমেষ। আর একা থাকলেই যত রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে। মানুষ যদি তার সব স্মৃতি, জ্ঞান হওয়া অবধি সে যা করেছে, যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে সব মনে রাখতে পারত, ভাবতেই হাসি পেল। জমতে জমতে একসময় পাত্র ফেটে যা^ব, তাই আপনা থেকে প্রকৃতির নিয়মে বিস্মৃতি আসে, বাঁচিয়ে দেয়।

রোদ্দুরের রং দেখে অনিমেষের খেয়াল হল। আজ ঠিক চারটের সময় বি কে পাল এভিন্যুতে পৌঁছাতে হবে। অথচ নিজের সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে সে কথা খেয়ালই নেই। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পালটে সে বেরিয়ে এল হোস্টেল থেকে। নীচের বাস্কেটবল লনে কয়েকটা ছেলে বল নিয়ে দাপাদাপি করছে। গেটে মোসাম্বার সঙ্গে দেখা। একটা ছোট্ট শর্টস পরে খালি গায়ে দারোয়ানকে টাকা দিয়ে কিছু আনতে বলছে। অমন কুচকুচে কালো শরীরে এক চিলতে সাদা কাপড় কী অশ্লীল দেখাচ্ছে! এ অবস্থায় কিছুতেই অনিমেষ বাইরে আসতে পারত না। অথচ মোসাম্বার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অনিমেষকে দেখে মোসাম্বা চিৎকার করল, 'হাই।'

অনিমেষ হাসল, 'হ্যালো।' ভাগ্যিস সামনের গেটটা পুরো খোলা নেই,তাই রাস্তা থেকে কেউ এই উত্তম শরীর দর্শন করতে পারছে না।

www.MurchOna.com

হাত তুলে একটু দাঁড়াতে বলে ও দারোয়ানকে বুঝিয়ে দিয়ে কাছে এল। এসে চকচকে দাঁত বের করে হাসল, 'আজকাল তোমাকে দেখাই যায় না! সেদিনের ঘটনার পর তুমি কিন্তু আমার ঘরে আর আসোনি।'

'তুমি এসেছ আমার ঘরে?'

'অ্যাঁ।' হো হো করে হেসে উঠল থম্বোটোর বন্ধু, 'তোমরা বাঙালিরা সব সময় কমপেয়ার না করে কথা বলতে পার না। ইউ নো শীলা, তারও এই এক হ্যাবিট।'

'মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?' অনিমেষ কৌতুক বোধ করল।

'ও না থাকলে কলকাতায় থাকতে পারতাম?' একটা চোখ ছোট করল ছেলেটা, 'শি ইজ মাই হেভেন আর হেল অর এনিথিং—এনিথিং অ্যান্ড ওঃ এভরিথিং।' সুর করে গেয়ে উঠল সে, 'বাট হোয়ার আর ইউ গোয়িং?'

এক মুহূর্ত ভেবে সত্যি কথাটা বলল অনিমেষ, 'একটা টিউশনি পাব, সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি।'

'টিউশনি! হোয়াট ফর?'

'টাকার দরকার। আচ্ছা, চলি।' অনিমেষ দেখল মোসাম্বার মুখ কেমন হতভম্ব দেখাচ্ছে।

বি কে পাল এভিন্যু পর্যন্ত হেঁটে আসা কিছু নয়। কিন্তু সময় বাঁচাতে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে চেপে চলে এল সে। হাতিবাগান থেকে বাকি রাস্তাটাকু হেঁটে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখল বিরক্ত পরমহংস ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'শালা, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই আর পাড়াপড়শির ঘুম নেই, না? সেই চারটে থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সেইজন্যে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কখনও কারও উপকার কোরো না।' খেঁকিয়ে উঠল পরমহংস।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'সত্যি দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু তুমি এরকম আংসাং কোটেশন দিয়ো না। রেকর্ডেড হয়ে গেলে মুশকিল হবে।'

'মানে?'

'বিদ্যাসাগর ও কথা বলেননি। কেউ ওঁর নিন্দা করলে মন্তব্য করেছিলেন— খোঁজ নিয়ে দেখো হয়তো কোনও দিন ওর উপকার করেছিলাম।'

'তোমার ওই হল দোষ। মুখের কথাই শোনো, অন্তরের ব্যথা বোঝো না। মুখে না বললেও বিদ্যাসাগর তাই মিন করেছিলেন। ঠিক আছে, এখন যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। যে বাড়িতে আমরা যাচ্ছি সেটা খুব কনজারভেটিভ বাড়ি। বাইরের লোক বৈঠকখানা পার হয়ে কোনও দিন ভেতরে ঢোকেনি। বুড়ো মনে করে পৃথিবীটা রসাতলে যাচ্ছে তাই তিনি নিজের ঘর সামলে রাখতে চান। মেয়েরা সিনেমায় যায় ঝি-এর এর সঙ্গে এবং ম্যাটিনি শো। আরও অনেক নিয়মকানুন আছে, সে গেলেই দেখতে পাবে। মোদ্দা কথা হল, একদম উত্তর কলকাতার খাঁটি ঘটিদের বাড়ি।'

'তুমি এদের খবর পেলে কী করে?' অনিমেষের অস্বস্তি হচ্ছিল।

'আমার মাসিমার ননদের বিয়ে হয়েছে ওখানে। আগে একটা আশি বছরের বুড়ো পড়াত। সে ব্যাটা পটল তুলতে তিনমাস ভ্যাকান্ট আছে। এদিকে ক্লাশ এগিয়ে গেছে, মেয়েটার ক্ষতি হচ্ছে।'

'মেয়ে? আমাকে ছাত্রী পড়াতে হবে নাকি?'

'আপত্তি থাকলে যেয়ো না। তবে মেয়ে বলে গলেও যেয়ো না। এইসব ঘটি মেয়েগুলো এক-একটা কাঁকড়া বিছে। বেচাল হলে থানা-পুলিশ করিয়ে ছাড়বে। প্রাইভেট টিউটার-ছাত্রী মার্কা প্রেমের ধান্দা একদম কোরো না, করলে বিপদে আমি থাকব না।' পরমহংস জানাল।

পরমহংসের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে অনিমেষের। বেঁটেখাঁটো শরীর অথচ হরিণের মতো ছটফটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আগে হলে অন্য কথা ছিল, এখন অস্বাভাবিক কিছু করলেই পায়ে টান লাগে, টনটন করতে থাকে তাই। কিন্তু অনিমেষ তাল রাখতে চেষ্টা করল।

শোভাবাজার/চিৎপুরের এই অঞ্চলে এর আগে কখনও আসা হয়নি। এখন ঠিক সন্ধে নয়, তবে বিকেল শেষ হয়ে আসছে। দুপাশে দোকানপাট মানিকতলা-শ্যামবাজারের তুলনায় অনেক কম। কেমন একটা আলস্য চারদিকে মাখানো। অনিমেষ নজর করল দু পাশের বাড়ির রকগুলোতে যারা গা এলিয়ে বসে আছে তারা বেশ বয়স্ক। বেশির ভাগই ধুতি এবং ফতুয়া টাইপের জামা পরে রয়েছে এবং ধুতি পরার ধরনটা কেমন আলাদা। একটা রকে আড্ডা দিচ্ছে যারা তাদের বয়স আশির কাছাকাছি তো বটেই। এ দৃশ্য কলকাতার অন্য কোনও অঞ্চলে দেখা যাবে না। এটা একদম খাস ঘটি পাড়া।

www.MurchOna.com

পরমহংস বলল, 'এসে গেছি। খুব বিনীত বিনীত মুখ করবে।'

বাড়িটার দিকে তাকালে বয়স ঠাওর করা অসম্ভব। বেশিরভাগ ইট মুখ বের করে রয়েছে। এবং এই বাড়ির বিশেষত্ব যে বাইরে কোনও আড্ডা দেবার রক নেই। দরজায় ধাক্কা দিতে ভেতর থেকে ধমকের সুরে একটা চিৎকার ভেসে এল।

এবার একটু নরম শব্দ তুলতেই দরজাটা খুলে গেল। খুব রোগা, বেঁটে এবং কুৎসিত চেহারার একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই ? দরজা ভাঙবে না ?' কথাগুলো জড়ানো এবং অনিমেষ লক্ষ করল বলার সময় দু গাল বেয়ে লালা গড়িয়ে এল।

পরমহংস মিষ্টি মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তালুইমশাই আছেন ? তুমি আমার চিনতে পারছ না ? আমি — ।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল, 'বাব্বা-বাব্বা— তোমাকে ডাকছে, বাইরের লোক, কী করব ? বসতে বলব, না দাঁড়িয়ে রাখব ?'

চট করে সাড়া পাওয়া গেল না। অনিমেষ দেখল সামনে একটা লম্বা প্যাসেজ এবং সেটা চমৎকার পরিষ্কার। সবে বোধ হয় ধোয়া হয়েছে। একটু বাদেই ওপর থেকে বাজখাঁই গলা ভেসে এল, 'কে ?'

শব্দ লক্ষ করে ওপরে তাকাতেই দেখা গেল এক ভদ্রলোক দোতলার রেলিং-এ ঝুঁকে ওদের দেখছেন। যেটুকু দেখা যায় তাতেই বোঝা গেল পঞ্চাশোর্ধ মানুষটি এখন খালি গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে রয়েছেন।

পরমহংস মুখ তুলে বলল, 'আমি ঝুনু!'

'অ! তুমি এয়েচ! সঙ্গে ওটি কে ?'

'আমার সহপাঠী, ওই যে যার কথা বলেছিলাম!'

'অ! ঠিক আচে। ভুলু, ওদের বাইরের ঘরে বসা।' শরীরটি অন্তর্হিত হল।

'জুতো খুলে এদিকে আসুন।'

পরমহংসের দেখাদেখি সেই বাইরের দরজার পাশেই জুতো খুলে রেখে ভেজা প্যাসেজ থেকে দালানে উঠে এল অনিমেষ। ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা খুলে দিয়ে ভুলু নামের ছেলেটি বলল, 'আপনারা কি অনেকক্ষণ থাকবেন ?'

পরমহংস কিছু বলার আগেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?' প্রশ্নটার ধরনে ওর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠেছিল। আচ্ছা অভদ্র তো!

'তাড়াতাড়ি চলে গেলে বাইরের দরজা বন্ধ করব না।' ছেলেটি লালা চাটল।

অনিমেষের গলার স্বরে সতর্ক হয়েছিল পরমহংস, সামাল দিতে সে বলে উঠল, 'কথাবার্তা শেষ হতে বোধ হয় সময় লাগবে, তুমি বরং বন্ধ করে দিয়ে যাও ভুলু।'

ছেলেটি অদ্ভুতভাবে শরীর দুলিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেল।

অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে পরমহংস বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ ছেলেটা হাবাগোবা, কী কথা কীভাবে বলবে জানে না!'

ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। এবং এটা যদি বসার ঘর হয় তা হলে বলতে হবে অনেক কাল কেউ এখানে বসেনি। নীচে ধুলোটুলো নেই বটে, কিন্তু এমন অগোছালো জীর্ণ হয়ে আছে ঘরের জিনিসপত্র যে এদিকে নজর দেবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করে না। গোটা চারেক লম্বা প্রাচীন আমলের কাঠের চেয়ার আর একটা গোল রংচটা টেবিল, এক পাশে একটা তক্তাপোশের ওপর কালো মাদুর পাতা, ঘরের দেওয়ালে শেষ কবে রং বোলানো হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না।

চেয়ারে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিমেষ টের পেল তাকে ছারপোকা আক্রমণ করছে। ব্যাপারটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। হাজার হোক এ বাড়ি পরমহংসের আত্মীয়দের বাড়ি। দরজার দিকে মুখোমুখি বসার অছিলায় চেয়ার পালটেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না।

পরমহংস বলল, 'বাড়িটা একটু কনজারভেটিভ, কিন্তু তাতে কী হয়েছে। তোমার পড়ানো নিয়ে কথা, পড়িয়ে টাকা পেলেই হল, কী বলো ?'

অনিমেষ বুঝতে পারল পরমহংস পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করে তুলতে চাইছে। সে হাসল, 'তোমার ডাকনামটা জানা গেল আজ।'

পরমহংস বলল, 'ওই আর কী! এরকম তো সবার থাকে। আমারটা তবু ভাল, এ বাড়ির কর্তাদের ডাকনাম শুনলেই চমকে যাবে।'

www.MurchOna.com

'কী রকম ?'

'আমার মাসিমার ননদের বড় শ্বশুরের নাম ছিল বাঘ, মেজ শ্বশুর সিংহী, আর ছোটজনের নাম শিয়াল ; মনে হয় ওদের বাবা খুব জীবজন্তু পছন্দ করতেন। খানিক দূরেই তো রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানা।'

হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ। এরকম নাম কেউ রাখতে পারে! পাড়ার ছেলেরা খ্যাপাত না ? পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে, কোনও রকমে সামাল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যিনি কথা বললেন তিনি কে ?'

'শিয়াল। বাঘ-সিংহী দেহ রেখেছেন। আমরা আড়ালে শিয়ালতালুই বলি। অবিশ্যি ওঁর মা এখনও শিয়াল বলেই চেঁচান।'

কথা শেষ হওয়ার পরেই শব্দ উঠল। শব্দটা জুতোর নয় বোঝা গেল কাছাকাছি হতেই, শিয়ালতালুই খড়ম পরে আসছেন। লম্বা, দড়ির মতো পাকাটে চেহারা, গালের গলার চামড়া কোঁচকানো, নাক অসম্ভব লম্বা। অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের পরনে এখন ঝোলা ফতুয়া আর কোঁচানো ধুতি। এরই মধ্যে বেশ সাজগোজ করে এসেছেন। কাছাকাছি হতেই একটা অম্বুরী তামাক মার্কা গন্ধ পাওয়া গেল।

পরমহংসের দেখাদেখি উঠে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে গেল অনিমেষ। লোকটা বয়স্ক কিন্তু চেনাশোনাজানা নেই, ফট করে প্রণাম করবে ? হাত তুলে সে নমস্কার করতেই ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বসো তোমরা।' ওই শরীর থেকে অমন ভারী আওয়াজ বেরুতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

অনিমেষের ছেড়ে-আসা চেয়ারটায় বসলেন শিয়ালতালুই, বসে বললেন, 'ভর সন্ধেতে কথা বলতে এলে, তা যাক এসে পড়েছ যখন তখন আর কী করা যাবে! তা ঝুনু, তোমার বাবা কেমন আচেন ?'

পরমহংস ঘাড় নাড়ল, 'ভাল, তালুই মশাই।'

'মা ?'

'ভাল।'

'ঠাকুমা ?'

'ভাইবোন ?'

প্রশ্নের ধরন দেখে অনিমেষ কোনওরকমে হাসি চাপল। ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন আর বেচারা পরমহংসের অবস্থা খাঁচায় বন্ধ ইঁদুরের মতো। শেয়ালতালুই শেষ করলেন, 'আজকাল যা যুগের অবস্থা, কেউ ভাল আচে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তা তুমি যখন বলচ ভাল তা হলে নিশ্চয়ই ভাল আচেন ওঁরা। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে ওঁদের বোলো আমি ভাল নেই।' কথার শেষে একটা বড় রকমের নিশ্বাস পড়ল।

'কেন, কী হয়েছে তালুই মশাই!' পরমহংসকে উদ্‌গ্রীব দেখাল।

'মামলা, বুঝলে মামলাতে শেষ হয়ে গেলাম। আজকালকার ভাড়াটেরা তো এক-একটা নবাবপুত্তুর, ভাড়া দেবেন না কিন্তু চোখ রাঙাবেন। আরে, তোরা ভাড়া না দিলে কি আমি না খেয়ে থাকব ? জীবনে পরের গোলামি করিনি, বাড়িভাড়ার টাকায় খাই—দশটা মামলা একসঙ্গে চলচে। যদি জিততে পারি তবে আয় দশগুণ হয়ে যাবে। বেনেটোলার মতো জায়গায় দশখানা ঘরের ভাড়া দেয় ত্রিশ টাকা, ভাবতে পারো ? তাই-ই আদায় হয় না। বাড়িঘরদোর করে সুখ নেই, বুঝলে!' কথা বলতে বলতে বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা টিনের ডিবে বের করে তা থেকে এক চিমটে নস্যি নিয়ে দুই নাকে গুঁজে চোখ বন্ধ করলেন শিয়ালতালুই। তারপর একটা নোংরা নস্যিমাখা রুমালে সন্তর্পণে নাক মুছলেন। অনিমেষ দেখেছে যারা নস্যি নেয় তাদের গলার স্বরে একটু নাকি ভাব এসে যায়। এ ভদ্রলোকের বেলায় সেটা হয়নি। একটু ধাতস্থ হয়ে শিয়ালতালুই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, এবার কাজের কথা বলি, এসেছ কেন ?'

'ওই যে আপনি বলেছিলেন একজন ভাল মাস্টার চাই।'

'অ। তা এটি তো একদম ছোকরা—এ পড়াবে ?'

'হ্যাঁ তালুইমশাই, খুব ভাল ছেলে, মেরিটোরিয়াস।'

'অ। কিন্তু এত ছোঁড়া মাস্টার রাখার কথা তো ভাবিনি। আগে যিনি পড়াতেন তাঁর বয়স আশির ওপরে ছিল, দিনকাল তো ভাল নয়, বুঝলে!'

'না, না, সে সব ব্যাপারে কোনও চিন্তা করবেন না। আপনি আমার মতো বিশ্বাস করতে পারেন ওকে।' পরমহংস বোঝাবার চেষ্টা করল।

www.MurchOna.com

'তোমার সহপাঠী বললে না ?'

'হ্যাঁ।'

'কত বয়স ?'

'একুশ-বাইশ, তাই না অনিমেষ ?' পরমহংসের প্রশ্নের উত্তরে নীরবে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

শিয়ালতালুই ওর দিকে এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় ওর ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছেন এর মধ্যে। এরকম অস্বস্তিতে এর আগে কখনও পড়েছে বলে মনে হয় না।

'কী নাম তোমার ?' প্রশ্নটা এতক্ষণে সরাসরি করা হল।

'অনিমেষ।'

'আঃ, নাম জিজ্ঞাসা করলে পদবিটাও বলতে হয়।'

পরমহংস বলল, 'ওর মিত্তির তালুইমশাই।'

'অ। মিত্তির! কাদের বাড়ির ছেলে তুমি ? শ্যামপুকুর না ঝামাপুকুর ?'

'আমাদের বাড়ি জলপাইগুড়িতে।' অনিমেষ জানাল।

'জলপাইগুড়ি! ওখানে—মানে, তোমরা কি বাঙাল ? না, না, বাঙাল মাস্টার আমি রাখব না।' শিয়ালতালুই সোজা হয়ে বসলেন।

পরমহংস বলে উঠল, 'ওরা বাঙাল নয়, তালুইমশাই। তা ছাড়া জলপাইগুড়ি তো পশ্চিমবঙ্গেই।'

শিয়ালতালুই ঘাড় নাড়ালেন, 'আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। রাজশাহি রংপুর জলপাইগুড়ি সব এক গোত্রের। আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় চালচলনের সঙ্গে কোনও মিল নেই। ভাতের থালা খাটের ওপর তুলে খায় সব।'

ইচ্ছে করছিল না তবু অনিমেষ বলল, 'আমার ঠাকুরদা নদিয়া জেলা থেকে ওখানে গিয়ে সেটল্ করেছিলেন।'

'অ। তাই বলো। তোমরা নদে জেলার লোক। এখানে থাকা হয় কোথায় ?'

'হোস্টেলে।'

'টাকাপয়সার অভাব বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দুর পড়েছ ? ওহো, তুমি তো আবার খুনুর সহপাঠী। তা অঙ্ক-টঙ্ক পড়াতে পারবে ?'

'কোন ক্লাশ ?'

'সেভেন। যাদব চক্কোত্তি ভাল জানা না থাকলে পড়ানো কঠিন।'

'পারব।'

'অ মাইনে নেবে কত ?'

এবার অনিমেষ পরমহংসের দিকে তাকাল। আগে থেকে এ ব্যাপারে কিছু ঠিক করে আসেনি ওরা, খুব ভুল হয়ে গেছে। পরমহংস নির্বিকার মুখে বসে রয়েছে দেখে অনিমেষ বলল, 'আপনি কী ঠিক করেছেন ?'

শিয়ালতালুই বললেন, 'দেখো, আজকাল তো পড়াশুনা হয় না, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। আগের মাস্টারের সঙ্গে কড়ার ছিল যে তিনি অর্ধেকটা মাসকাবারে নেবেন, বাকি অর্ধেক একসঙ্গে রেজাল্ট বেরুলে পেয়ে যাবেন। তা তুমি তাও করতে পারো।'

কাটা কাটা গলায় অনিমেষ বলল, 'আমার প্রতি মাসে পেলেই ভাল হয়।'

'অ। চা-জলখাবার সহ পড়ালে পনেরো টাকা পাবে, বাদ দিলে কুড়ি। কোনটা করবে ? তা জলখাবার বলতে কোন দিন বিস্কুট, কোন দিন মুড়ি, মানে ঘরে যা হয় এইসব।'

'আমাকে চা দিতে হবে না।'

'তার মানে কুড়ি। বেশ, বেশ। ভালভাবে পড়াও, মন দিয়ে পড়াও, রেজাল্ট ভাল করুক, দেখবে চড়বড় করে মাইনে বাড়িয়ে দেব। জানো, হাতিবাগানের একটা চার ঘরওয়ালা বাড়ি থেকে আমি কুড়ি টাকা ভাড়া বাবদ পাই, কী দুরবস্থা! তা আজ হল গিয়ে ষোলো তারিখ— বেশ, বেশ, তুমি আজ থেকেই শুরু করে দাও। এ মাসে অর্ধেক পাবে। আর একটা কথা, তুমি অল্প বয়সের ছেলে, দেখো, আমার মেয়েকে নিয়ে কোনও গোলমাল কোরো না, বুঝলে ?'

পরমহংস বলল, 'সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তালুইমশাই।'

'তা হলে তোমরা কথা বলো, আমি একটু তোমার মাসিমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে আসি। হাজার হোক, মেয়েছেলের ব্যাপার।'

www.MurchOna.com

শিয়ালতালুই খড়মের শব্দ তুলে চলে যেতেই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

'ইম্পসিব্‌ল। আমার দ্বারা এখানে পড়ানো হবে না। চলো কাটি।'

'সে কী! সব ঠিক হয়ে গেল যখন — ।'

'কিস্যু ঠিক হয়নি। এরকম চশমখোর ব্যবসাদারের সঙ্গে আমার যে বনবে না তা বুঝতে পেরেছি। কবে যে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে সামনাসামনি, মেজাজ সামলাতে পারব না, তোমার বদনাম হয়ে যাবে।'

'ধ্যাত।' পরমহংস ওকে হাত ধরে আবার বসাল, 'তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। যুদ্ধ কিংবা প্রেম, এ দুটো ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা করে থাকলে আখেরে লাভ হয়। আরে, এ বাড়িতে তোমার এমন কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েও যেতে পারে যা কল্পনা করতে পারোনি। শেষটা দেখে যাও।

এই সময় খড়মের শব্দ আবার ভেসে এল। শেয়ালতালুই ফিরে এসে দরজায় দাঁড়ালেন, 'বুঝলে ঝুনু, তোমার মাসিমার আপত্তি ছিল, কিন্তু তোমার বন্ধু বলে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু এ ঘরে পড়ালে তো চলবে না। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের তো জানো, মুখে মুখে বদনাম ছড়িয়ে যাবে। তুমি বরং উঠে এসো— ভুলু, ওকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যা। না, না ঝুনু, তুমি যাচ্ছ কোথায় ? তুমি বসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

## এগারো

ভুলু নামের ওই বিদঘুটে ছেলেটি অনিমেষকে বারান্দা পার করে এই ঘরে বসিয়ে রেখে সেই যে উধাও হল আর দেখা নেই। আসার সময় সে লক্ষ করেছিল দু পাশের দরজা-জানলা বন্ধ। একটা বুড়ি ঝি ছাড়া কোনও মানুষ এ বাড়িতে আছে বলে মনে হচ্ছিল না। আব্রুটা এ বাড়িতে একটু বেশি কড়া, কিন্তু কেমন যেন গা-শিরশিরে। পরমহংসের আত্মীয় এরা কিন্তু তাকেও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। এই ঘরে জিনিসপত্র প্রচুর। সবগুলোই ক্লাইভের আমলে কেনা হয়েছিল বোধ হয়। ভারী ভারী জিনিসগুলোর কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই। একটা তক্তাপোশের ওপর ওকে বসতে দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরের সব ক'টা দরজা-জানলা খোলা। কিছুক্ষণ পরে অনিমেষের মনে হল তাকে কেউ বা কারা লক্ষ করছে। দরজা বা জানলার বাইরে থেকে চুরি করে এ ভাবে দেখাটা বোঝা যাচ্ছে চুড়ির শব্দে। খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার কিন্তু কিছু করার নেই। চট করে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দর্শকদের দেখা যাবে, কিন্তু তাতে লাভ কী!

বসে থাকাটা যখন আর সম্ভব হচ্ছে না তখন বাইরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'যা না, ভেতরে যা, মাস্টারের কাছে পড়তে হবে যখন তখন লজ্জা করে লাভ কী। মাস্টার হল বাবার মতন।' বাইরে বোধ হয় ঠেলাঠেলি চলছে। ছাত্রীটি ঘরে ঢুকতে চাইছে না। নিজেকে কেমন চোর চোর মনে হল অনিমেষের। সুযোগ থাকলে তক্ষনি রাস্তায় নেমে যেত সে।

ভুলু পেছন পেছন খড়মের আওয়াজ তুলে শিয়ালতালুই ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে গ্রামভারী গলায় বললেন, 'এদিকে আয়।'

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে যে চলে এল তাকে দেখে অনিমেষ সোজা হয়ে বসল।

শিয়ালতালুই বললেন, 'মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। এই শেষবার, এবার যেন ফেল না হয়। মাস্টার, ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না। পড়াতে যে জানে সে গাধা পিটিয়েও ঘোড়া করতে পারে।'

অনিমেষ তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল, 'আমি কিন্তু সন্ধে নাগাদ আসব।'

'ছ'টা। ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। আড়াই ঘণ্টা পড়ালেই যথেষ্ট।'

'রোজ ?'

'রোজ না পড়ালে তুমি ছাত্রীকে পাশ করাতে পারবে হে ? তা হলে মাস্টার রাখতে যাব কেন ? আচ্ছা নাও, পড়াশুনা করো।' শিয়ালতালুই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এবার আবার ছাত্রীর দিকে তাকাল অনিমেষ। শরীরের কোথাও খাঁজ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ শাড়িটা ওকে আলখাল্লার মতো জড়িয়ে রেখেছে। চট করে একটা পিপের কথা মনে আসে। গায়ের রং অসম্ভব ফরসা, মুখে একটা মিষ্টি ছাপ আছে।

চিবুক এখন প্রায় বুকের ওপর নামানো। আঁচলের আড়ালে রাখা হাতের আদলেই বিব্রত হল সে, এত মোটা মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

www.MurchOna.com

অনিমেষ কিছু বলার আগেই ভুলু বলল, 'মা তোকে প্রণাম করতে বলেছে না! প্রণাম কর!'

কথাটা শেষ হতেই দম-দেওয়া পুতুলের মতো শরীরটা অনিমেষের দিকে এগিয়ে আসতে অনিমেষ আঁতকে উঠল, 'না, না, প্রণাম করতে হবে না।'

ভুলু বলল, 'ছি, ছি, মাস্টারমশাই, মা বলছে আপনি বাবার মতন, প্রণাম না নিলে খুকুর পাপ হবে। প্রণাম কর খুকু।'

অতএব প্রণাম নিতে হল।

মেয়েটির বোধ হয়, ঝুঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। অনিমেষ বলল, 'বসো।'

টেবিল চেয়ার নয়, এই তক্তাপোশের ওপর বসেই পড়াতে হবে। কিন্তু বইপত্র কিছু সঙ্গে আনেনি মেয়েটা। অনিমেষ ঠিক করল প্রথম দিন ওর কোর্সটা জেনে নেবে। অনেকটা দূরত্ব রেখে খুকু বসল। বসার সময় তক্তাপোশের মচমচে শব্দটা কান এড়াল না অনিমেষের। এই ছাত্রীকে পড়াতে হবে ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা হিমভাব আসছে। অনিমেষ নিজের জায়গায় বসে দেখল ভুলু ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বাবু হয়ে বসে এ দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার দিকে নজর পড়ার পর অন্যরকম অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। ওকে কি পাহারা দেবার জন্যে বসিয়ে রেখেছে? ছেলেটার অস্তিত্ব উপেক্ষা করল অনিমেষ। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ক্লাশ সেভেনে পড়ো?'

তুমি বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। এত বড় মেয়েকে প্রথমেই তুমি বলা অন্য সময় হয়তো অসম্ভব হয়, এখন পারল। সে নিজের মুখ-চোখে খুব ভারিক্কি ভাব রাখার চেষ্টা করতেই মনে পড়ল তাকে এই বিশাল মেয়েটির বাবার মতন বলা হয়েছে। শরীর দেখলে বয়স ঠাওর হয় না। বলা যায় না, তার সমান বয়সীও হতে পারে। প্রশ্নটার জবাব তখনও আসেনি। অনিমেষ বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর গলা ভেসে এল, 'বাবা তো বলেচেই কোন কেল্যাসে পড়ে, আবার নেকুড়ি করে জিজ্ঞাসা করার কী আচে?'

'সে আমি বুঝব, তুমি চুপ করো।' চাপা গলায় ধমকে উঠল অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর কপালে তিন-চারটে ভাঁজ পড়ে গেল, আর অনিমেষ দেখল মেয়েটা খুব দ্রুত সামনে-পেছনে ঘাড় নাড়ছে। অবাক হতে গিয়ে সামলে নিল, ঘাড় নাড়ার অর্থ সেভেনেই পড়ে।

'কী কী পড়ানো হয়?'

এবার কোনও উত্তর নেই। হঠাৎ অনিমেষের সন্দেহ হল মেয়েটি কি কথা বলতে পারে না। বোবা মেয়েরাও তো পড়াশুনা করে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞাসা করল সে, 'তুমি কি কথা বলতে পারো না?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নড়বড় করে জানাল, হ্যাঁ।

'তা হলে আমি যেটা জিজ্ঞাসা করেছি তার জবাব দাও।'

ঠোঁট দুটো খানিক কাঁপল, তারপর খুব নিচু স্বরে সরু গলায় উত্তর এল, 'ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ড্রইং—।'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'না, না, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না, তোমাদের কী কী বই পড়ানো হয়? তুমি তো সঙ্গে কোনও বই আনোনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ভুলু উঠে দাঁড়াল, 'আমি নিয়ে আসচি বই।' তারপর দরজা অবধি এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। এক সেকেন্ড কী ভেবে বোনের দিকে ঘুরে বলল, 'আমি তো যেতে পারব না। আমাকে এখানে থাকতে বলেচে।'

অনিমেষের মাথায় রক্ত উঠে গেল। এরকম নোংরা মানসিকতার মধ্যে কোনও ভদ্রলোক পড়াতে পারে না। এর মধ্যে খুকু উঠে দাঁড়িয়ে সেইরকম গলায় বলল, 'আমি বই নিয়ে আসচি, আপনি বসুন।'

ছাত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনিমেষ ভুলুর দিকে তাকাল। সেই একরকম ভঙ্গিতে তাকে জুলজুল করে দেখছে। কপালের ভাঁজগুলো এখনও মেলায়নি। অনিমেষ ডাকল, 'এই এদিকে এসো!'

ভুলু খেঁকুড়ে গলায় বলল, 'কেন?'

'আমি ডাকছি তাই আসবে।'

'ইস, ডাকলেই হল! কাচে গেলে ধোলাই লাগাবে, জানি না! মাস্টাররা খুব মারকুটে হয়, জানি বাবা।' ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগল সে।

www.MurchOna.com

'আমি তোমাকে খামকা মারতে যাব কেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে তোমাকে কাছে ডাকছি।' অনিমেষ গলার স্বর নরম করার চেষ্টা করল।

ভুলুকে একটু ভাবতে দেখা গেল ; অন্যমনস্ক হলেই লালা গড়িয়ে আসে, সেটাকে টেনে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী কতা ?'

'তোমাকে এখানে কে থাকতে বলেছে ?'

'বাবা।'

'তোমার বাবা বলেছেন! কেন ?'

'আপনি বাইরের লোক, খুকি সোমত্ত মেয়েছেলে তাই।'

কোনওরকমে ঢোক গিলল অনিমেষ, 'আগের মাস্টারের সময়ও তুমি থাকতে ? মানে এইরকম পাহারা দিতে ?'

ঘাড় নাড়ল ভুলু, 'হুঁ। তখন মা বলত থাকতে। মা বলত বুড়োরা নাকি খুব খচ্চর হয়।'

কথাটা শুনে জমে গেল অনিমেষ। এরকম পরিবারের কথা তার কল্পনায় ছিল না। আগের মাস্টারের বয়স আশির ওপর ছিল তা গৃহকর্তা জানিয়েছেন। তবু পাহারা চলত। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'কিন্তু আমি যখন পড়াব তখন তোমার থাকা চলবে না।'

'ইস! সেই ফাঁকে যদি ফস্টি-নস্টি চালান! আমাদের বাড়িতে চাকর পর্যন্ত রাখা হয় না এ জন্যে—।' কথাটা শেষ করার আগেই ছাত্রী বইপত্র দু' হাতে জড়িয়ে ঘরে ঢুকল।

ততক্ষণে অনিমেষের পড়ানো মাথায় উঠেছে। তাকে খাট থেকে নামতে দেখে ভুলু প্রস্তাব দিল, 'আমাকে যদি এক টাকা করে মাসে দেন তবে—।'

'তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।' হাত তুলে ওকে দরজা দেখাল অনিমেষ।

ওর গলার স্বরে এমন একটা কাঁপুনি ছিল যে ভুলু থতমত হয়ে এক লাফে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিরাপদ দূরত্বে থেকে বলে উঠল, 'ইস! খুব নেরুড়বাজ!'

কথাটার মানে বোধগম্য হল না। এই সময় ছাত্রীটি বলে উঠল, 'বই এনিচি, দেখুন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'খুকি, আজকে আমার পড়াবার মন নেই। যদি আবার আসি তখন তোমাকে পড়াব। আজ আমি যাচ্ছি।' তারপর হনহন করে বাইরে বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে সে সোজা বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

পরমহংস নেই কিন্তু শিয়ালতালুই খালি গায়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে নাক কুঁচকে বলে উঠলেন, 'এ কী, পড়ানো হয়ে গেল! মাস্টাররা যদি ফাঁকি দেয় তবে ছাত্ররা কী শিখবে! না, না, দু' ঘন্টার কম পড়ানো আমি পছন্দ করি না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি এখানে পড়াব না ঠিক করেছি। আর একটা অনুরোধ করছি, পড়ানোর চেষ্টা না করে এবার ওর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। নমস্কার।' কোনওরকমে প্যাসেজে নেমে পায়ে জুতো গলিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল অনিমেষ।

ধারেকাছেও পরমহংস নেই। এ ভাবে একদম না বলে কয়ে চলে যাবে আশা করা যায় না। অবশ্য যদি থাকার হত ও-বাড়িতেই সে থাকত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার জন্যে অনিমেষ পরমহংসের ওপর রাগ করতে পারছে না। বাড়াবাড়িটা যে এতটা দূর হবে সেটা হয়তো সে আন্দাজ করতে পারেনি। তাই কলকাতা শহরে এরকম পরিবার এখনও থাকতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত। এরাও বাংলা দেশের মানুষ, যে দেশের স্টুডেন্টস ইউনিয়নগুলো ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে এত মিছিল হয়, আন্দোলনের আগুন জ্বলে, তার সামান্য আঁচ এ-বাড়িতে লাগেনি। ঠিক জানা নেই, তবে নিশ্চয়ই এরকম বাড়ির সংখ্যা কম নয়;

কয়েক পা হাঁটার পর অনিমেষের নিজেকে খুব হালকা মনে হল। যেন একটা ভারী পাথর তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, হঠাৎ সরে গেছে। এতক্ষণ যে ধৈর্য ধরে ওখানে পড়েছিল সেটাই আশ্চর্যের। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যাপারটা ঠাওর করে চলে আসতে পারত। তা হলে কি টাকার লোভ, না ছাত্রীটিকে দেখবার আগ্রহ ? ছাত্রীটি যে নিরেট হবে এটা অনুমান করা গিয়েছিল, কিন্তু ধৈর্য না রাখলে এরকম বাড়ির পূর্ণ চিত্র তো পাওয়া যেত না! টাকাটা পেলে অবশ্যই উপকার হত, কিন্তু আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। অনিমেষ হেসে ফেলল, প্রথম রোজগার করতে গিয়েই তাকে এমনভাবে হোঁচট খেতে হল, যাচ্চলে!

বি. কে. পাল অ্যাভিন্যুতে আসতেই চিৎকার করে কেউ তাকে ডাকছে শুনতে পেল অনিমেষ। পরমহংসের গলা, একটা চায়ের দোকান থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে পরমহংস

জিজ্ঞাসা করল, 'হয়ে গেল ?'

'কী ?' অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল।

'দুটোই।'

পরমহংসের মুখের দিকে তাকিয়ে রাগতে পারল না অনিমেষ। ছেলেটার মুখে এমন মজা-করা ভাব আছে যে রাগাও যায় না। ও বলল, 'হ্যাঁ বেশ পড়িয়ে-টড়িয়ে এলাম। ছাত্রীটি খুব ভাল।'

'ভাল মানে ?' পরমহংসের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'ভাল মানে ভাল। ইনটেলিজেন্ট। তুমি তো জল বাদ দিয়ে দুধটুকু খাও আর সহজ কথাটা বুঝতে পারো না!' কপট বিরক্তি দেখাল অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে হতাশ ভঙ্গি করল পরমহংস, 'দূর শালা! যা ভেবেছিলাম তাই হল! তা, বলে কেটেছ, না ভক্তি দিয়ে ?'

'আমি কেটেছি কে তোমাকে বলল ?'

'কেন ছলনা করছ, গুরু! তালুইমশাই আমাকে ভাগিয়ে দেবার পর থেকে ওয়াচ করছি চায়ের দোকানে বসে। দেরি দেখে ভাবছিলাম ক্যালেন্ডার হয়ে ঝুলে গেলে বোধ হয়। কিন্তু ওই গোবরে মেয়েটাকে যখন ইনটেলিজেন্ট বলছ তখন তুমি নির্ঘাত কেটে পড়েছ।' পরমহংস নিশ্চিত গলায় জানাল।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'হ্যাঁ, ও মেয়েকে আমি পড়াতে পারব না, অসম্ভব। আর তুমি দেখে-শুনে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাল করনি। ফালতু সময় নষ্ট হল।'

'কোনও কিছু ফালতু নয় বন্ধু। যাকে উপেক্ষা করছ সেই একদিন তোমার উপকারে আসতে পারে। কাদের জন্যে দেশ উদ্ধার করবে তা চোখ চেয়ে দেখবে না ? তালুইকে কী বললে ?'

'বললাম, আমি পড়াব না, পারলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে।'

'যাচ্চলে! হয়ে গেল, ও বাড়ির দরজা আমার জন্যে ফর এভার বন্ধ হয়ে গেল। পড়াবে না সেটা বললেই হত, মেয়েটা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার কী দরকার ছিল! চলো।'

'আবার কোথায় যাব ?'

'আমার সঙ্গে এসোনা! অলটারনেটিভ ব্যবস্থা রাখাই আছে—এটা ফেল করলে, আর একটা ফিট করে রেখেছি। বাড়ির দালালরা যেমন একসঙ্গে দু-তিনটে বাড়ি দেখায়। এটা হরি ঘোষ স্ট্রিটে, বেশি দূরে নয়।'

অবাক হয়ে পরমহংসকে বলল অনিমেষ, 'সে কী! তোমার সন্ধানে ক'টা টিউশনি আছে ? এজেন্সি নিয়েছ নাকি। তবে ওরকম বাড়ি হলে আমার গিয়ে দরকার নেই আগে থেকে বলে দিচ্ছি।'

'যাচ্চলে! অত গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া তোমাকে তো কেউ দিব্যি দেয়নি যে পড়াতে হবেই। ভাল লাগলে পড়াবে, নইলে নয়। আরে, এক-একটা ছেলে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে কত টাকা টিউশনি করে রোজগার করে ভাবতে পারবে না। আমাদের পাড়ার সুবলদা টিউশনি করতে করতে এম-এ পাশ করল। তারপর চাকরি-বাকরি না পেয়ে টিউশনিটা বাড়িয়ে দিল। রোজ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা বাগবাজারে, সওয়া আটটা থেকে পৌনে দশটা শ্যামবাজারে, দুপুরে দু' জায়গায় মেয়ে পড়ায়, মর্নিং স্কুল হওয়ার সেইটে সুবিধে, রাত্রে আবার দুটো। সপ্তাহে তিন দিন করে হলে সিক্স ইন্টু টু মাসে বারোটা টিউশনি, এক শো পঁচিশ করে ইচ, হাই ক্লাসের স্টুডেন্ট সব। নেট দেড় হাজার টাকা মান্থলি ইনকাম। চাকরি করলেও পেত না বলো ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তা ঠিক। তবে লোকটার নিশ্চয়ই পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু নেই, কোনও কিছু সিরিয়াসলি চিন্তা করতে পারে না। যত টাকাই পাওয়া যাক এরকম চেন-বাঁধা হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। অনিমেষ মরে গেলেও তা পারবে না। কিন্তু একটা এক্সট্রা ইনকাম তার যে খুব প্রয়োজন সে কথা ঠিক। বাবা স্বর্গছেঁড়া থেকে যে টাকা পাঠাচ্ছেন এতগুলো বছরে তার অঙ্কটা বাড়েনি। বাড়ানো যে বাবার পক্ষে সম্ভবও নয় তা সে জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় পারলে সে বাবাকে নিষ্কৃতি দিত—এই টাকা পাঠানোর কর্তব্য থেকে, ইউরোপ-আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা তো রেস্টুরেন্ট-হোটেলে চাকরের কাজ করে নিজেদের পড়াশুনার খরচ চালায়—সেরকম যদি একটা কিছু করা যেত!

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর পরমহংস বলল, 'আমাদের ডান দিকে কী বলো তো ?'

বিরাট রাস্তার ডান দিকে তাকিয়ে অনিমেষ পুরনো ধাঁচের কিছু ঘরবাড়ি আর দোকানপাট ছাড়া

আর কিছু দেখতে পেল না।

পরমহংস ওর মুখের ভাব লক্ষ করে মজা পেল, 'জানো না ?' যাঃ, তুমি নেহাতই নাবালক। এই এলাকাটা ভুবনবিখ্যাত। কোথায় যেন পড়েছিলাম প্যারিসের বারবনিতারা, বঙ্গ সন্তানটি এই জায়গা ঘুরে গেছে জানলে, একদম ঠকাবার চেষ্টা করে না। ওরা আদর করে একে ডাকে গোলডি বলে।'

'গোলডি!'

'সোনাগাছি। কলকাতায় আছ আর সোনাগাছি কোথায় জানো না ? এই জনচেতনা নিয়ে তুমি রাজনীতি করবে, ইস!'

আচমকা অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আজকাল প্রায়ই তুমি এই রাজনীতি করার প্রসঙ্গ তুলছ কেন বলো তো ? এটা তো আমার ব্যাপার, তাই না ?'

পরমহংস অনিমেষকে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল কথাটা এ ভাবে না বললেও চলত, যা এতদিন দেখেছে তাতে ছেলেটাকে হাসিখুশি জমাটি বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে ওই রকম শ্লেষ ভাল লাগে না, বিশেষ করে সে যখন সক্রিয় রাজনীতি করছেই না।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে চলে আসার সময় বড় বড় বাড়ির দরজায় সাজুন্তি মেয়েদের দেখা গেল। সেই কলকাতায় প্রথম আসার পর বউবাজার, কিংবা জলপাইগুড়ির বেগুনটুলির গলিতে সে এদের দেখেছে, তাই চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পরেই পাড়াটা স্বাভাবিক, ভদ্রলোকের মনে হল। এরকম সহ-অবস্থান বোধ হয় কলকাতাতেই সম্ভব।

হরি ঘোষ স্ট্রিটের মাঝামাঝি বাড়িটা। এখন রাত হয়েছে, অন্তত সাড়ে সাতটা তো হবেই। পরমহংস বলল, 'সবে সন্ধে।'

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁকে সুন্দরী বললে কম বলা হবে। অহঙ্কার গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে, চোখের চাহনি শরীরের গঠনের সঙ্গে মিলে এমন একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে যে চোখ চেয়ে থাকাও যায় না, আবার চোখ সরিয়েও নিতে ইচ্ছে করে না। পরমহংসকে দেখে মহিলা বললেন, 'আরে, পথ ভুলে নাকি ? কী সৌভাগ্য। এসো, এসো।'

পরমহংস বলল, 'সঙ্গে আমার বন্ধু আছে, অনিমেষ মিত্র, হোস্টেলে থাকে, জলপাইগুড়ির ছেলে।'

মহিলার দুটো ভ্রূ ডানা মেলার মতো ওপরে উঠল, 'জলপাইগুড়ি! ও মা, তাই নাকি! বসো, বসো।'

ছিমছাম সাজানো বাইরের ঘর। কোনও বাড়তি আসবাব নেই। ওরা সোফায় বসার পর মহিলা সামনেই একটা গদি-মোড়া টুল টাইপের আসনে বসলেন, 'জলপাইগুড়ির কোথায় থাকা হয় ?'

'হাকিমপাড়া। অনিমেষ বলল। সত্যি, মহিলার চারপাশে এমন একটা মিষ্টি আকর্ষণের মায়া জড়ানো যে ভাল না লেগে যায় না। বয়স হয়েছে অবশ্যই চল্লিশের চৌহদ্দিতে, কিন্তু কোথাও সেটা তাঁকে আক্রমণ করতে পারেনি। বিজ্ঞাপন ছাড়া এমনটি দেখা যায় না।

'ও মা, হাকিমপাড়ায় যে আমার বাপের বাড়ি ছিল! কী মজা!'

'হাকিমপাড়ায় আপনারা থাকতেন ?'

'হ্যাঁ, ওই যে ঝোলনা পুল, ওটার ঠিক ডান দিকে। বর্ষার সময় করলার জল একদম বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেত। সে সব দিনের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। কী আনন্দে ছিলাম তখন! আপনাদের বাড়িটা কোনখানে ?'

অনিমেষ বলল, 'আমাকে তুমি বলবেন, আমি ওর সহপাঠী।'

'বেশ, বেশ। অতটুকু ছেলেকে আপনি বলতে ইচ্ছে করে না, আবার না বললে—।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমরা তো মফস্বলের ছেলে, আমাদের অত ভ্যানিটি নেই। ও হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা হল টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে তিস্তা নদীর ধারে।'

'কোন বাড়িটা ? বিরাম করদের বাড়ির কাছে ?'

'না। কিন্তু বিরাম করকে আপনি চেনেন ?'

'খুউব চিনি। ওঁরা তো এখন রিচি রোডে আছেন। দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড়জন আমেরিকায়, মেজোটা বম্বেতে। ছোটটার কী একটা অসুখ হয়ে শরীর এত রোগা হয়ে গেছে যে ওকে নিয়ে বিরামবাবুদের চিন্তা। তুমি ওদের চেনো নাকি ?' ভদ্রমহিলার চোখ সব সময় কথা বলে।

'চিনতাম। কলকাতায় আসার পর আর দেখা হয়নি।'

'ওই তো, থার্টি ফোর বি রিচি রোডে ওরা থাকে, চলে যেয়ো এক দিন।'

'দেখি।'

'আরে, তখন থেকে কথা বলে যাচ্ছি, কী খাবে বলো?'

পরমহংস এতক্ষণ কথা শুনছিল, এবার বলল, 'দেশের লোক পেয়ে এমন মগ্ন হয়ে পড়লেন যে আমার কথা খেয়ালই নেই। খাব, কিন্তু আমরা একটা প্রয়োজনে এসেছি।'

'সে তো জানি, দরকার ছাড়া আমার কাছে কেউ আসে না। আগে চা খাও, তারপর শুনব। বোসো তোমরা।' ভদ্রমহিলার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটায় অদ্ভুত মাদকতা আছে।

অনিমেষ পরমহংসকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে ইনি?'

'তোমার দেশওয়ালিভাই। নর্থ বেঙ্গলের লোকদের দেখেছি পরস্পরের প্রতি খুব টান থাকে, সেটা মনে পড়তেই নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু এখানে কাকে পড়াতে হবে?'

'ওঁর ছেলে। উনি ইন্ডিয়ান টোবাকোতে বড় চাকরি করেন।'

'ওঁর স্বামী?'

'ছিল, এখন ডিভোর্সি।'

'সে কী!'

'যাঃ, আঁতকে উঠলে! এই মন নিয়ে তুমি পলিটিকস—সরি, মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে! এঁরাও আমার আত্মীয়, মানে এঁর হাজব্যান্ড।'

'বাব্বা, তোমার তো ভ্যারাইটিস আত্মীয়স্বজন আছে!'

'অনেকেই অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, একমাত্র আমিই সেতু হয়ে আছি। তবে এ বাড়িতে অনেক দিন পরে এলাম।'

দেওয়ালে কয়েকটা কিউরিয়ো, একটা বাচ্চা ছেলের দারুণ উজ্জ্বল ছবি চোখ টানে। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল এই মহিলা বিরাম করের কথা বলছিলেন। জলপাইগুড়ির এককালের কংগ্রেসি রাজনীতির নেতা বিরামবাবু নিশ্চয়ই আর সক্রিয় নন, থাকলে নাম শোনা যেত। ওঁরা কলকাতায় আছেন, কিন্তু কোনও দিন দেখা করার বাসনা হয়নি। মুভিং ক্যাসেল কি এই মহিলার বান্ধবী? অবশ্য তাঁর বয়স নিশ্চয়ই বেশি। মেনকাদি এবং উর্বশীর বিয়ে হয়ে গেছে, সময় কীভাবে চলে যায়! অনিমেষ আবিষ্কার করল উর্বশী নয়, এতদিন পরে রম্ভার জন্যে মনে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তার জীবনে রম্ভাই প্রথম, যে নারী হবার আগেই ওকে চুমু খেয়েছিল। কী বিরক্তি এবং ক্রোধ সে সময় তাকে মেয়েটাকে ঘেন্না করতে সাহায্য করেছিল! এখন এই মুহূর্তে হাসি পায়। ভদ্রমহিলা যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে রম্ভাই এখন অসুস্থ! সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা—। সেই দুপুরে শরীরের জ্বর নিয়ে শুয়ে-থাকা মেয়েটার সব অহঙ্কার সে চুরমার করে দিয়েছিল নির্লিপ্ত হয়ে—এখন কেমন যেন মায়া লাগছে সে কথা ভেবে। অনিমেষের খেয়াল হল এই মহিলার নিশ্চয়ই ও বাড়িতে যাতায়াত আছে এবং রম্ভা যখন শুনবে যে অনিমেষ টিউশনির উমেদারি করতে এখানে এসেছে তখন নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকাবে। মেয়েরা কি পুরুষের স্মৃতি ভুলে যায়? যদি না যায় তা হলে নিশ্চয়ই রম্ভা এতদিন বাদে মন খুলে হেসে নেবে।

অনিমেষ ঘুরে বসল, 'এই তুমি এখানে টিউশনির কথা বোলো না।'

অবাক হল পরমহংস, 'কেন?'

'না, আমি ঠিক করলাম, জলপাইগুড়ির লোকের বাড়িতে টিউশনি করব না। এটা ঠিক হবে না।'

'যত সব ফালতু সেন্টিমেন্ট। ভাল মাল দেবে বুঝলে!'

'দিক। তবু না, প্লিজ। এ-সব কথা পেড়ো না।'

'কিন্তু আমি যে বললাম প্রয়োজনে এসেছি—।'

'কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ো, সে তুমি পারবে।'

'তোমার টাকার দরকার নেই?'

'আছে।'

'তা হলে?'

'আমার কতগুলো জমানো স্মৃতি আছে, সেগুলোকে বিক্ষত করে টাকা চাই না। এ তুমি ঠিক বুঝবে না।'

www.MurchOna.com

## বারো

হোস্টেলে কেমন একটা থমথমে ভাব। এমনিতেই খুব হইহল্লা না হলেও যে স্বাভাবিক চেহারাটা থাকে সেটা নেই। সবাই গুজগুজ করছে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, যেন মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে! ওকে দেখতে পেয়ে গোবিন্দ এগিয়ে এল, 'আজকে এখানে একটা কেস হয়েছে।'

'কেস, কী কেস?' অনিমেষ তাকাল।

'অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরে মহিলা এসেছেন।'

'আচ্ছা!' অনিমেষ হেসে ফেলল, 'কখন?'

'সেই সন্ধেবেলায়, স্টিল চালিয়ে যাচ্ছে।' উষ্মা গোবিন্দর গলায়।

'তাতে কী হয়েছে?' অনিমেষের মজা লাগছিল।

'কী হয়েছে মানে? এ হোস্টেলের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে স্পষ্ট লেখা আছে কারও ঘরে মেয়েদের আসা চলবে না, সে মা কিংবা বোন যাই হোক না কেন। আমাদের প্রত্যেকের বেলায় নিয়মটা কড়াকড়ি করে রাখা হয়েছে। এ এস ব্যাচেলার, ওঁর ক্ষেত্রে তা শিথিল হবে কেন?'

কথাটা ঠিক। এ নিয়ে কিছু দিন আগে থম্বোটোর বন্ধুর সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল। ছেলেটা ব্যবস্থাটাকে গালাগালি দিচ্ছিল। নিয়ম যা তা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ব্যবস্থার সাদা কালো দুটো দিকই আছে, তা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও লোকে মেনে নেয় যখন দেখে সবাই একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে এ এস নিয়ম ভেঙে নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। তবু কে বলতে চাইল, 'যিনি এসেছেন তিনি ওঁর মা বা বোন নয় তো?'

গোবিন্দর সঙ্গে ততক্ষণে আরও অনেকেই জুটে গেছে। এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ওরা জটলা করছিল, ফুঁসছিল, কিন্তু কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। এখন অনিমেষকে দেখতে পেয়ে অনেকেরই দেখা বা শোনা দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল। ইউনিভার্সিটির জি এসের সঙ্গে অনিমেষের যোগাযোগ এবং পুলিশের গুলিতে একদা আহত হওয়ার গল্প। গোবিন্দ বলল, 'তুমি খেপেছ! সেরকম হলে আমরা কিছু বলতাম না। শ্রীলা এসেছে।'

'সে আবার কে?'

'স্কটিশের মক্ষীরানি। ফোর্থ ইয়ারের পাশ ক্যান্ডিডেট। দারুণ অভিনয় করে।'

ব্যাপারটা ভাল লাগল না অনিমেষের। কিন্তু এদের এতখানি উত্তেজনার তেমন কী কারণ আছে বোধগম্য হচ্ছিল না। ও শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সুপারকে ব্যাপারটা জানাও, জানিয়েছ?'

'সুপার নেই। তা ছাড়া সুপার কি আর এ এস-এর এগেনস্টে স্টেপ নেবে! ওরা সব এক জাতের লোক।' ভিড়ের মধ্যে একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল।

অনিমেষ বলল, 'বেশ, তোমরা কী করতে চাও?'

'মেয়েটাকে এখান থেকে বেরুতে দেব না।' একজন বেশ দৃঢ় গলায় জানাল।

'সেটা অন্যায় হবে, সুপারের কাছে একটা রিটন্ কমপ্লেন করলে হয় না? সবাই সই করব।' আর একটা গলা মিনমিন করল।

'ছিঁড়ে ফেলবে, কোনও কাজ হবে না। শালা প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা মারছে, আমাদের কলা দেখিয়ে—ও করবে সুবিচার!'

'মাইরি, মার্বেল প্যালেসে ভিখিরিদের এর চেয়ে ভাল খাবার দেয়। ডাল না তো, আমাশার পায়খানা! মাছগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে আনে।'

অনিমেষ হাত তুলে সবাইকে থামাল। গোলমালটা বাড়তে শুরু করলে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তার ঠিক নেই। সে বলল, 'ব্যাপারটা যদি আমার ওপর ছেড়ে দাও তা হলে আমি চেষ্টা করতে পারি। আমি প্রথমে এ এস-এর সঙ্গে কথা বলব। তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?'

দেখা গেল সবাই এক সঙ্গে যেতে চাইছে। এত লোক গেলে কথা বলা যাবে না। গোবিন্দ আর একটি অবাঙালি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অনিমেষ কথা বলতে যাবে ঠিক করল, বাকি সবাই সিঁড়িতে অপেক্ষা করবে। ত্রিদিবকে এই ক্ষুব্ধদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল না সে। হয়তো হোস্টেলেই নেই, কিংবা সে এইসব বারোয়ারি ঝামেলা পছন্দ করে না। হোস্টেলের সবাই ভিড় করে এসেছে, কিন্তু থম্বোটোর বন্ধু বা থম্বোটো আসেনি, যদিও অবাঙালি ছাত্রদের সংখ্যা কম নয়। এবারে থম্বোটোর বন্ধুর অভিযোগ সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত ছিল।

www.MurchOna.com

দোতলায় উঠতেই অনিমেষ থম্বোটোকে দেখতে পেল। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যালো, হোয়ার ইজ ইয়োর ফ্রেন্ড ?'

উত্তরে দু কাঁধ নাচিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল থম্বোটো, সে জানে না।

অনিমেষ একবার ভাবল থম্বোটোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে কি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত পালটাল। সেটা হয়তো থম্বোটো বিদেশি বলে কিংবা ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, তাই।

অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরটা একদম কোনার দিকে। বড় ঘর, সঙ্গে বাথরুম আছে। এই কোনা থেকে তাকালে হোস্টেলের অর্ধেকটা দেখা যায়। সুপারিনটেনডেন্ট থাকেন ঠিক বিপরীত দিকের দোতলায়। তাঁর জানলা থেকে হোস্টেলের বাকি অংশটা চোখে পড়ে। ব্যবস্থাটা এইভাবে করা যাতে দুজনের চোখের ওপর ছেলেরা থাকে। এখন অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরের একটা দরজা ভেজানো, পরদার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে বাইরে।

অনিমেষরা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই গোবিন্দ বলল, 'চলো, আচমকা ঢুকে হাতে হাতে ধরে ফেলি।'

অবাক হয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ধরবে ? মেয়েটি তো আছেই!'

ঘাড় নাড়ল অবুঝ ভঙ্গিতে গোবিন্দ, 'আরে, সেতো আছে। আমি মাল কট করার কথা বলছি। উলটাপালটা অবস্থায় থাকলে সবাইকে ডেকে আনব।'

হঠাৎ অনিমেষের মনে হল ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এরা এই ঘটনাতে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অথচ অনিমেষের মনে তার আঁচ একটুও লাগছে না। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না। আমরা ভদ্রভাবে বলব এবং তোমরা যদি অন্য কিছু করতে চাও তা হলে আমি নেই।'

গোবিন্দ হতাশ ভঙ্গিতে একবার ওর দিকে আর একবার নীচে অপেক্ষায় থাকা ছেলেদের দেখে কোনওরকমে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

অনিমেষ ভেজানো দরজায় কড়া নাড়ল একবার। ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল প্রায় ফিসফিসিয়ে কিন্তু ঘরের ভেতর থেকেও তো কোনও শব্দ বাইরে আসছিল না! দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই এ এস-এর গলা শোনা গেল, 'আয়।'

খুব স্বাভাবিক এবং একটুও নার্ভাসনেস গলায় নেই। ওরা অবাক হল। অনিমেষের মনে হল ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পারেননি যে ওরা এসেছে।

দরজাটা ঠেলে অনিমেষ প্রথমে ভেতরে ঢুকল। জানলার ধারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এ এস কিছু লিখছেন। টেবিল ল্যাম্পের আলো ওঁর মুখ, শরীর এবং ঘরে একটা কোণে ছড়িয়ে আছে। ঘরে এক পাশে বই-এর আলমারি, আলনা আর স্প্রিং-এর খাট। অনিমেষ দেখল একটি মেয়ে সেই খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। শোয়ার ভঙ্গিতে বোঝা যায় যে সে গভীর ঘুমে মগ্ন। এরকম দৃশ্য দেখতে পাবে বলে সামান্য প্রস্তুত ছিল না গোবিন্দরা, স্বভাবতই হকচকিয়ে গেল।

এ এস লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই ?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' অনিমেষ শান্তস্বরে বলল।

চমকে মুখ ঘোরালেন এ এস। মাঝবয়সী ভদ্রলোক এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন খানিকক্ষণ মুখ থেকে কথা সরছিল না। হয়তো ভেবেছিলেন ঠাকুর চাকর কেউ এসেছে। তাই খেয়াল করেননি। এখন ওদের দেখে চট করে বিছানায় নজর বুলিয়ে নিলেন। সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ঘুমলে মানুষ শিশু হয়ে যায়।

'কথা ? কীসের কথা ?' চশমাটা চোখ থেকে সরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক।

'আপনি একটু বাইরে আসুন।' অনিমেষ একটুও উত্তেজিত হচ্ছিল না।

'বাইরে যাব কেন ? হোয়াট ডু ইউ মিন ?'

'আমরা যে বিষয়ে কথা বলতে এসেছি সেটা ওঁর সামনে শুনতে হয়তো আপনার ভাল লাগবে না।' কথাটা শেষ করে চোখের ইঙ্গিতে বিছানাটাকে দেখাল অনিমেষ।

এ এস এবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলতে চাইছ ?'

'আপনার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ আছে।'

'আমার সম্পর্কে ? হাউ ফানি! কী ব্যাপার ?'

'আপনি কি এখানেই শুনতে চান ?'

www.MurchOna.com

'ও, ইয়েস!'

'আপনি হোস্টেলের আইন ভাঙছেন। এবং সেটা হোস্টেলের ছেলেরা ভালভাবে নিতে পারছে না। আইন সবার ওপর সমান প্রযোজ্য।'

কথাটা বলার সময় লক্ষ করল অনিমেষ মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ খুলে শুনছে কথাগুলো। যদিও এখনও উপুড় হয়ে রয়েছে তবু মুখ বালিশের ওপর পাশ ফিরে রাখার ফলে চোখের পাতার নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে।

'বুঝতে পারছি না কী বলতে চাইছ!'

'ভিজিটারদের জন্য একটা ঘর বাইরে আছে। আপনি সেটা না ব্যবহার করে একজন মহিলাকে ঘরে নিয়ে এসেছেন। এটা অন্য ছেলে করলে তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হয়।'

'অফ কোর্স! কিন্তু সে নিয়মটা আমাকে মানতে হবে কে বলল?'

'কারণ আপনি এই হোস্টেলে থাকেন।'

'দেখো ছোকরা এতক্ষণ অনেক বাড়াবাড়ি করেছ, কিন্তু আমি আর অ্যালাউ করব না। তুমি ভুলে যেয়ো না আমি অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট এবং তার জন্য ফ্রি কোয়ার্টার পাচ্ছি, ফুড পাচ্ছি। বাট ইউ আর টু পে ফর অল। তোমরা ছাত্র আর আমি কলেজে পড়াই। কোন সাহসে তোমাদের সঙ্গে আমার কমপেয়ার করছ আমি বুঝতে পারছি না।' ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

'ঠিকই, আপনি সবই ঠিক বললেন, শুধু আইনটা সবার জন্যই এটা ভুলে গেলেন। আপনি ঘরে মহিলাকে আসতে দিলে সেটা অন্যদের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। অনেকেই তাই চাইবে, যেহেতু আপনার আদর্শ সামনে আছে। তা ছাড়া হোস্টেলের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে কোথাও বলা নেই যে ছাত্রদের একরকম চলতে হবে আর অবিবাহিত এ এস-এর সাত খুন মাফ। এটা কি ঠিক বললেন?'

'পরের ব্যাপারে নাক গলানো বাঙালির নোংরা অভ্যেস।' একটুও না নড়ে মহিলাটি কথা বললেন। অনিমেষ দেখল মহিলা কথাটা বলার পর আবার চোখ বন্ধ করলেন।

এ এস বললেন, 'গেট আউট ফ্রম হিয়ার! আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

অনিমেষের পেটের ভেতরে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা জন্ম নিল। সে তবু স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, 'কথা আপনাকে বলতে হবে।'

'মানে?'

'আমরা যা চাইছি তাই শুনতে হবে।'

'তুমি আমাকে হুকুম করছ? হাউ ফানি!'

'হ্যাঁ। কারণ আইন আপনি ভেঙেছেন।'

'তা কী করতে হবে আমাকে?'

'ওই মহিলাকে এখনই বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসে ছেলেদের কাছে ক্ষমা চান। কারণ ওরা খুব উত্তেজিত।'

'হো-য়া-ট!' ভদ্রলোকের চোয়াল যেন ঝুলে গেল।

এই সময় মেয়েটি তড়াক করে খাটের ওপর উঠে বসল। ওঠার সময় কাপড়ে টান পড়ায় ওর শরীরের কিছু কিছু জায়গা উন্মুক্ত হয়ে গেলেও সে একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিকঠাক করে নিল। অনিমেষ দেখল মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী। এমন একটা সৌন্দর্য যার ধার আছে কিন্তু আধার নেই। একে কোনও দিন অনিমেষ দেখেনি। হয়তো ও কলেজ ছাড়ার পর ভরতি হয়েছে। মেয়েটি বলল, 'হু ইজ হি?'

'আমার নাম অনিমেষ মিত্র, এই হোস্টেলের একজন বোর্ডার। শুনুন, আমার অনুরোধ আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে এবং ছেলেরা উত্তেজিত।'

এ এস উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি—তুমি আমার সামনে ওকে অপমান করছ? আই উইল টিচ ইউ, তোমাকে আমি হোস্টেল থেকে তাড়াব। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে তোমাদের। গেট আউট, গেট আউট ফ্রম মাই রুম!'

এতক্ষণে যন্ত্রণাটা সারা শরীরে ছড়াল। অনিমেষ প্রথমে ঠাওর করতে পারছিল না সে কী করবে। কিন্তু এত উত্তেজনার মধ্যে সে সূক্ষ্মভাবে একটা চিন্তা করতে পারছিল যে হুট করে কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না। সে গোবিন্দদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি যখন ভাল কথায় শুনবেন না তখন আমাদের বাধ্য হতে হচ্ছে ওঁকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে। চলো।'

কথাটা শোনামাত্র মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। যেন এক রাশ বিদ্রূপের নোংরা জল ওদের

www.MurchOna.com

ওপর ছিটিয়ে দিয়ে আনন্দ পেল সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে অনিমেষ দেখল সিঁড়ির মুখটায় ভিড় মৌমাছির চাকের মতো জমে আছে। সঙ্গীদের নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে যেতে ছেলেরা চুপ করল। সবাই বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে। অনিমেষ বলল, 'এ এস কোনও কথা শুনতে চাইছেন না। বলছেন আইন নাকি ওঁর ওপর প্রযোজ্য নয়। আমাকে ভয় দেখিয়েছেন হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলে। রেগে গিয়ে যা-তা কথা বললেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হল যেন, ছেলেরা চিৎকার করে গালাগাল শুরু করে দিল এ এস-এর নাম ধরে। এই গালাগালগুলো হজম করা অনিমেষের পক্ষেও খুব শক্ত ব্যাপার, কারণ সবগুলোই আদিরসাত্মক ও মেয়েটিকে জড়িয়ে ইতর ভাষায় বলা। কেউ কেউ চাইছিল লোকটাকে বাইরে বের করে একটু শিক্ষা দিতে। কিন্তু অনিমেষ বাধা দিল। সবাইকে চুপ করাতে সে হাত তুলে অনুরোধ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গলাগুলো নেমে এলে সে প্রস্তাব দিল, 'খামোকা এমন কিছু আমরা করব না যাতে এ এস সুবিধে পেয়ে যান। আমাদের অভিযোগ হল : আইন সবার জন্যে এবং এ এস সেটা মানছেন না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ কেউ মাথা গরম কোরো না। এ এস-কে বাইরে যেতে হলে এই বারান্দা দিয়েই যেতে হবে। আমরা সবাই এখানে বসে থাকব। আমাদের মাড়িয়ে তো তিনি যেতে পারছেন না! যতক্ষণ না ভদ্রলোক তাঁর সবরকম আচরণের জন্য ক্ষমা না চাইছেন ততক্ষণ তাঁকে যেতে দেব না। কী, রাজি?'

ঢেউ-এর মতো শব্দটা গড়িয়ে এল, সবাই রাজি।

গোবিন্দ প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু ওই মেয়েটা? ও যেতে চাইলে কী হবে?'

অনিমেষ হেসে ফেলল প্রশ্নটা বলার ধরনে, 'না, ওঁকেও যেতে দেওয়া হবে না। কারণ আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম চলে যেতে, তিনি বিদ্রূপ করেছেন।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'ওকে আপনি বলে সম্মান দিয়ো না, অনিমেষদা। কলেজে কত ছেলের বারোটা বাজিয়েছে তা জানো না।'

আর একজন বলল, 'তোর বাজায়নি তো?'

'প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিল। তিনমাস ধরে আমার পয়সায় খেয়ে শেষে বলে কিনা তোমরা ছেলেরা সব এক রকম। একটু প্রশ্রয় দিলেই নিজেকে জমিদার ভাবতে শুরু করো।'

কথাটা শেষ হলেই সবাই হইহই করে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে বারান্দাটা ভরতি হয়ে গেল। সবাই যেন ফুর্তির সঙ্গে গুলতানি শুরু করে দিল। এখন কারও পক্ষে ওদের ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে কে একজন গিয়ে খবোটোকে ধরে নিয়ে এল ওখানে। সকলের অনুরোধে সে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গানে ঠোঁট রাখল। একটা ঝমঝমে সুর ক্রমশ হোস্টেলটায় ছড়িয়ে পড়ল। সুরটার মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে যে ছেলেরা একসময় হাততালি দেওয়া শুরু করল তালে তালে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে অনিমেষ এই সুরের মধ্যে থেকেও অন্য কথা ভাবছিল। পেটের যন্ত্রণাটা এখন থিতিয়ে এলেও সমস্ত শরীর অবসন্ন করে দিয়েছে। এটা কেন হয় জানা নেই, কিন্তু উত্তেজিত হলেই যদি এইরকম শারীরিক অবস্থা হয়—তা হলে?

হঠাৎই সব বাজনা কথাবার্তা আচমকা থেমে গেল। এ এস ঘরের বাইরে এসেছেন। সবাই এখন ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে যাতায়াতের পথের ওপর বসে থাকতে দেখে এ এস যে চিন্তিত তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। ভদ্রলোক দু' পা এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা তোমরা ঠিক করছ না। তোমাদের এ জন্যে শাস্তি পেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কেউ একজন সিটি দিয়ে উঠল, শেয়ালের ডাক ডেকে উঠল কেউ কেউ।

এ এস চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট, সরে যাও এখান থেকে! রাত দশটা বাজে, যে যার নিজের ঘরে ফিরে যাও ইমিডিয়েটলি।'

'রাসলীলা শেষ হয়ে গেল নাকি?' একটা গলা ভেসে এল।

'রাসলীলা? কে বলল কথাটা? ছাত্রী অধ্যাপকের কাছে পড়তে এলে তোমরা এইরকম ব্যবহার করবে, ছি ছি!'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলা ছি-ছি-ছি-ছির ধুয়ো তুলল।

www.MurchOna.com

এ এস এবার অনিমেষের দিকে তাকালেন, 'তুমি তো এদের নেতা, এদের এখান থেকে সরে যেতে বলো।'

অনিমেষ বসে বসেই মাথা নাড়ল, 'তা হয় না, স্যার। প্রথমে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

এবার মেয়েটিকে দেখা গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে যেভাবে হেঁটে আসছে তাতেই বোঝা যায় যে বেচারার মনের জোর কমে এসেছে। সোজাসুজি অনিমেষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে এবার যেতে দিন।'

গলার স্বরে এমন একটা কাকুতি ছিল যে অনিমেষ মেয়েটির মুখের দিকে না তাকিয়ে পারল না। মেয়েরা কী দ্রুত নিজেদের মুখ পালটে ফেলতে পারে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আপনি ওঁকে ক্ষমা চাইতে বলুন।'

এ এস বললেন, 'আঃ, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলছ কেন ?'

মেয়েটি হাত নেড়ে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন, আমার কী দোষ ? আমি তো স্যারের কাছে পড়তে এসেছিলাম। হোস্টেলের নিয়মকানুন আমার জানার কথা নয়। যদি উনি অন্যায় করে থাকেন তবে তার দায় আমাকে বইতে হবে ?'

'নেকু রে নেকু—খাও ঢুকু ঢুকু।' ছড়া কেটে বলল কেউ।

এ এস বললেন, 'চলে এসো, এই স্কাউন্ড্রেলগুলো — ।'

মেয়েটি ফুঁসে উঠল, 'আঃ, চুপ করুন। অনেক বীরত্ব দেখিয়েছেন। ওরা ইচ্ছে করলে আপনাকে ছুড়ে নীচে ফেলে দিতে পারে তা জানেন ? শুনুন, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন, একটা মেয়ের পক্ষে এ ভাবে আটকে থাকা সম্ভব ? আমি বাড়িতে কী কৈফিয়ত দেব ?' মেয়েটি আবার অনিমেষের শরণাপন্ন হল।

'নেকু রে নেকু—খাও ঢুকু ঢুকু!' ছড়া উঠল।

অনিমেষ এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'একটু আগের আপনি আর এই আপনি কি এক ? যদি তা না হন তা হলে ওঁকে বলুন ক্ষমা চাইতে।'

'বেশ, আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি!' মেয়েটি বুকে হাত দিল।

'ওরে কে কার হচ্ছে দেখ।' টিপ্পনী কাটল কেউ।

'কিন্তু আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে!' মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেলল।

'বাঃ, একটু আগে তো দেখলাম বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন। পড়তে এসে কেউ বুঝি ঘুমোয় ?' গোবিন্দ কথা বলল।

এমন সময় নীচ থেকে কেউ চিৎকার করে জানাল, 'সুপার এসেছে।'

কথাটা শুনে অনিমেষ ছেলেদের দিকে ঘুরে বলল, 'তোমরা কেউ এখান থেকে নড়বে না। আমি ওঁকে ডাকছি।'

ভিড় বাঁচিয়ে রেলিং-এর ধারে গিয়ে অনিমেষ নীচে তাকাল। বাস্কেট বলের মাঠের মাঝখানে সুপার দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো মানুষটিকে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে ওপর থেকে। অনিমেষ চিৎকার করল, 'স্যার, আপনি একটু ওপরে আসুন।'

ভদ্রলোক ওপরে আসবার সময় যেটুকু সময় পেয়েছিলেন তাতেই জেনে গিয়েছিলেন কী ঘটনা ঘটেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দাঁড়াতেই অনিমেষ তাঁর সামনে দাঁড়াল, 'স্যার, হোস্টেলের আইন ভেঙেছেন বলে আমরা এ এস-কে বলতে গিয়েছিলাম, তাতে উনি খামকা অপমান করেন। তাই ছেলেরা ওঁকে ঘেরাও করেছে যতক্ষণ না উনি ক্ষমা চান!'

'কী আইন ?' ভদ্রলোকের গলা খুবই সরু।

'মেয়েদের নিয়ে ঘরে যাওয়াটা গুরুতর অপরাধ।' অনিমেষ জানাল।

'ও সব আইন আমাকেও মানতে হবে ?' এ এস-এর গলা ভেসে এল।

সুপার বললেন, 'এরকম ঘটনা এই হোস্টেলে প্রথম হল। যা হোক, কী চাইছ তোমরা ?'

অনিমেষ বলল, 'ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সুপার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতেই তোমরা খুশি হবে ?'

'আর এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এখানে অনেক ছেলে আছে যারা এর সুযোগ নিতে চাইবে।'

'আ-চ্ছা! আপনি অ্যাপলজি চেয়ে ব্যাপারটা শেষ করুন।' সুপার ছেলেদের মাথা ডিঙিয়ে তাঁর অ্যাসিস্টেন্টের উদ্দেশে বললেন।

www.MurchOna.com

'স্ট্রেঞ্জ! আপনি এ কথা বলছেন?' সুপারের দিকে বিস্ময়ে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন এ এস।

এবার মেয়েটি বলে উঠল, 'ঠিকই তো! অন্যায় করলে দোষ স্বীকার করতে লজ্জা নেই কিছু।'

'ইউ স্টপ!' চেঁচিয়ে উঠলেন এ এস, 'আপনি কি এই ছেলেদের কাছে ক্ষমা চাইতে বলছেন আমাকে?'

'হ্যাঁ। একজন মেয়ে এখানে সারা রাত আটকে থাকলে সম্মান বাড়বে না।' সুপার কথাটা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। তাঁর কোয়ার্টারে যাওয়ার রাস্তা এ দিক দিয়ে নেই।

এবার সবাই এ এস-এর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভদ্রলোক দুটো হাত শূন্যে নাচালেন, তারপর বললেন, 'ওয়েল, যদি এটা অন্যায় হয় আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

সঙ্গে সঙ্গে একটু খুশির শব্দ বোমার মতো ফাটল। অনিমেষ বলল, 'তা হলে আইন সবার জন্য, মানছেন?'

ভদ্রলোক এবারে ঘাড় নেড়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। উৎফুল্ল ছেলেরা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটাকে দেখার জন্য।

মেয়েটি এবার অনিমেষকে বলল, 'একটু কষ্ট করবেন?'

'বলুন!'

'বুঝতেই পারছেন এখন আমি সবার চোখে কী রকম ছোট হয়ে গেছি। একা একা নীচে নামতে ভয় করছে। আপনি একটু এগিয়ে দেবেন?' সত্যি সত্যি ভয় পাবার মতো মুখ করল মেয়েটি।

অনিমেষের মাথায় চট করে একটা মতলব খেলে গেল। সে নিরীহ মুখ করে বলল, 'এতটা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না, তবু আপনি যখন বলছেন তখন আমি একজনকে সঙ্গে দিচ্ছি।'

ছেলেরা সবাই সরে গেলেও ছোটখাটো জটলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অনেকেই দূর থেকে মেয়েটিকে লক্ষ করে বেশ মজা পাচ্ছে। অনিমেষ সেই ছেলেটিকে খুঁজছিল যে মেয়েটিকে আপনি বলে সম্মান দিতে নিষেধ করেছে এবং বারোটা বাজানোর কথা বলেছিল। ছেলেটির সঙ্গে ওর তেমন আলাপ নেই কিন্তু মুখ চেনে। চট করে তাকে খুঁজে না পেয়ে অনিমেষ গোবিন্দকে মৃদু স্বরে ছেলেটিকে ডেকে আনতে বলে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

দ্রুত একটা হাসির আলতো ঢেউ উঠল মেয়েটির ঠোঁটে, বলল, 'কেন বলুন তো?'

'এত রাতে যেতে অসুবিধে হবে কিনা জানতে চাইছি।'

'তাই বলে আমি সারা রাত এখানে থাকতে পারি না।'

অনিমেষ মনে মনে বলল, এতক্ষণ তো ছিলেন! সামনাসামনি ঘাড় নাড়ল, 'তা নিশ্চয়ই নয়। বেশি দূর হলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম।'

'আপনি যাবেন?'

'না, আমি খুব ক্লান্ত!'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকাল। মেয়েটির রূপে যে ধারালো চমক আছে সেটা এত প্রখর যে কোনও স্নিগ্ধতা সেখানে ছায়া ফেলে না। এই তাকানোর ভঙ্গি তাই শুধু কটাক্ষই হয়ে রইল। হাসল মেয়েটি, 'এত সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন আপনি! না, আমি একই যেতে পারব।'

ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না অনিমেষ, 'অবশ্য আপনি যাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁরই উচিত ছিল আপনাকে পৌঁছে দেওয়া।'

'উচিত? ছেলেরা যখন দেখে বদনামের নোংরা গায়ে লাগবে না তখন তারা আকাশ ছুঁতে পারে, একটু সেরকম অবস্থায় পড়লে গুটিয়ে কেন্নো হয়ে যায়। আমি ঋণ শোধ করতে এসেছিলাম, অনেক হয়েছে।' কথাগুলো বলতে বলতে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় গোবিন্দ ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এল।

অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে বলল, 'শোনো ভাই, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। উনি তো তোমাদের ক্লাস-মেট, তুমি তাই ওঁকে একটু বাস-স্টপ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। রাত হয়েছে, ওঁর একা যাওয়া ঠিক নয়।'

এরকম প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না ছেলেটি, বলল, 'কিন্তু হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া অসম্ভব।'

অনিমেষ হাসল, 'আমি সুপারের পারমিশন নিয়ে নেব। স্পেশাল কেস হিসেবে যেতে পারো। তোমরা একসঙ্গে পড়ো, তাই বলছি।'

ছেলেটি খুব বিব্রত বোধ করছে দেখে অনিমেষের মজা লাগছিল। সে বলল, 'মেয়েদের সম্মান

www.MurchOna.com

রাখা আমাদের কর্তব্য। যান, আপনি ওর সঙ্গে চলে যান।'

'ধন্যবাদ।' মেয়েটি কথাটা বলেই দ্রুত নামতে শুরু করল। একান্ত অনিচ্ছায় ছেলেটি ওর সঙ্গ নিল।

ওরা চলে গেলে গোবিন্দ চাপা গলায় বলল, 'নির্ঘাত যেতে যেতে ভাব হয়ে যাবে।'

অনিমেষ বলল, 'তুমি একবার সুপারকে ওর কথা বলে এসো, ভাই। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, আমি ঘরে যাচ্ছি।'

নিজের ঘরের দরজায় তালা নেই। তার মানে ত্রিদিব ফিরে এসেছে। এতক্ষণে অনিমেষের খেয়াল হল যে ওপরের ভিড়ে ত্রিদিবকে সে দেখেনি। সবাই গিয়েছে আর ও ঘরে বসে রইল। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতে যেতেই ত্রিদিবের জড়ানো গলা কানে এল, 'নো লাইট, প্লিজ।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আজকেও খেয়েছ?'

ত্রিদিব প্রথমে কিছু বলল না। অনিমেষ নিজের খাটে গিয়ে বসলে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বিপ্লব হয়ে গেল?'

'বিপ্লব?' অনিমেষ বিস্মিত।

'কাজকর্মগুলো নাকি বাড়ি থেকেই শুরু করতে হয়। তুমি তোমার বিপ্লব হোস্টেল থেকেই আরম্ভ করলে। ব্রাভো ব্রাদার। যখন ফিরলাম তখন শুনছিলাম তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ। এই প্রথম নেতা হয়ে গেলে, গুড! সামনে খোলা ময়দান, এগিয়ে যাও, ফরোয়ার্ড মার্চ। সম্ভাবনার ঢেউ আছে তোমাদের মধ্যে, তোমার হবে।' নাটুকে গলায় বলল ত্রিদিব।

'কী যা-তা বকছ?' অনিমেষ বিরক্ত হল।

'যা-তা নয়, বন্ধু। এ ঘটনা কাল অন্য ছেলেরা জানবে। অটোমেটিক্যালি তুমি হিরো হয়ে যাবে। নেক্সট স্টেপ ইউনিভার্সিটির ইলেকশনে জেতা, তারপর ইউনিয়নের সেক্রেটারি, তারপর এম এল এ মন্ত্রী। স্বর্গের সিঁড়ি — উঠে যাও।'

'তুমি মাতাল হয়ে গেছ।' অনিমেষ সহজ করার চেষ্টা করল।

'একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি যা করলে তার চেয়ে মাতাল হওয়া ঢের ভাল।'

## তেরো

ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখেই বিমানের সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল।

বিমান বলল, 'তোমার পাত্তা নেই কেন? এটা খুব অন্যায়।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় খুঁজছিলেন?'

'খুঁজছিলাম মানে? তিনদিন তোমার ক্লাশে ছেলে পাঠিয়েছি, তারা এসে বলল, তুমি নেই। গত কাল তোমার হোস্টেলে গিয়ে পাওয়া যায়নি। যাক, তুমি একটু অফিসে এসো, দরকার আছে।'

এখন ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে মনে কোনও অস্বস্তি হয় না। বাংলার ক্লাশ না করেও কোনও ছাত্র ইচ্ছে করলে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। কতগুলো ধরা-বাঁধা প্রশ্ন এবং তার বস্তাপচা উত্তর মানেই পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাশ পাওয়া—এই সত্য অনিমেষের জানা হয়ে গেছে। সেদিন কোথায় যেন পড়ছিল আগেকার দিনে ম্যাট্রিক পাশ করার চেয়ে এখন ডক্টরেট পাওয়া সহজ। লোকসাহিত্য বা জয়দেব সম্পর্কে প্রচারিত বইগুলো থেকে ছেঁকে নিয়ে সাজিয়ে দিলেই সেই সাবজেক্টের থিসিস হয়ে যায়। আর যাঁর অধীনে কাজ হচ্ছে তাঁর ভালবাসা পেলেই নামের আগে ডক্টরেট বসে যাবে। কিন্তু ইদানীং ব্যাপারটার অসারতা এত স্পষ্ট যে চট করে কেউ নিজেকে ডক্টরেট বলে পরিচয় দেয় না, বিশেষত বাংলায়। অনিমেষ বিমানকে বলল, 'চলুন।'

ছেলেমেয়েরা যে যার ক্লাশে কিংবা আড্ডায় যাচ্ছে। এখন ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের সংখ্যা বোধ হয় ছেলেদের থেকে বেশি। এত রকমের সাজগোজ একসঙ্গে দেখে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কিছুদিন হল অনিমেষ টের পাচ্ছে সে যখন ওদের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করে তখন তাকে নিয়ে ফিসফাস আলোচনা হয়। সম্ভবত সেই মিটিং-এর আবিষ্কারের কথা এখন জনে জনে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিমান বলল, 'কাল তোমাদের হোস্টেলে খুব কাণ্ড হয়েছে শুনলাম।'

অনিমেষ অবাক হয়ে বিমানের দিকে তাকাল, 'আপনি কী করে জানলেন, বিমানদা?'

'সব খবরই আমাদের কাছে আসে। তুমি লিড করেছিলে?'

www.MurchOna.com

'লিড মানে আমিই কথা বলেছিলাম এ এস-এর সঙ্গে। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি খুব একটা ভাল ছিল না। সুপার না এসে গেলে কী হত বলা যায় না। ওঁর কথায় ভদ্রলোক ক্ষমা চাইলেন।' অনিমেষ বলতে বলতে ভাবছিল যদি সুপার না আসতেন তা হলে একটা হাতাহাতি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না।

বিমান বলল, 'যা হোক, নেতৃত্বটা তোমার হাতে ছিল জেনে আমি খুশি।'

একটু ইতস্তত করে অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা খুবই বাজে। ওরকম একটা ইস্যু নিয়ে হইচই করতে আমার প্রথমে ইচ্ছে ছিল না, শেষে জড়িয়ে পড়লাম। ঘটনাটা এত সামান্য—।'

হাত তুলে অনিমেষকে থামিয়ে বিমান ঘুরে দাঁড়াল, 'সব সময়ে একটা কথা মনে রাখবে, লাইম লাইটে আসতে গেলে সুযোগের সদব্যবহার করতে হবে। যেটাকে সামান্য মনে হচ্ছে তাকে যদি একটু মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে পারো সেটাই অসামান্য হয়ে যেতে পারে। ধরো, কালকে যদি তোমরা ওই ইস্যুটার সঙ্গে আরও কতগুলো পয়েন্ট যোগ করতে তা হলে আজ তুমি সারা কলকাতায় পরিচিত হয়ে যেতে।'

'কী রকম ?' অনিমেষ কৌতুকবোধ করল।

'অত্যন্ত জঘন্য খাবার, হোস্টেল কর্তৃপক্ষের তোমাদের টাকায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ানো এবং হোস্টেলের কোয়ার্টার অসৎ কাজে ব্যবহার—স্রেফ এই তিনটে ইস্যু যোগ করে দিলে কলকাতার সব হোস্টেলের বোর্ডারদের সঙ্গে পেতে। কারণ, প্রথম অভিযোগটা এত কমন যে সবাই একমত হবেই। আজ যদি সারা দেশের হোস্টেলগুলোয় ওরকম ঘেরাও প্রতিবাদ শুরু হয়ে যেত তা হলে সবার সঙ্গে সংযোগরক্ষার জন্যে একটা কমিটির প্রয়োজন হত; এবং যেহেতু তুমি প্রথম ঢিল ছুড়েছ তাই তোমার উদ্যোগে কমিটি হলে তার নেতৃত্ব তোমারই থাকত। এত হোস্টেল এবং তার বোর্ডারের সংখ্যা বিরাট হওয়ায় খবরের কাগজে ব্যাপারটা গুরুত্ব পেত এবং তুমি নেতা হিসেবে নিজের জায়গা করে নিতে পারতে। না, না, অনিমেষ তুমি ভুল করেছ এ সুযোগ না নিয়ে। কাল যদি একবার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে তা হলে—।' আফশোসের ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়ল বিমান।

চোখের সামনে অবলীলায় বিমান যে ছবিগুলো এঁকে গেল তা অনিমেষ স্পষ্ট দেখতে পেল। এবং দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে ওর মুখে কথা ফুটল না। এই জটিলভাবে সহজ করে তোলার নামই বোধ হয় রাজনীতি। সে নিচু গলায় জবাব দিল, 'বিমানদা, ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ভাববার সময় পাইনি।'

'বুঝেছি এবং সেখানেই আমার আপত্তি। তোমাকে একটা সরল সত্য বুঝিয়ে দিই। ধরো রামকৃষ্ণ মিশনে যিনি দীক্ষা নিয়েছেন তিনি কতগুলো উপদেশ জানেন এবং সেভাবেই জীবনযাপন করেন। তাঁর জীবনে যদি কোনও সমস্যা আসে তা হলে তার সমাধান তিনি সেই উপদেশমতোই সমাধান করবেন। এই ভদ্রলোক থাকেন কলকাতায়। এবার আর একজনের কথা ভাবো যিনি থাকেন কানপুরে। দেখা যাবে তিনি যদি দীক্ষিত এবং একনিষ্ঠ হন তা হলে তাঁর কার্যকলাপ কলকাতার ভদ্রলোকের প্রায় কার্বনকপি হবে। কেন হবে বলো তো ? বিমান প্রশ্নটা করে উত্তরের জন্য ইউনিয়ন অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এক হবে কারণ ওঁদের আদর্শ এক।' অনিমেষ সহজ গলায় বলল।

'আমি হলে অবশ্য বলতাম, এক তো নাও হতে পারে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও বোধ দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধ আত্মসমর্পণের ওপর, তাই তার ভিত নড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়—সব সময় এক হবেই কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ধর্ম তার শেকড় গাড়ে। কিন্তু যে মানুষ মার্কসবাদে বিশ্বাস করে সেটা পরীক্ষায় সত্য জেনেই করে। বাতাস-জলের মতো মার্কসবাদ মানুষের প্রয়োজন। এখন তার নানারকম ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ হচ্ছে কিন্তু মূল সত্য তো অবিকৃত। তুমি যদি তোমার বোধ ও বুদ্ধি মার্কসবাদে শুদ্ধ করতে তা হলে গত কাল কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হত না। তোমার কর্মপদ্ধতি এবং তার ফলাফল দেখেই তুমি বুঝতে পারতে আমার সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। বিমান হাসল, 'হতাশ হয়ো না কমরেড, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তুমি যা করেছ তা অনেক, কিন্তু এ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষিত হলে বেশি লাভবান হবে।'

এই সাতসকালেই ইউনিয়ন অফিস জমজমাট। ইলেকশন আসছে। কাজকর্ম প্রচুর। অনিমেষ দেখল সুদীপদাকে ঘিরে বেশ বড় একটা দল কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। সুদীপদার মুখে আধপোড়া এবং বোধ হয় নেবা চুরুট। কয়েক সেকেন্ডেই অনিমেষ বুঝতে পারল বিভিন্ন ক্লাশের ক্যান্ডিডেট সিলেকশন চলছে যারা ছাত্র ফেডারেশনের ব্যানারে দাঁড়াবে।

www.MurchOna.com

সুদীপ ওকে দেখে চিৎকার করে বলল, 'এই যে এসে গেছে! তা তোমার মতলবটা কী বলো তো ?'

সবাই ওর দিকে ঘুরে দেখছে, অনিমেষ বিব্রত বোধ করল। প্রশ্নটার মানে সে ধরতে পারছে না।

সুদীপ বলল, 'একদম বোবা হয়ে গেলে যে! এদিকে শুনছি বেশ নেতা হয়ে গেছ, চারধারে নাম হয়েছে, আর আমাদের এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

অনিমেষের মুখে রক্ত জমল, 'কী যা-তা বলছেন!'

সুদীপদা বলল,'গত কাল তোমাদের এ এস-কে খুব টাইট দিয়েছ খবর পেলাম। ভাল করেছ। ব্যাটা এককালে কমিউনিস্টদের গালাগাল দিত।'

কথাটা প্রথম শুনল অনিমেষ। এ এস সম্পর্কে এরা যে খবর রাখে ওরা হোস্টেলে থেকেও তা জানে না। ওর হঠাৎ মনে হল যারা রাজনীতি করে তাদের অনেক গোপন কান এবং চোখ আছে, তাই কোনও কিছুই তাদের অজানা থাকে না। মুশকিল হল সে নিজে দুটোর বেশি প্রকৃতির কাছ থেকে পায়নি। অনিমেষ দেখল ঘরে ঢুকেই বিমান নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সর্বত্র কর্মব্যস্ততা, তাই এ ভাবে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছিল। অথচ নিজে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দুজন পোস্টার লিখছে। অনিমেষ শুনল, যে সচরাচর লিখে থাকে সে আসেনি বলে ওরা হিমসিম খাচ্ছে। সুদীপ আবার লিস্ট নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত এখন। অনিমেষ ছেলে দুটোর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একটু সাহায্য করতে পারি ?'

একটা ছেলে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার অভ্যেস আছে ?'

অনিমেষ বলল, 'না, অভ্যেস নেই। তবে বাংলা অক্ষর তো, চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ছেলেটা বলল, 'খুব সোজা নয়। বড় হরফ হতে হবে, সেই সঙ্গে গোটা গোটা এবং তাতে এমন স্পিড থাকবে যে সংগ্রামী মনে হবে। নিন দেখুন, পারেন কিনা!'

ছেলেটা একটা কাগজ ওর হাতে ধরিয়ে দিল, তাতে তিনটে লাইন লেখা। 'আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে", 'বাম ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ', 'নির্বাচন অধিকার আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার।'

অনিমেষ দেখল প্রথমটা লেখা হয়েছে, সে তার পরের লাইনটা শুরু করল। লিখতে লিখতে ওর খেয়াল হল সেই ছেলেবেলায় কংগ্রেসের নৌকোতে রিলিফের কাজে যাওয়ার পর এই প্রথম সে কোনও রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসীদের সহযোগী হয়েছে। ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে, অনিমেষ খুব সাবধানে আঁকার চেষ্টা করছিল। একে লেখা না বলে আঁকা বলাই ভাল। ছেলেটা ঠিকই বলেছে লেখাগুলোর মধ্যে একটা সংগ্রামী চরিত্র ফুটে ওঠা দরকার এবং সেটা আঁকার কায়দার ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু লিখতে লিখতে বুকের মধ্যে একটা তপ্ত ভাব অনুভব করছিল অনিমেষ। এই শব্দগুলোর মধ্যে এমন একটা ফোর্স আসে যা বন্দেমাতরমের মধ্যে নেই।

লেখা যখন শেষ তখন সুদীপের গলা শুনতে পেল অনিমেষ, 'শাবাশ, হাতেখড়ি মন্দ হয়নি!' ব্যাপারটা ওকে এতখানি আকৃষ্ট করে রেখেছিল যে অন্য দিকে খেয়াল ছিল না। এখন দেখল ওর পেছনে ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে, সবাই পোস্টারগুলো দেখছে। সচেতন হয়ে সে নিজের লেখা দেখল। না, খারাপ হয়নি, বরং এগুলো সে নিজে লিখেছে তা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ছে। কোনও দিন সে এ-কাজ করেনি, কিন্তু এত ভাল কী করে হল! সে সুদীপকে বলল, 'প্রথম চেষ্টা তো — ।'

একটা চুরুট এগিয়ে দিল সুদীপ, 'নাও, এটা ধরাও।'

বিমান চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, অন্য কেউ চাইলে তো চুরুট ছাড়া হয় না, আজ হঠাৎ এত উদারতা, লক্ষণ ভাল নয়।'

সুদীপ ঠাট্টার গলায় জবাব দিল, 'এই চুরুট সবার সহ্য হবে না।'

বিমান বলল, 'তা হলে বলছ অনিমেষের সহ্য হবে!'

সুদীপ বলল, 'মনে হচ্ছে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমি খাই না, সুদীপদা।'

বিমান কপট ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'না বলতে নেই, অনিমেষ। ওটা খেলে দেখবে বেশ বুদ্ধিজীবী বলে মনে হবে নিজেকে। তা ছাড়া তুমি ভাগ্যবান, তাই ওটা পাচ্ছ। নিয়ে নাও চটপট।'

অগত্যা অনিমেষ চুরুটটা নিল। ছোট্ট কিন্তু বেশ শক্ত চেহারার চুরুট। এর আগে সে কাউকে কাউকে দেখেছে চুরুট খাবার আগে দেশলাই কাঠি দিয়ে মুখ ফুটো করে নিতে। কিন্তু এটায় সেরকম প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না। সুদীপ আগুন জ্বেলে সামনে ধরতে সে ওটা ধরাল। বিকট গন্ধ

সহ ধোঁয়াটা নাকে যেতে অনিমেষের মনে হল দমবন্ধ হয়ে যাবে। ততক্ষণে সুদীপ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকল, 'অনিমেষ, এদিকে এসো।'

সমস্ত শরীর গোলাচ্ছে, কোনওরকমে কাশি চেপে অনিমেষ দেখল তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে কোনওরকমে সুদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সুদীপ কতগুলো কাগজ থেকে একটা বেছে নিয়ে ওকে বলল, 'পুরো নাম সই করো।'

অনিমেষ যতটা সম্ভব দ্রুত কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল এটা একটা নমিনেশন ফর্ম। ফিফথ ইয়ার বাংলার ক্যান্ডিডেট হয়ে তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে। একটুও ইতস্তত না করে অনিমেষ সই করল সুদীপের কলমে। সুন্দর গোটা অক্ষরে লেখা অনিমেষ মিত্র, শব্দ দুটো ঝকঝক করছিল কাগজে।

সুদীপ বলল, 'তোমার ক্লাশের দুজন ছেলে চাই যারা প্রপোজ এবং সেকেন্ড করবে। তোমার কেউ পছন্দের আছে?'

অনিমেষ চট করে শুধু পরমহংস ছাড়া কাউকে মনে করতে পারল না।

ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আমি করতে পারি।'

সুদীপ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি তো আছ। আর একজনকে ডেকে সই করিয়ে নিয়ো।'

অনিমেষ ছেলেটিকে দেখল, বাংলার ক্লাশে ওকে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। হয়তো লক্ষ করেনি।

এবার বিমান ওকে ডাকল। অনিমেষ ওর সামনে গিয়ে বসতেই বিমান বলল, 'অন্য ক্যান্ডিডেটদের সঙ্গে মিটিং হয়ে গেছে, তুমি বাকি ছিলে। এই ইলেকশনে আমাদের প্রতিপক্ষ দুজন। ছাত্র পরিষদ আর এস. এফ. রাইট। শেষ দলটা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই, কারণ ওদের শক্তি এত কম যে কিছু করে উঠতে পারবে না। ছাত্র পরিষদ প্রচুর টাকা ঢালছে। ওদের পোস্টারগুলো দেখেই তা বুঝতে পারবে। এটা তো সবাই জানে ছাত্র পরিষদ হল কংগ্রেসের সংগঠন। এখন দেশের যা অবস্থা তাতে কংগ্রেসি সরকার খুব সুখে নেই। মানুষ ক্রমশ ওদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে। ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রচার করব তখন ওই সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগাব। ওরা হয়তো আমাদের চিনের দালাল বলে এক হাত নেবে কিন্তু মানুষ দূরের জিনিসের চেয়ে কাছের সমস্যাই বেশি প্রয়োজনীয় মনে করে। বুঝতে পারছ?'

অনিমেষ হঠাৎ বলল, 'চিনের দালাল মানে ছাত্র ফেডারেশন চিনকে সমর্থন করে?'

বিমান হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল, 'সেটা আলাদা প্রশ্ন। ভারত-চিন সীমান্ত-যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টি যে বক্তব্য রেখেছে সেটা পড়ে দেখবে। কংগ্রেসিরা সেই বক্তব্যটার অপব্যাখ্যা করছে। কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে তুমি চিনের দালাল কি না তা হলে জবাব দেবে কারও ভালকে সমর্থন করা মানে দালালি নয়। মাও সে তুং যেভাবে কৃষক-শ্রমিককে সংগঠিত করে লংমার্চ করেছিলেন সেটা বিশ্বে মানবতার জ্বলন্ত মশাল বলে চিহ্নিত থাকবে। আমরা যদি এই মশালের আগুনে নিজেদের শুদ্ধ করি তা হলে কি দালালি হবে? এই হবে আমাদের বক্তব্য।'

অনিমেষ বলল, 'তা হলে ওটাকে সীমান্ত-সংঘর্ষ বলব?'

'হ্যাঁ, কারণ ঘটনাটা কী তা আমরা জানি না। যে দেশ কমিউনিজমের আদর্শে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ মাথা তুলেছে, যে দেশের মহান নেতা মাও সে তুং, সে দেশ আক্রমণকারী এটা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না। আচ্ছা, এবার তোমার কাজ হবে ক্লাশের সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এক আধটা কাজ যা চোখে পড়ার মতো যদি করতে পারো তা হলে সবার নজরে পড়বে। অবশ্য ওই মিটিং-এর পর তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ম্যান টু ম্যান ক্যাম্পেনের মূল্য আছে, সেটা শুরু করে দেবে। কখনও কোনও অবস্থায় মাথা গরম করবে না, সব সময় হাসিমুখ করে থাকবে। আর যদি কোনও প্রবলেম সামলাতে না পারো তা হলে অফিসে যোগাযোগ করবে। অল রাইট?' বিমান বুঝিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই ক্যাম্পেন শুরু হয়ে গেল। সুদীপের সঙ্গে কয়েকটা ক্লাশ ঘুরল অনিমেষ! সে-সব ক্লাশের ক্যান্ডিডেটদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুদীপই বক্তৃতা দিল। খুব ভাল বলে সুদীপ, বলার ধরনে এমন একটা তেজস্বিতা আছে যে চুপ করে শুনতে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে অনিমেষের ক্লাশের সামনে আসতে ওরা দেখল টি. এন. জি. ক্লাশ নিতে আসছেন। সুদীপ দ্রুত ভদ্রলোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে।'

www.MurchOna.com

টি. এন. জি. চশমাটা এক হাতে ঠিক করে নিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

'ছেলেমেয়েদের দু-তিনটে কথা বলব। ইলেক্‌শনের ব্যাপারে।'

'পাঁচ মিনিটেই যেন হয়ে যায়।' টিন. এন. জি. আবার প্রফেসার্স রুমে ফিরে গেলেন।

সুদীপ অনিমেষকে নিয়ে ক্লাশে ঢুকল। ওদের দলের ছেলেরা দরজায় দাঁড়িয়ে। টি. এন. জি-র ক্লাশ বলেই ঘরটা ভরতি। ছেলেমেয়েরা সবাই উৎসুক হয়ে ওদের দেখছে। সুদীপ ডায়াসে উঠে বলল, 'বন্ধুগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন আসন্ন। আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা ছাত্র ফেডারেশন (লেফট) আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। এই নির্বাচনে আমাদের তরফ থেকে এই ক্লাশের প্রার্থী শ্রীঅনিমেষ মিত্র। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে অনিমেষ এই কংগ্রেসি সরকারের উগ্র দমননীতির শিকার হয়েছেন। এই সরকারের পোষা পুলিশ সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাঁকে এমনভাবে গুলিবিদ্ধ করে যে চিরকালের মতো তিনি শরীরে বুলেটের চিহ্ন নিয়ে বেঁচে থাকবেন। অনিমেষকে ভোট দেওয়া মানে সেই নৃশংসতার প্রতিবাদ জানানো। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, তবু আমি অনিমেষকে অনুরোধ করছি আপনাদের কিছু বলতে। অনিমেষ—।'

মাথা নেড়ে অনিমেষকে ডায়াসে আসতে বলে সুদীপ গম্ভীরমুখে দরজার কাছে সঙ্গীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীপের বক্তৃতার সময় অনিমেষ ছেলেমেয়েদের প্রতিক্রিয়া দেখছিল। সবাই বেশ উৎসুক হয়ে তাকে লক্ষ করেছে। অনিমেষ, অস্বস্তি থাকলেও, বেশ স্মার্ট হবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সুদীপ এ ভাবে তাকে ডাকবে চিন্তা করেনি, কারণ অন্যান্য ক্লাশে ক্যান্ডিডেটদের কিছু বলতে বলা হয়নি। সময় কম এবং সবাই ওকে উৎসুক হয়ে দেখছে বুঝতে পেরে অনিমেষের পেটের ভেতর চিনচিন ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। ও বুঝতে পারছিল এখন একটা ভুল পদক্ষেপ মানে চিরকালের মতো হাস্যকর হওয়া। পায়ের স্টেপ ঠিক রেখে ও এমন ভান করে ডায়াসে উঠে এল যে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। যে-কোনও মুহূর্তে শরীরে ঘাম হতে পারে বা কথা জড়িয়ে যেতে পারে জেনেও ও কথা শুরু করল, 'বন্ধুগণ, আমি অনিমেষ মিত্র, আপনাদের সতীর্থ, আগামী নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন চাইছি। কবে, কখন, কী কারণে পুলিশ আমাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল কিংবা আমার একটি অমূল্য বছর কীভাবে হাসপাতালে শুয়ে নষ্ট হয়েছে সে সব বলে আপনাদের মন নরম করতে আমি চাই না। আমি এখন সুস্থ, যদিও বুলেটের দাগ উল্কি হয়ে আছে, থাকবে। আমি মফস্বলের ছেলে, জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলাম। সেখানে দেখেছি ক্ষমতার কী কদর্য প্রয়োগ, দেখেছি স্বার্থের কী নোংরা ব্যবহার! একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন নির্দিষ্ট প্ল্যান লাগে, একটা দেশকে গঠন করতেও তেমনি পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা হল একটা নির্দিষ্ট মতবাদ যা দরিদ্রের মুখে অন্ন দেবে এবং একটা শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলবে। ছাত্র ফেডারেশন লেফট মনে করে সেটা কমিউনিজমের পথেই সম্ভব। এর ফল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখেছি। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমরা ছাত্র, রাজনীতির এই জটিলতায় আমরা কেন যাব ? বাড়িতে যদি আগুন লাগে তা হলে ছোটরাও বালতি হাতে ছুটে যায়, তাই না ? আমরা প্রতিবাদ করতে পারি অরাজকতার বিরুদ্ধে। এইসব ছোট প্রতিবাদ এক হয়ে যে শক্তি ধরবে তা কিন্তু আমাদেরই উপকারে আসবে। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে সমর্থন চাইছি যাতে প্রতিবাদ করতে পারি। ধন্যবাদ।'

কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না, এখন অনিমেষ আবিষ্কার করল তার সেই নার্ভাসনেসটা একদম নেই। খুব সহজে সে বলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপরই তুমুল হাততালিতে ঘর ভরে গেল যেন। মেয়েরাই বেশি শব্দ করছে।

অনিমেষ শান্ত মুখে দরজার কাছে আসতেই সুদীপ বলল, 'আর একটা চুরুট খাবে ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না, না, বাপস!'

'মানে ?' চোখ বড় করল সুদীপ।

'ওটা এই বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। তা ছাড়া আমি তো মফস্বলের ছেলে, বুদ্ধিজীবী হতে পারব না।' হাত জোড় করল অনিমেষ।

সুদীপের মুখে কিছুক্ষণ কথা ফুটল না। তারপর সঙ্গীদের বলল, 'শ্রীমান অনিমেষ মিত্রের দীক্ষা হয়ে গেছে। এখন উনি সাবালক।'

বিকেলে হোস্টেলে ফেরার সময় অনিমেষ পরমহংসের সঙ্গে ফিরছিল। পরমহংস বলছিল, 'তুমি কালকে শোভনাদির ছেলেকে পড়াতে রাজি না হয়ে ভাল করেছ, এতক্ষণে মনে হল।'

অনিমেষ অবাক হল, 'কেন ?'

www.MurchOna.com

'এ সব টিউশনি-ফিউশনিতে কি তোমাকে মানায় ? তুমি হলে বর্ণচোরা আম। ওপরে লাজুক, ভেতরে আগুন। শালা কী বক্তৃতা দিলে আজ! একবার ভাবলাম মুখস্থ করেছ নাকি, তারপর দেখলাম, নাঃ। সব ক'টা মেয়ে বোল্ড আউট। মিডল স্টাম্প ছিটকে গেছে। তা এই তুমি ঘাড়গুঁজে ছাত্র পড়াচ্ছ—ভাবাই যায় না।'

হো হো করে হাসল অনিমেষ, 'যে লোকটা বক্সিং লড়ে সে বউকে আদর করে না ? কী আশ্চর্য! এ সব বলে এড়িয়ে গেলে হবে না, তুমি আমার জন্য টিউশনি দেখো।'

'শালা হাতের মোয়া, চাইলেই পাওয়া যায়, না ? তারপর ফ্যাচাং করে রেখেছ। ঘটি হলে হবে না, চেনাশুনা বেরুলে চলবে না—দেখি, যদি পাই। তা তোমার চিন্তা কী! ইউনিয়ন থেকে গ্যাম্বলিং হবে না ?'

'গ্যাম্বলিং ?' অনিমেষ হতভম্ব।

'ফালতু টাকা পাওয়া মানে গ্যাম্বলিং।'

'সেটা কংগ্রেসি ইউনিয়নে হত।'

'গুড। এখন থেকে ভাল স্পিন বোলিং রপ্ত করেছ। তোমার হবে। দেখো অনিমেষ, সব শালাই গাছে ওঠে কিছু হাতিয়ে নিতে। যারা আদর্শ-ফাদর্শ কপচায় তারাই রান আউট হয়ে যায়।'

এই কথাগুলো হোস্টেলে ফিরে অনিমেষের মনে হচ্ছিল। এই দেশে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। সাধারণ মানুষের মানসিকতা এইভাবেই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিদিব নেই। ঘরে একা শুয়ে শুয়ে অনিমেষ আকাশ দেখছিল। অনেক দিন জলপাইগুড়ির চিঠি পাচ্ছে না। দাদু প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিতেন, আজকাল তাও যেন অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। ছোটমা তো দেয়ই না, টাকা পাঠানোর পর বাবা খবরাখবর জানতে চান। আসলে সে নিজে নিয়মিত লিখতে পারে না বলেই ওঁদের এই ঠাণ্ডা ভাব সেটা সে জানে। কিন্তু চিঠি লিখতে গেলে এত আলসেমি লাগে!

বাবা যদি আজকের খবরটা জানতেন তা হলে নিশ্চয়ই রেগে যেতেন। ওঁর ভাষায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে নিজের বারোটা বাজানো। অনিমেষ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে অধ্যাপনা করুক এই তাঁর ইচ্ছা। ইউনিয়ন করছে জানলে টাকা বন্ধ করেও দিতে পারেন। বরং দাদু অতটা বিপক্ষে যাবেন না। অনিমেষ যখন কিছু করছে সেটা মন্দ নয় জেনেই করছে এই তাঁর বিশ্বাস।

দরজায় শব্দ হতে অনিমেষ বলল, 'খোলা আছে।'

দারোয়ান মুখ বাড়াল, 'আপনাকে বড়া সাব বোলাচ্ছে।'

বড়া সাব মানে সুপারিনটেনডেন্ট। সচরাচর টাকা বাকি না পড়লে তিনি খোঁজ নেন না। অনিমেষ দরজা বন্ধ করে বাস্কেটবল লন পেরিয়ে এদিকে চলে এল। সুপার ওঁর টেবিলে বসে ছিলেন। অনিমেষ যেতেই তিনি সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

অনিমেষ বলল, 'ডেকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। আজ কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা মিটিং ডেকেছিলেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আর আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের একসঙ্গে হোস্টেলে রাখা চলবে না। কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য একদম আলাদা হোস্টেল হবে এগুলো। ব্যাপারটা সামনের মাসের এক তারিখ থেকেই কার্যকরী হবে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি কি আমায় হোস্টেল ছেড়ে দিতে বলছেন ?'

সুপার বললেন, 'ব্যাপারটা সেইরকম।'

কলকাতার কলেজে ভরতি হবার পর থেকে এই হোস্টেলে বছরগুলো কেটেছে। এখন কোথায় যাবে সে ? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কারণটা কি শুধু এটাই, না গত রাত্রের ঘটনাটা এর পেছনে রয়েছে ?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'আপনি বলবেন না।'

'অপ্রিয় কথা বলতে আমি চাই না।'

'আপনাদের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি। এবং সেটা করতে আপনি বাধ্য করছেন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে সুপার বলে উঠলেন, 'আমার কথা শোনো অনিমেষ, এ নিয়ে প্লিজ হইচই কোরো না। যদি স্ট্রাইক করো তাহলে কিছু ছেলের ক্ষতি হবে যারা এখনও স্কটিশ কলেজে

www.MurchOna.com

পড়ে। তোমার তো থাকা নিয়ে কথা। আমি সেন্ট জন হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে অনেক এম এ-র স্টুডেন্ট আছে। উনি তোমাকে একটা সিট দিতে রাজি হয়েছেন। আফটার অল, তোমার বাবা আমাকে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করেছেন তোমাকে দেখতে, তুমি আমার কথা রাখো।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। তারপর ধীরে পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সামনের লনে দুটো ছেলে বল নিয়ে পিটোপিটি করছে। খুব শান্ত পরিবেশ এখন। ওপরে বোধ হয় থম্বোটো মাউথঅর্গান বাজাচ্ছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্যে এত তাড়াতাড়ি আঘাত আসবে কল্পনা করতে পারেনি সে। সামান্য এই ব্যাপারে যদি তাকে হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে হয়, বড় ব্যাপারে না জানি কী হবে। একবার বিমানদার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। অনিমেষ দেখল ত্রিদিব ঢুকছে। ও কাছে গিয়ে বলল, 'একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'কী ?'

'আমাকে সুপার হোস্টেল ছেড়ে দিতে বললেন।'

'জানতাম।'

'জানতে মানে ?'

'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।' দু হাত নেড়ে আবৃত্তি করল ত্রিদিব। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওরা তোমার ক্ষতি করতে গিয়ে ভাল করে ফেলল। কথাটার মানে পরে বুঝবে।'

## চোদ্দো

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ফলাফল প্রায় এক তরফা হয়ে গেল। ছাত্র পরিষদ যে ক'টা সিট পেয়েছে তা এত সামান্য যে ওদের ক্যাম্পে এখন লোকজন নেই বললেই চলে। হঠাৎই যেন উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে গেছে, যেসব ছেলেরা ছাত্র পরিষদের হয়ে কাজকর্ম করেছিল তারা এখন এমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে যেন ও ব্যাপারের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। দল হেরে গেলেই যে এমন করে পিছিয়ে যেতে হয় সেটা অনিমেষ জানত না, এখন জানল। বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশন এখন তুঙ্গে। ডানেরা তো আমলই পায়নি। অনিমেষ ওর ক্লাশের শতকরা আশিটি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। বিমান বলেছিল, 'এটা তো জানা কথাই। বিধান রায়ের সিটের মতো তোমার জেতা নিশ্চিত ছিল।' বিধান রায় নাকি কখনওই হারেননি। চৌরঙ্গি এলাকায় তাঁর একবার হারো-হারো অবস্থা হয়েছিল কিন্তু শেষতক জিতে গেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত ভাললাগা পার্টির ওপরে গিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিত। অনিমেষ বোঝে ক্লাশের ছেলেরা যখন ওর সঙ্গে কথা বলে তখন বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলে। হয়তো ওর মিষ্টি লাজুক চেহারা এবং সেই বুলেটের চিহ্ন ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় ওর সম্পর্কে দুর্বলতা এনে দিয়েছে। আশ্চর্য! আজ যেটা চরম আঘাত মনে হচ্ছে কাল সেটা তুরুপের তাস হয়ে যেতে পারে—শিক্ষাটা জানা ছিল না, এখন জানল।

ইউনিয়নের কাজকর্মে অনিমেষ এখন সক্রিয় কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে ওর মনে কিছু অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। কোনও ইস্যু নিয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সেটা কী হবে তা আগেই ঠিক করা থাকে। নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার কোনও প্রয়োজন হয় না। অনিমেষ লক্ষ করেছিল এ ব্যাপারে কারও কোনও ক্ষোভ নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি ঠিক করে রেখেছেন, এই ইস্যুগুলো সামনে এলে সেই নীতির আলোয় পথ ঠিক করে নেওয়া হয়। এক রকম বিশ্বাসে সকলে তা মেনে চলে।

অফিস-বেয়ারার নির্বাচনের সময় যে ক'টা নাম কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছিল অনিমেষ তার মধ্যে ছিল। তার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তা দল স্বীকার করেছে। ফিফথ ইয়ারের ছাত্র হওয়ায় সে আরও দু বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে, তাই এখন থেকে যদি সে দায়িত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পায় তা হলে সামনের বছরে যখন সিনিয়াররা থাকবে না তখন তাদের জায়গা নিতে পারবে। সুদীপের প্রস্তাব ছিল, সহ-সম্পাদকের দুটো আসনের একটায় অনিমেষকে নেওয়া হোক। কিন্তু সে ব্যাপারে কতগুলো অসুবিধার মধ্যে যেটা অন্যতম সেটা হল কলেজ জীবনে অনিমেষ ছাত্র ফেডারেশনকে কোনও সাহায্য করেনি। সে সময় বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে যারা সত্যি খেটেছে এবং এই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছে তাদের দাবি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

www.MurchOna.com

এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে ঠিক সেসময় অনিমেষ একটা গোলমাল করে বসল। ভিয়েতনামে আমেরিকার নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্র সংসদ থেকে একটা কার্যক্রম নেওয়ার কথা উঠলে বিমান বলেছিল, 'সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের যে কার্যসূচি নেওয়া হয়েছে তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একদিন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের ক্লাশ বয়কট করতে বলা হবে, ধরো আগামী মঙ্গলবার।'

ব্যাপারটা যখন ঠিক হয়ে যাচ্ছে তখন অনিমেষ বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয় না?'

সুদীপ চমকে ওর দিকে তাকিয়েছিল আর বিমান খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'কেন, তোমার কি পার্টির নির্দেশ মানতে আপত্তি আছে?'

মাথা নেড়েছিল অনিমেষ, 'না, না, আমি সে-কথা বলছি না। আলোচনা করলে সবার বুঝতে অসুবিধা হবে না, তাই।'

'ভিয়েতনামে যে লড়াই চলছে সেটা তুমি স্বীকার করো তো?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলেই হল।'

তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে চলে গেল।

পরবর্তীকালে অফিস-বেয়ারারদের নাম ঘোষণা করার সময় অনিমেষকে সরিয়ে রাখা হল। অনিমেষের একটু সুবিধা ছিল যে সে কিছু আশা করেনি তাই তার কোনও ক্ষোভ হল না। তবে সুদীপ ওকে একদিন আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'অনাবশ্যক কৌতূহল না দেখালে তুমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে অনিমেষ। পার্টির বিশ্বাস অর্জনের জন্য কাজ করে যাও।'

পরমহংস একা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলার সময় অনিমেষের একটা খটকা লাগছিল। এরা কেউ কোনও বিষয়ে তেমন আগ্রহী নয়। বাংলায় এম এ পড়তে এসেছে একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। যারা একটু আশাবাদী তারা পরবর্তীকালে ডক্টরেট করে কোনও কলেজে লেকচারারের কাজ পাবে বলে ভাবছে। বাকিরা হয় স্কুলে নয় আর কী যে করবে জানে না। কিন্তু মজার কথা হল, তা নিয়ে কারও তেমন দুশ্চিন্তা নেই। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাদের এরকম নির্লিপ্ততা তারা তো ভিয়েতনাম অথবা কিউবার কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষ নিয়েই কোনও চিন্তা-ভাবনা করে না। অথচ ভিয়েতনাম নিয়ে যে আন্দোলনের কথা অনিমেষরা ভাবছে সেটা ছাত্রদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যন্ত সত্যি কথা, অস্বীকার করার মানে হয় না। কথাগুলো বিমানের সঙ্গে আলোচনা করতে এখন ভয় পায় সে। বিমানের আলোচনা শুনলে মনে হয় যেন তামাম ছাত্ররা ওদের সঙ্গে একমত হয়ে ভিয়েতনামের ঘটনার প্রতিবাদ জানাবে এবং এ ব্যাপারে কোনও ছাত্রের দ্বিধা নেই।

অনিমেষের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বিমানরা কি সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মেশে না? তাদের মনের খবর কি জানে না? নাকি, নিজেদের ধ্যানধারণা যাতে সবাই বাধ্য হয়ে মেনে নেয় সেই ব্যবস্থাই চায়!

অনিমেষ বোঝে যে, কতগুলো বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে না এগোলে কোনও কাজ করা যায় না। হয়তো সেটা ফর্মুলার চেহারা নিয়ে নেয় কিন্তু ছোটখাটো অসঙ্গতি বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মেনে নিতে হয়। মাও সে-তুঙ, চে-গুয়েভারা, লেনিন কিংবা হো চি মিন যা করেছেন সেগুলো কি সবক্ষেত্রে ত্রুটিহীন? কমিউনিজম তাই প্রচ্ছন্নে একটা আদর্শের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবকে মেনে নেয়—না মানলে কোনও কাজ হয় না। গড়াতে গড়াতে বল এক সময় হয়তো গর্তে গিয়ে পড়বে, প্রতি পায়ে আলোচনার নামে দ্বিধা প্রকাশ মানেই তার গতিহ্রাস।

প্রতিবাদ দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে একটা বিরাট জমায়েত ডাকা হল। বিমান সেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করলে যে দুটো নাগাদ ছাত্রদের একটা মিছিল বেরুবে। তার আগে অফিস-বেয়ারারদের এবং মেম্বারদের নিয়ে একটা গোপন বৈঠক হয়ে গেছে। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পুলিশ যদি বাধা দেয় তা হলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে প্রতিরোধ করা হবে। অর্থাৎ একটা গোলমাল সৃষ্টি করে এই প্রতিবাদকে লাইম-লাইটে আনতে হবে যাতে দেশের মানুষ জানতে পারে। গ্রেপ্তার এড়ানো হবে এইজন্যে চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে পুলিশভ্যানে উঠলে কোনও কাজের কাজ হবে না। বিশেষ করে সমস্ত কলেজ স্ট্রিট এলাকায় যখন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে।

অনিমেষ কিন্তু একটা প্রস্তুতির গন্ধ পাচ্ছিল। ব্যাপারটা সবাইকে জানানো হয়নি, কিন্তু সহজ ভঙ্গিতে যে পুলিশের মুখোমুখি বিমানরা হবে না এটাও ঠিক। হঠাৎ ওর মনে অভিমান এল, সেই

www.MurchOna.com

ইলেকশনের পর থেকে সে নিয়মিত দু' বেলা ইউনিয়নের কাজকর্ম করে যাচ্ছে কয়েকদিন পার্টি অফিসে গেছে সুদীপের সঙ্গে, কিন্তু তবু সে বিমানের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। একদিন বিমান বলেছিল কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ তো চার আনা দিয়ে কেনা যায় না, দীর্ঘদিন তাকে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসতে হয় যা তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবে, অভিমান হলেই এই কথাটা মনে পড়ে। কে জানে হয়তো তারও এখন সেই অবস্থা চলছে।

ক্লাশ বয়কটের ডাকটা কিন্তু খুব কার্যকরী হল না। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা কেমন গা-এলানো ভাব দেখাচ্ছে, যেন সবাই দর্শক হয়ে থাকতে চায়, কেউ মঞ্চে উঠতে চাইছে না। অনিমেষরা করিডোরে ঘুরে ঘুরে ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, একটা দিন আমরা ক্লাশ বয়কট করছি সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য কার্যকলাপের প্রতিবাদে, প্রতিবাদ না করলে আমরা কীসের মানুষ ? আপনারা সবাই নীচের লনে নেমে আসুন। লন থেকে আমরা মিছিল করে মার্কিন দূতাবাসে যাব এবং সেখানে আমাদের প্রতিবাদ জানাব।'

জোর করে কাউকে বের করে আনার নির্দেশ ছিল না তাই দেখা গেল বিভিন্ন কলেজ থেকে আসা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র একতৃতীয়াংশ ওই জমায়েতে এসেছে। অবশ্য তাতেই লন ভরে গেছে।

অনিমেষ যখন ছেলেমেয়েদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল তখন ওদের মুখগুলোকে কেমন মুখোশ বলে মনে হচ্ছিল। কোনও রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না সেখানে। নিজের ক্লাশের সামনে দিয়ে যখন সে নেমে আসছে তখন ঘটনাটা ঘটল।

সিঁড়ির মুখটায় কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনিমেষ ওদের দিকে একটুও লক্ষ না করে এদের নিস্পৃহতার কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। এমন সময় একটি মেয়েলি গলা কানে এল, 'শুনুন!'

অনিমেষ দেখল, মেয়েদের মধ্যে একজন তার সামনে এগিয়ে আসছে। বুকের ভেতর দ্রিমি দ্রিমি শুরু হয়ে গেল। সেই যে চোখ এতদিন ক্লাশের ছেলেদের মাথার ফাঁকে একটা সরলরেখায় তাকে ছুঁয়ে থাকত তা এখন সামনাসামনি। অনিমেষ আবিষ্কার করল ওরা গলা শুকিয়ে কাঠ এবং নিশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে।

'আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।' মেয়েটির গলার স্বর স্পষ্ট।

'বলুন।' অনিমেষ নিজেকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

'আপনারা কী চান ?'

'মানে ?'

'আমরা এখানে পড়াশুনা করতে এসেছি। এতদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছি সেটাকে জলে ভাসাবার রাইট আপনাদের কে দিল ?'

'এ সব কথা কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি না', অনিমেষ আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করল। ও কী বলতে চাইছে সেটা শোনা দরকার।

'আপনারা আজ ক্লাশ বয়কট করতে বলছেন, কাল ধর্মঘট করতে হবে। এই করেই বছরটা যাক। আপনারা যদি পরীক্ষায় পাশ না করেন তা হলে দল আপনাদের চিরদিন খাওয়াবে, কিন্তু আমরা কেন বলি হচ্ছি ?'

'আজ তো আমরা কাউকে জোর করছি না। যারা মনে করবে প্রতিবাদ করা উচিত তারাই আসবে—এটাই আমাদের আবেদন।' অনিমেষ শান্ত গলায় বলল।

'আশ্চর্য! আপনারা একটা সাইকোলজিকাল প্রেশার ক্রিয়েট করছেন না ?' মেয়েটি যখন কথা বলছিল তখন অন্যান্যরা যে তাকে সমর্থন করছে এটা স্পষ্ট।

'আপনি এম এ পড়ছেন। আপনার বোধবুদ্ধি সাধারণ মানুষের চেয়ে ওপরে। আপনি কি মনে করেন না ভিয়েতনামে আমেরিকা যে বর্বর অত্যাচার করছে বিবেকবান মানুষ হিসেবে আমাদের তার প্রতিবাদ করা উচিত।' অনিমেষ সরাসরি মেয়েটির চোখের দিকে তাকাল।

'পৃথিবীর সব জায়গায় যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আপনাদের কে দিল ? আর আজ নিজের নাক কেটে কি আপনি ভিয়েতনামে অত্যাচার বন্ধ করতে পারবেন? আপনি এখানে চেঁচালে আমেরিকা তা শুনে সুড়সুড় করে নতিস্বীকার করবে ?'

'বাঃ, আপনি বিশ্বজনমত কথাটা মূল্যহীন মনে করেন ?'

'সুন্দর! আপনাদের কতকগুলো সিলেকটেড শব্দ আছে, সেগুলোর বাইরে আপনারা কিছু বলতে চান না বা পারেন না। আজ ভারতবর্ষে লক্ষ মানুষ নানান ভাবে অত্যাচারিত, তাদের কথা না বলে,

www.MurchOna.com

তাদের উপকার না করে আপনারা ভিয়েতনাম নিয়ে মেতেছেন। ওখানে যারা লড়াই করছে তারা কিন্তু আপনাদের মুখ চেয়ে নেই। থাকলে আজকে লড়তে পারত না। আচ্ছা নমস্কার।' আচমকা কথা শেষ করে মেয়েটি সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাশরুমে ঢুকে গেল।

ঠিক এ রকম আক্রমণের জন্য অনিমেষ প্রস্তুত ছিল না। কথাগুলো শুনতে শুনতে সে মেয়েটাকে কীভাবে বোঝাবে তা ভেবে নিচ্ছিল। কিন্তু এ ভাবে চলে যাওয়াতে সেটা সম্ভব হল না। ওই মেয়ে এত ভাবে, অনিমেষের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তা হলে যে মুখগুলোকে তার মুখোশ বলে মনে হচ্ছিল সেগুলো সত্যি তা নয়? সেই বিখ্যাত কথা আইডেন্টিফিকেশন না হলে কোনও রেসপন্স পাওয়া যায় না—সেটা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? অর্থাৎ ভারতবাসীর কাছে সিংহলই যেখানে সুদূর সেখানে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের জন্য আন্দোলন করে জনমত গঠন করা সত্যের খাতিরে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাতে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে পাওয়ার চিন্তা বাতুলতা। যদি এ রকম কোনও ইস্যু হত—এই যে, প্রতি বছর এম এ পাশ করে ছেলেরা বেকার থাকবে জেনেও সরকার যে সিস্টেমটা চালু রেখেছে সেটা ভেঙে ফেলা দরকার, প্রতিটি ছেলের পূর্ণ শিক্ষার শেষে যোগ্য সংস্থানের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে—এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে যদি দাবি ওঠে তা হলে সবাই সাড়া দেবে? অনিমেষের মনে হল দেবে।

জমায়েতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ এইসব কথা ভাবছিল। কোনও মানুষকে প্রথম দেখায় বিচার করা যে নেহাতই ছেলেমানুষি তা আজ প্রমাণ হল। কোনওদিন কথা হয়নি, শুধু চোখে দেখে সে মেয়েটি সম্পর্কে যে কল্পনা তৈরি করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। মেয়েটি এত সিরিয়াস, এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে এবং কী নির্লিপ্ত হয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে দিয়েছে তা কি ওই চোখ দেখে আন্দাজ করা যায়?

অনিমেষ অনুভব করল আজ কথা বলার সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার বুকের মধ্যে যে কাঁপুনি এসেছিল এখন তার একটুও অবশিষ্ট নেই। এক ধরনের রোমান্টিক ধারণার বদলে সে মেয়েটি সম্পর্কে অন্যরকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

মিটিংয়ের শেষে শ্লোগান উঠল, 'ভিয়েতনাম যুগ যুগ জিয়ো। আমেরিকার কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।' সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেন গমগম করছে এখন। কথা ছিল বিমানের ভাষণের শেষে ওরা এক জায়গায় চলে আসবে। অনিমেষ গিয়ে দেখল বিমান নির্দেশ দিচ্ছে কী করতে হবে। মিছিল একটা দিক দিয়ে কলেজ স্ট্রিটে নামবে না। হেয়ার স্কুলের গেট দিয়ে একটা মিছিল এগোবে, অন্যটা কলেজ স্কোয়ারের দিক দিয়ে। পুলিশ রয়েছে হ্যারিসন রোড আর মেডিক্যাল কলেজের সামনে। এদিকটা যখন তারা বাধা পাবে তখন অন্য মিছিলটা ইডেন হোস্টেলের পাশ দিয়ে কলুটোলায় চলে যাবে। অনিমেষের ওপর নির্দেশ হল কলেজ স্ট্রিটের দিকে মিছিলের সঙ্গে যেতে।

এত চটপট সবাই ব্যাপারটা বুঝে নিল যে চমকে যেতে হয়। যেন কোনও শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মতো মিছিলটা দুটো মুখ হয়ে এগোতে লাগল। সুদীপ কলেজ স্ট্রিটের মিছিলটাকে আকারে ছোট করে দিল। কারণ ওদের কাজ শুধু পুলিশকে ব্যস্ত রাখা।

সুদীপ অনিমেষ এবং আরও কয়েকজন এই ছোট মিছিলটাকে লিড করে শ্লোগান দিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ; ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ; মার্কিন সরকার নিপাত যাক, নিপাত যাক; তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।' ঢেউ-এর মতো শ্লোগানগুলো চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত উত্তেজনা এখন। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল ওপরের বারান্দাগুলোয় ছেলেমেয়েরা ভিড় করে ঝুঁকে ওদের দেখছে।

সুদীপ সেটা লক্ষ করে বলল, 'একদিন ওরা আসবে অনিমেষ। রাতারাতি সবাই সৈনিক হবে এটা আশা কোরো না। ব্যবধান তো থাকবেই।'

মিছিলটা ট্রাম লাইন অবধি গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। অবশ্য শ্লোগান চলছে সামনে। উত্তেজনায় সবাই অস্থির। অনিমেষ ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কোনও পুলিশ দেখতে পেল না। সুদীপ মিছিলটাকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যন্ত যেতেই কফি হাউসের গলি দিয়ে ভ্যানগুলো এগিয়ে এল। সামনে একটা জিপ, তাতে কয়েকজন অফিসার বসে আছে।

পুলিশ দেখে আরও জোরদার হল শ্লোগান। অনিমেষ লাইনের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে শ্লোগান দিচ্ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।' সরবে তার সমর্থন বাজছিল গলায় গলায়। 'মার্কিন-দালাল কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক নিপাত যাক,' 'পুলিশ দিয়ে আন্দোলন ভাঙা যায় না, যাবে না', 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম লাল সেলাম,' 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।'

www.MurchOna.com

চারপাশে ঝটপট দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে সেকেন্ড হ্যান্ড বইওয়ালারা ছুটোছুটি করে নিরাপদে রাখছে তাদের বইপত্তর। বৃষ্টি আসার আগে যেমন আচমকা দমকা হাওয়ায় চারদিক আলোড়িত হয় এখন সেই অবস্থা।

সুদীপ বলল, 'মেইন মিছিলটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চলে গেছে। আমরা আবার কলেজ স্কোয়ারের সামনে ফিরে যাই চলো।'

মিছিলের মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল কলুটোলা মির্জাপুর স্ট্রিটের মুখটায় অজস্র পুলিশ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এখন অবস্থা হল এই যে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে। কারণ দু'দিকের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম-বাস চলছে না, একটা ট্রাম হিন্দু স্কুলের সামনে আটক হয়ে রয়েছে। কয়েকজন নাছোড়বান্দা যাত্রী ছাড়া সেটা প্রায় ফাঁকাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে যেন সবাই আরও মুখর হয়ে উঠল। অনিমেষ শ্লোগান দিল, 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।' গলায় গলায় সমর্থন ছড়াল 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

ঠিক সেই সময় জিপটা কাছাকাছি এগিয়ে এল। জিপের সামনে একজন অফিসার পোর্টেবল মাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এই এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে রাস্তা ছেড়ে চলে যান। একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ থাকলে মিছিল করা আইনত অপরাধ।'

'পুলিশ তোমার হুকুম আমরা মানি না, মানব না।'

'জুলুমবাজ পুলিশকে চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন।'

'ভিয়েতনাম লাল সেলাম—লাল সেলাম।'

উত্তেজনা এখন এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। সুদীপ চিৎকার করে বলল, 'কমরেড্স, কংগ্রেস সরকারের দালাল ওই পুলিশরা আমাদের ওপর জুলুমবাজি করতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রথমে এমন কিছু করব না যাতে ওরা সুযোগ পায়। মনে রাখবেন, রক্তে রাঙা ভিয়েতনাম বাংলাদেশের আর-এক নাম।'

ঠিক সেই সময় দুম-দুম করে আওয়াজ উঠল। পায়ের তলার রাস্তা কাঁপিয়ে দুটো বোমা ফাটল কলুটোলার দিকে। অনিমেষ দেখল, একটা পুলিশ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। দু'তিনটে ছিটকে ওপাশে পড়ে গেল। মুহূর্তে ওদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল, পুলিশগুলো পড়িমড়ি করে মির্জাপুরে রাখা ভ্যানগুলোর দিকে ছুটে গেল।

ব্যাপারটার জন্যে একদম প্রস্তুত ছিল না অনিমেষ। হঠাৎ কাণ্ডটা হওয়ায় মিছিলের সবাই হকচকিয়ে গেছে। সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সজাগ করিয়ে গলা তুলল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে পুলিশ বাহিনীর সামনে দুমদাম বোমা এসে পড়ল। ধোঁয়ায় চারদিক এখন ঢাকা। ওদিকের পুলিশ পিছু হঠেছে। সমস্ত এলাকা এখন জনশূন্য। সুদীপ চিৎকার করে বলল, 'কমরেডস, আপনারা গেটের সামনে চলে আসুন। ওরা যদি আক্রমণ করে তা হলে ভেতরে ঢুকে যাবেন। অনুমতি ছাড়া কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ ঢুকতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সবাই গেটের কাছে চলে এল। অনিমেষ তখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে দু'পাশে চোখ বুলিয়ে বোমার উৎসটা খুঁজল। প্রথম যে বোমা দুটো পড়েছে সেগুলোর দিকে তার খেয়াল ছিল না, কিন্তু শেষের দুটো যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ধরনের পরিকল্পনার কথা তার জানা ছিল না। সে মুখ তুলে দেখল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালকনিগুলোয় মেয়েদের ভিড় এবং তাদের নজর সব ওর দিকে। সুদীপ চিৎকার করে অনিমেষকে ডাকতেই টিয়ার গ্যাস চার্জ করল পুলিশ। ঠিক অনিমেষের সামনে একটা শেল এসে পড়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল। অনিমেষ দেখল শেলটা এখনও অবিকৃত এবং ধোঁয়া একটা দিক থেকেই বেরুচ্ছে। চোখ জ্বলছে কিন্তু অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বার করে শেলটাকে তুলে কয়েক পা এগিয়ে পুলিশের দিকেই ছুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে একরাশ পায়রার পাখার ঝটপটানির মতো সোচ্চার হাততালি বাজল। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল অনর্গল টিয়ার গ্যাসের শেল বৃষ্টি।

অনিমেষ সুদীপের কাছে সরে এলে সে বলল, 'ও-রকম হিরো হবার জন্য মাঝ রাস্তায় দাঁড়াবার দরকার ছিল না। ওরা যে-কোনও মুহূর্তেই ফায়ারিং শুরু করতে পারে।'

সে-কথায় কান না দিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'বোমা ফাটাল কে? এ রকম হবে আগে জানতাম না!'

www.MurchOna.com

সুদীপ খিঁচিয়ে উঠল, 'আমি কি জানতাম? পুলিশ নিজের লোক দিয়ে বোমা ফাটিয়ে প্যানিক সৃষ্টি করছে। অ্যাকশান নেবার জন্যেও একটা অজুহাত দেওয়া দরকার। এটাও বোঝো না?'

দু' চোখ এখন জলে ভরা। ভীষণ চোখ জ্বলছে, একটু রগড়ালে জ্বলুনিটা বাড়ছে। কতগুলো ছেলে ভেতর থেকে কয়েকটা জল ভরা বালতি নিয়ে এল। দেখাদেখি অনিমেষ রুমাল জলে ভিজিয়ে চোখে চাপা দিচ্ছিল। অনিমেষ দেখছিল একটি ছেলে, যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে মনে হচ্ছে না, মাঝে মাঝে ছুটে রাস্তায় নেমে গিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে শেল কুড়িয়ে নিয়ে এসে বালতিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই সময় ওপরের বারান্দাগুলোয় মেয়েদের চিৎকার উঠল। পুলিশ এবার বারান্দা তাক করে শেল ছুড়ছে।

সুদীপ বলল, 'শালাদের কাণ্ডটা দেখছ। মেয়েরা ওদের কোনও ক্ষতি করেনি তবু ওখানে শেল ছুড়ছে। একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী করা যায়?'

'আমরা অ্যাটাক করব।' সুদীপের মুখ এখন শক্ত। কথাটা বলেই সে ছুটে গেল ও পাশে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না অ্যাটাক করব বলতে সুদীপ কী বোঝাচ্ছে? রাইফেলধারী পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কি ছাত্রদের আছে! ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথায় আর একটা বোধ উঁকি দিল। এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা কি হওয়া উচিত? যে ইস্যু নিয়ে ওদের বিক্ষোভ জানানোর কথা সেই ইস্যুটা তো ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। আর সেটা এমন একটা ব্যাপার যে তা নিয়ে এত বড় কাণ্ড হওয়া ঠিক নয়। এ যেন মশা মারতে কামান দাগার মতো ব্যাপার। হঠাৎ ওর খেয়াল হল বিমান নিশ্চয়ই এতক্ষণে আসল মিছিল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ বিমানের যাওয়াটা নিরাপদ করার জন্যেই এখানে ওদের পুলিশকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

একটা চিৎকার, সেই সঙ্গে হ্যা হ্যা-অ্যা-অ্যা শব্দে কতগুলো ছেলেকে ছুটে যেতে দেখে অনিমেষ থতমত হয়ে গেল। এ রকম শব্দ কী কারণে মানুষের গলা থেকে বের হয় কে জানে কিন্তু ছেলেগুলোকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অবিরাম বোমাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই দেখল, ও পাশের থেমে থাকা ট্রামটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আচম্বিতে তার মনে সেই ছবিটা ভেসে এল। প্রথম যে-রাতে সে কলকাতায় পা দিয়েছিল, এমনি করে একটা ট্রামকে জ্বলতে দেখেছিল।

শব্দ করে ট্রামের শরীরটা ফাটছে। যে ছেলেগুলো ছুটে গিয়েছিল তারা চক্ষের নিমেষে গা ঢাকা দিল। আর সেই মুহূর্তে যে শব্দ হল সেটা যে রাইফেল থেকে হচ্ছে তা অনিমেষকে বলে দিতে হবে না কাউকে। প্রাচী সিনেমার পাশের গলিতে এই রকম একটা শব্দ তার শরীরে ছিদ্রচিহ্ন রেখে গেছে চিরকালের জন্য। সেদিন যে বোকার মত গলির মাঝখান দিয়ে ব্যাগ হাতে ছুটেছিল সে আজ তড়িৎগতিতে গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফায়ারিং হচ্ছে এই খবরটা বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে সোচ্চার হয়ে ছড়িয়ে যেতেই ওপরের বারান্দার ভিড়টা হাওয়া হয়ে গেল আচমকা।

অনিমেষ আড়াল থেকে দেখল, পুলিশ বাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। জায়গাটায় থাকা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখতে পেল আড়ালে আবডালে ছেলেরা শেলটার নিয়ে নিয়েছে। দূরে দমকলের আওয়াজ ভেসে আসছে। গাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। চোখে চেপে ধরে ধরে ভেজা রুমালটা এখন প্রায় শুকনো। জ্বলুনিটা বাড়ছে। এখন কী করা যায়? কোনও বিশেষ নির্দেশ দেয়নি বিমান। সুদীপকেও সে দেখতে পাচ্ছে না। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটল আচম্বিতে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ফায়ারিং শোনা গেল। অনিমেষ দৌড়ে দোতলায় উঠে এল। এ পাশের বারান্দাটা ফাঁকা। একদম রাস্তার ধারে বলে কোনও দর্শক এখানে নেই। সে উঁকি মেরে দেখল, দমকলের লোকরা কাজে নেমে পড়েছে। অঝোরে জল ঝরছে ট্রামটার ওপরে। আর তখনই ইট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। রাশি রাশি ইটের টুকরো এমনভাবে দমকলের লোকদের ওপর এসে পড়া শুরু হল যে ওদের পক্ষে কাজ করা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াল থেকে ইট পড়ছে এবং পুলিশের পক্ষে এই মুহূর্তে কিছু করা অসম্ভব।

যা হোক যা চাওয়া হয়েছিল তা সফল হয়েছে। আজকের এই ঘটনার কথা নিশ্চয়ই আগামিকালের কাগজে থাকবে। ব্যাপারটার প্রচার যত বাড়বে তত ভিয়েতনাম সম্পর্কে ছাত্ররা যে উদ্বিগ্ন তা প্রকাশ পাবে। বিমান কি শেষ পর্যন্ত মার্কিন দূতাবাসে মিছিল নিয়ে পৌঁছাতে পারল? খবরটা এখন জানা যাবে না যদি কেউ না ফিরে আসে। হঠাৎ নীচে চোখ পড়তে অনিমেষ দেখতে

www.MurchOna.com

পেল তিনটে পুলিশের জিপ হেয়ার স্কুলের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে ঢুকে পড়েছে। কী ব্যাপার ? সুদীপ বলেছিল পুলিশ নাকি অনুমতি ছাড়া এখানে থাকতে পারে না! তবে কি অনুমতি পেয়ে গেছে ?

এতক্ষণে খেয়াল হল এত যে গোলমাল হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা টিয়ার গ্যাসে নাস্তানাবুদ, কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলার তো দূরের কথা কোনও অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ওঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছুতেই ছাত্রদের বোঝানো সম্ভব নয়। অতএব হাল ছেড়ে বসে আছেন। পুলিশের খুব একজন বড় অফিসারকে ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরের দিকে যেতে দেখতে পেল সে। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই অফিসারটি নেমে এসে কিছু বললেন ওঁর সহকর্মীদের। আর তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়চত্বর পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল।

অনিমেষ সুদীপকে দেখতে পাচ্ছে না, ছাত্রদের তরফ থেকে কী করা উচিত এখন ? হুকুম পাওয়া মাত্র পুলিশ ছুটে গেল সেই অংশটায় যেখান থেকে লুকিয়ে ইটবৃষ্টি করা হচ্ছে। কেউ কাউকে সতর্ক করার চেষ্টা করার আগেই একটা কনস্টেবল দুটো ছেলেকে টানতে টানতে ভ্যানটার কাছে নিয়ে এল। ছেলে দুটোকে চেনে না অনিমেষ এবং চেহারা দেখে মনে হয় না ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কী করে এখানে এল কে জানে! ছাত্র-আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগল না। চারদিকে ধোঁয়া, ভাঙা ইট কাচ ছড়িয়ে—পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে নিয়েছে। এই যদি পরিণতি হয় তা হলে এতসব করা কী জন্যে ? এবং এই পরিণতির কথা তো নিশ্চয়ই জানা ছিল। কয়েকটা ছাত্র একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরকম লড়াই করতে পারে না। আর লড়াইটা কী নিয়ে হচ্ছে, না কয়েক হাজার মাইল দূরে একটি বিদেশি রাষ্ট্র অন্য একটি দেশের ওপর অত্যাচার করছে বলে প্রতিবাদ জানাতে। অনিমেষ মাথা নাড়ল আপন মনে, না এ ভাবে চলতে পারে না। হয়তো এরকম টুকরো টুকরো কিছু বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে প্যানিক সৃষ্টি করা যায় কিন্তু সেটা কি ফলপ্রসূ ?

বিশাল চত্বরটায় পুলিশ গিজগিজ করছে। অনিমেষ ফাঁকা দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে নিজের ক্লাশের সামনে এসে দেখল কুড়ি পঁচিশটা মেয়ে চোখে রুমাল দিয়ে বসে আছে।

## পনেরো

'যুদ্ধ হয় একটার পর একটা এবং শত্রু-শক্তি ধ্বংসে করা যায় একের পর এক। কলকারখানা তৈরি হয় একটার পর একটা। চাষীরা চাষ করে একের পর এক প্লট। আমরা যে খাবার শেষ করতে পাব তাই নিই কিন্তু আমরা মুঠো মুঠো করেই তাই খাই। সমস্ত খাবার একসঙ্গে খাওয়া অসম্ভব। একেই পিসমিল সলিউশন বলে।' মাও সে তুং-এর বিখ্যাত এই উক্তিটির ব্যবহার করেছিল সুদীপ। একসঙ্গে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। পিসমিল সলিউশন হচ্ছে একমাত্র উপায়। এই যে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ হল সেটা হয়তো একটা ছোট্ট বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা জন্ম নেবে। আজ যদি সারা দেশের মানুষ এই রকম ঘটনা অবিরত ঘটাতে থাকে তা হলে কোনও সরকারের পক্ষে তার মোকাবিলা করা অসম্ভব। ভারতবর্ষ ভিয়েতনাম হয়ে যাবে সেই সময়।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সাহসী ছেলেরা বেরিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পুলিশের ভ্যান এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এবং কলেজ স্ট্রিটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। চারধারে একটা থিতিয়ে আসা ভাব কিন্তু কোনও দোকানপাট খোলেনি, সামান্য যে ক'জন পথচারী হাঁটছে তারা যে সন্ত্রস্ত তা বোঝা যায়। পোড়া ট্রামটাকে এখনও সরিয়ে নেওয়া হয়নি। অবশ্য সেটার কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। এখন কোনও রকম গোলমালের আশঙ্কা নেই। সমস্ত কলকাতা জেনে গেছে কলেজ স্ট্রিটে এই সংঘর্ষের কথা। খবর এসেছে বিমানের মিছিল এয়ার লাইনসের কাছেই পুলিশ আটকে দেয়। খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল শোভাযাত্রা তাই ওখানে কিছু ঘটেনি। চারজনের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বিমান মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে প্রতিবাদপত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বিমান অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও ফিরে আসতে পারেনি, কিন্তু একটি ছাত্র খবরটা পৌঁছে দিয়েছে।

সুদীপ চার-পাঁচজনের একটা দলকে নিয়ে কথা বলছিল।

অনিমেষ বলল, 'আপনি যা বলছেন তা এ সব ইস্যু নিয়ে সম্ভব নয়। তা ছাড়া—।

চুরুট ধরিয়ে এক হাতে ওকে থামতে বলে সুদীপ খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'সেটা আমরা জানি। কিন্তু এ ভাবেই মানুষকে সচেতন করতে হবে। যে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সরাসরি যাওয়া সম্ভব নয় কিছু ছলনার আশ্রয়ও নিতে হয়। আজকে এই ঘটনা না ঘটালে বিমান মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছাতে পারত না।'

www.MurchOna.com

'কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছে কী লাভ হল ? ওরা শুনবে আমাদের কথা ? এটাও তো একধরনের চাটুকারিতা।' একটি ছেলে ফোঁস করে উঠল।

অনিমেষ চমকে ছেলেটাকে দেখল। ফরসা সুন্দর চেহারা কিন্তু এর আগে কখনও কথা বলতে দেখেনি ওকে।

সুদীপ বলল, 'তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। চিনের দালাল বলে গুলজারিলাল নন্দা যখন আমাদের চিহ্নিত করেছিল তখন আমাদের পার্টি সেক্রেটারি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা পড়ে দেখো।'

অনিমেষ বলল, 'কী সেটা ?'

'তিনি বলেছিলেন, আমরা কোনও রকমের সশস্ত্র যুদ্ধের কথা চিন্তা করছি না। আমরা আইনসম্মত দল এবং খোলাখুলি কাজ করতে চাই। আমি আর একবার স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে তেলেঙ্গানা-মার্কা সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই।'

ছেলেটি বলল, 'আমাদের সঙ্গে সি পি আই-এর তা হলে তফাত কী ?'

সুদীপ বলল, 'ওরা সুবিধাবাদী, রাশিয়ার তাঁবেদার।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'পার্টির যদি এই সিদ্ধান্ত তা হলে আজ আমরা সংঘর্ষে গেলাম কেন ?'

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল সুদীপের মুখে, 'কে বলেছে আমরা সংঘর্ষে গেছি। পুলিশ সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় আমাদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে, গুলি চালিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনকে হেয় করার জন্য নিজেরাই গুণ্ডা দিয়ে ট্রাম জ্বালিয়েছে। তুমি কি যারা ট্রাম জ্বালিয়েছে তাদের দেখেছ? ওদের কি ছাত্র বলে মনে হয়েছে ? তবে! আর দু-একটা ইট যা এখান থেকে ছোড়া হয়েছে তা প্ররোচিত হওয়ার পরই ছোড়া হয়েছে। ব্যাপারটা যে সমস্তটাই সাজানো তা বুঝতে এত অসুবিধে হয় কেন ?'

একটি ছেলে দৌড়ে এসে বলল, 'সুদীপ, রিপোর্টাররা এসেছে কথা বলতে চায়। কী করবে ?'

'কী করবে মানে ?'

'বিমান তো নেই।'

'আমরা আছি। ওদের ক্যান্টিনে বসাও আর রাখালদাকে চা করতে বলো। আমি আসছি।' ছেলেটি সুদীপের নির্দেশ নিয়ে চলে গেলে সে বলল, 'বোধ হয় কিছু মেয়ে এখনও আটকে আছে এখানে। তাদের বুঝিয়ে বলো ভয়ের কিছু নেই, ওরা বাড়ি চলে যেতে পারে আমি রিপোর্টারদের সামলাচ্ছি।'

সুদীপ খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে ইউনিয়ন অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল। অনিমেষ শুনল, ফরসা ছেলেটি নিজের মনে কিছু বিড়বিড় করছে। বোঝা যাচ্ছিল সে আজকের ব্যাপারটায় মোটেই সন্তুষ্ট নয়। অনিমেষ নিজেও স্বস্তি পাচ্ছিল না।

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনিমেষ নিজেদের ক্লাশরুমের দিকে হাঁটছিল। এর আগে যখন সে মেয়েদের দেখেছিল তখন কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ দরজা থেকে সরে সুদীপের খোঁজে নেমে এসেছিল। এখন সিঁড়ির মাঝামাঝি মুখোমুখি হয়ে গেল ওদের। ওরা নেমে আসছে।

'আপনাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ?'

অনিমেষ সেই চোখ দুটোকে নজর করল। এখন টকটকে জবাফুলের মতো লাল। অনিমেষের নিজের অবস্থাও তাই কিন্তু অনেকটা সামলে নিয়েছে সে। আর একটি মেয়ে প্রায় ভেঙে পড়া গলায় বলে উঠল, 'ট্রাম-বাস চলছে না, না ? আমি কী করে বাড়ি যাই বলুন তো ?'

'কোথায় থাকেন আপনি ?' রোগা এবং আতঙ্কিত মেয়েটিকে দেখল অনিমেষ।

'ঢাকুরিয়া।'

'ট্রেনে যাবেন ?'

'না, না, ট্রেনে গেলে অনেক হাঁটতে হয়।'

'তা হলে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চলে যান। ওদিকে সব বাস পাবেন।'

'সে কী! এই যে একজন বলল, সব বাস-ট্রাম বন্ধ ?'

'সেটা শুধু কলেজ স্ট্রিটে। আপনারা ইডেন হোস্টেলের পাশ দিয়ে চলে যান। উত্তর বা দক্ষিণ দু' দিকের গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

অনিমেষের কথায় উজ্জ্বল হল মুখগুলো। কুয়ো থেকে যেন টেনে তোলা হল ওদের।

নীচে নেমে এসে রোগা মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ গুলি করবে না তো ?'

অনিমেষ হাসল, 'কী আশ্চর্য! খামোকা পুলিশ গুলি করতে যাবে কেন ?'

www.MurchOna.com

আর একটি মেয়ে বলল, 'কেন ? করেনি গুলি ? কিছু বিশ্বাস নেই।'

'না, এখন সব থেমে গেছে।' অনিমেষ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

সে লক্ষ করছিল, সবাই কিছু না কিছু বলছে কিন্তু সেই প্রথম প্রশ্ন করার পর থেকে একজন একেবারে চুপ। যেন তার উত্তরটা না পাওয়া অবধি সে কথা বলবে না। অনিমেষ প্রশ্নের শ্লেষটা গায়ে না মাখার চেষ্টা করছিল অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে।

ততক্ষণে অন্যান্য ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ইডেন হোস্টেলের পথে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। প্রায় নিঃশব্দে ওরা হাঁটা শুরু করতে অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

একটু অস্বস্তির গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যাবেন না ?'

'সব অসুখেই কি এক অসুধ খান আপনি ?'

'মানে ?'

'পরোপকার করতে গিয়ে এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন ? সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু যে আমার পথ তা আপনাকে কে বলল ?'

অনিমেষ বলল, 'আপনি এত বেঁকিয়ে কথা বলেন কেন ? সবসময় মানুষকে বিদ্ধ করে কী আনন্দ পান কে জানে ? কোথায় থাকেন আপনি ?'

'কেন ? এখন কি আপনার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেখাশোনা করার ?'

'যদি বলি তাই। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে আলাদা কথা।'

'এটাও কি সংগ্রামী পদক্ষেপ ?'

'আর কিছু বলবেন ? তা হলে একবারে বলে ফেলুন।'

'আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।'

'একটু ঠাণ্ডা করে বলুন কোন দিকে যাবেন ?

মেয়েটি একটুক্ষণ অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিন বলছিলেন না যে মফস্বলের ছেলে আপনি। ওটা তো সহানুভূতি আদায়ের ছল, কিন্তু এর মধ্যেই— ।' কথাটা শেষ না করে হেসে ফেলল সে।

অনিমেষ দেখল ঠাস দাঁতের সারির একটা দিকে গজদাঁতের আদল, যেটা হাসিটাকে আরও সুন্দর করেছে। সেটা চোখে পড়ায় অনিমেষ একটুও রাগতে পারল না কথাটা শুনেও। বলল, 'আপনি একনাগাড়ে ঝগড়া করে যাচ্ছেন।'

মেয়েটি আবার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল। কলেজ স্ট্রিটের দিকে মুখ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না ?'

'আপনি কোথায় যাবেন এখনও বলেননি। যদি আপত্তি থাকে তবে— ।'

'আপত্তির কী আছে! আমাদের বাড়ি বেলঘরিয়া। শিয়ালদা দিয়ে গেলে সুবিধে হয়। আপনি ওদিকে গেছেন ?'

'না। আমি যদি শিয়ালদা অবধি যাই তা হলে।—'

'চলুন।'

কলেজ স্ট্রিট দিয়ে যেতে অনিমেষের একটু অস্বস্তি ছিল। কারণ এখনও প্রচুর পুলিশভ্যান ও দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই গোলমালের সময় তাকে মাঝরাস্তায় টিয়ারগ্যাসের শেল কুড়োতে দেখে থাকতে পারে। সুতরাং এখন মুখোমুখি হলে ওকে ধরে ফেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু মেয়েটির কাছে এ সব কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। সত্যিই তো শিয়ালদা যাওয়ার জন্যে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু ঘোরার কোনও মানে হয় না।

দু-একজন মানুষ সন্তর্পণে ফুটপাত ধরে হাঁটছে। পোড়া ট্রামটিকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ততক্ষণে।

অনিমেষ বলল, 'আসুন, ওই কলেজ স্কোয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

ওরা যখন রাস্তা পার হয়ে এ-ফুটপাতে এল তখন একজন অত্যন্ত অবহেলায় হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলল। মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'ওরা আমাদের কেয়ারই করছে না।'

কলেজ স্কোয়ারের ভেতর ঢুকে একটু সহজ হল অনিমেষ। সামনেই বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু এবং সেটা জড়ভরতের মতো তাকিয়ে। এইসব মূর্তিগুলো দেখলে ইদানীং অস্বস্তি হয় ওর। সে-সময়ের মানুষগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে লিলিপুট বানিয়ে ফেলছি।

www.MurchOna.com

মির্জাপুরের কিছু দোকান খোলা। মোড়ে মোড়ে জটলাগুলো বোধ হয় আজ দুপুরের ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত। অর্থাৎ বিমানের পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। অবশ্যই এটাকে এক রকম জয়লাভই বলতে হবে। টুকরো টুকরো করে যদি সফলতা আসে একসময় সেগুলো জোড়া দিয়ে দিলেই পূর্ণতা পাবে।

মেয়েটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আজকে যা করলেন তাতে কার কী ভাল হল বলতে পারেন?'

অনিমেষ বলল, 'একদম মেরুদণ্ডহীন আমরা নই সেটা প্রমাণ হল।'

'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল মেয়েটি, 'পাড়ার গুণ্ডারা যখন পুলিশের সঙ্গে বোমা নিয়ে লড়াই করে তখন তাদেরও মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হয় না।'

'আশ্চর্য! দুটো ব্যাপার এক হল? ওরা লড়ছে কোনও কারণ ছাড়াই—জাস্ট গুণ্ডামি করতে।' অনিমেষ বিরক্ত হল।

মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কারণটা কী? না, ভিয়েতনামে আমেরিকা অত্যাচার করছে তাই কলকাতার ট্রাম পোড়াও, পুলিশ মারো, সাধারণ মানুষকে অসুবিধেতে ফেলো—কী মহৎ ব্যাপার!'

ভ্রূ কুঁচকে গেল অনিমেষের, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'দেখুন, আমি সাধারণ মানুষের দলে। মাথায় যদি অন্য চিন্তা না থাকে তা হলে যে কেউ বুঝতে পারবে এগুলো হল স্টান্ট দেওয়ার চেষ্টা। নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার সহজ রাস্তা। আচ্ছা, সত্যি কি আপনি নিজেকে কমিউনিস্ট ভাবতে পারেন?'

'কমিউনিস্ট? আমি ঠিক জানি না। তবে আমি এমন সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে কোনও বৈষম্য থাকবে না। সেটা তো আর আকাশ থেকে নেমে আসবে না, তাই তার জন্যে কতগুলো আদর্শ সামনে রেখে এগোতে হবে। সেক্ষেত্রে কমিউনিজমের কোনও বিকল্প নেই।'

'বেশ, আপনার দল যা করছে তা কি সাম্যবাদের লক্ষণ! কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে আপনারা ভুল করছেন।'

'আপনি কি কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করেন?'

'মোটেই না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের দল সরকারে এলে আর একটা কংগ্রেসি সরকার হবে। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।'

চট করে নিশীথবাবুর মুখ মনে পড়ে গেল অনিমেষের। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলের যে মাস্টারমশাই তাকে প্রথম দেশ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। তাঁরও তো একই বক্তব্য ছিল। কথাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে, 'এ দেশে কমিউনিস্ট সরকার হওয়া মুশকিল। যদি কখনও হয় দেখবে আমরা যা যা করেছি ওরা তারই নকল করছে আর যা করিনি ওরা সেটা করছে না। উপরন্তু ওদের বাড়তি সমস্যা হল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টেইনের এখন ওরা জন্ম দিচ্ছে তাদের সামলানো তখন মুশকিল হয়ে পড়বে। একজনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তুমি দশ রকমের ভাঁওতা দিতে পারো, কিন্তু নিজে ক্ষমতায় এলে দেখবে সেই ভাঁওতাগুলো একশো রকমের হয়ে গেছে।'

কমিউনিস্ট পার্টির মাথা বা মাঝারি নেতাদের চেনে না অনিমেষ। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বিমানের কথাবার্তা ওর তেমন পছন্দ হয় না। সব সময় একটা চাপা মনোভাব, কেউ প্রতিবাদের ভঙ্গি করলে সেটা যেন বিমানের সহ্য হয় না। কিন্তু একজন লোককে দিয়ে একটা দলের বিচার করা ঠিক নয়। মার্কসবাদ ছাড়া এ দেশে মুক্তি নেই সেটা যখন সত্য তখন অন্য কোনও বিকল্প দলের কথা ভাবা যায় না। ছাত্র পরিষদের শচীন সেদিন ওদের যে মতবাদের কথা বলছিল কিংবা মুকুলেশ যা করতে চায় সেটা তো শুধুই ভাবপ্রবণতা। অবলম্বন ছাড়া কোনও সার্থকতা আসে না। আসলে মানুষের সহজাত ধর্ম হল চট করে হতাশ হয়ে পড়া। কাজ শুরু করার আগেই যারা ব্যর্থ পরিণতির কথা চিন্তা করে তারা তো কিছুই করতে পারবে না।

মেয়েটি বলল, 'কী ভাবছেন তখন থেকে?'

অনিমেষের খেয়াল হল ওর শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকের অবস্থা প্রতি দিনের মতো স্বাভাবিক। এই যে মাত্র মাইলটাক দূরে অমন কাণ্ড হয়ে গেল তা এই এলাকা দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। অনিমেষ বলল, 'কিছু না। পরে একদিন আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। আপনার ট্রেন ক'টায়?'

'এখন তো ঘন ঘন ট্রেন। আপনাকে এতদূরে এনে কষ্ট দিলাম।'

'কষ্ট কী! শিয়ালদায় এলে আমার মন ভাল হয়ে যায়।'

'সেকী? কেন?'

www.MurchOna.com

'স্টেশনে ঢুকলেই রেলগাড়ি দেখতে পাই। আর রেলগাড়ি দেখলেই জলপাইগুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলা এমন একটা জিনিস যা সব ক্ষত সারিয়ে দিতে পারে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও।'

'আপনার ক্ষত আছে?' ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল মেয়েটি।

কথাটা শুনে চমকে তাকাল অনিমেষ। তারপর হেসে ফেলল, 'আপনি এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর দেওয়া যায় না।'

'তা হলে আপনার এমন কথা বলা উচিত নয় যার অর্থ আপনি জানেন না।'

নর্থ স্টেশনের দরজায় এসে দাঁড়াতে মেয়েটি বলল, 'এবার আমি যেতে পারব, আপনাকে শুধু এটুকু করার জন্য ধন্যবাদ।'

'কিছুই করিনি।'

'তা ঠিক। আসলে আমরা মেয়েরা অনেক কিছু অলীক ভয় আগাম কল্পনা করে নিয়ে বিব্রত হই। একটা পুরুষ যা পারে আমিও তাই করতে পারি। কিন্তু যদি কিছু হয়, যদি যদি করে নার্ভাস হয়ে সব গুলিয়ে ফেলাটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, কী করব বলুন? নইলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে রোজকার মতো আজও চলে আসতে পারতাম, এই যেমন এলাম।' গজদাঁত বের করে হাসল মেয়েটি।

'আমি সঙ্গে এলাম বলে এখন আফশোস হচ্ছে?'

'এটাও কিন্তু মেয়েদের অভ্যেস, গায়ে পড়ে কাদা মাখা। ও কথা আমি একবারও বলিনি। এই যাঃ, কী অভদ্র দেখুন তো আমি। আপনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসাই করিনি।' ঠোঁট টিপে হাসলে মেয়েটির চোখ কথা বলে।

'হাতিবাগানের একটা হোস্টেলে।'

'আপনি হোস্টেলে থাকেন? ও তাই!'

'মানে? আবার কী থিয়োরি আছে এ ব্যাপারে!'

'হোস্টেলের ছেলেরা একটু ডেসপারেট এবং স্বার্থপর হয়।'

'তাই নাকি? বাঃ, এটা তো জব্বর জানা হল।'

'একা একা থেকে ভাবতে শুরু করে আমি যা করছি তাই ঠিক।'

'বাঃ, গুড।' জ্ঞান গ্রহণ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অনিমেষ। হঠাৎ যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেল। অফিস-ফেরত মানুষেরা পড়ি কি মরি করে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন ধরতে। গেটে যে টিকিট কালেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ভঙ্গি জগন্নাথের মতো। হাত দুটো আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটি এবার চলে যাওয়ার ভঙ্গি করতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'টিকিট কাটবেন না?'

'আমার মাসের টিকিট আছে।'

হঠাৎ অনিমেষের ইচ্ছে হল ট্রেনে ওঠার। অনেকদিন ট্রেনে ওঠা হয়নি। জলপাইগুড়ি যাওয়া-আসা ছাড়া তো ট্রেনে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না।

সে বলল, 'একটু দাঁড়াবেন, আমি টিকিটটা কেটে আনি।'

'কেন? আপনি কোথায় যাবেন?' বিস্ময় মেয়েটির চোখে।

'ট্রেনে চড়তে ইচ্ছে করছে খুব।' বলে অনিমেষ দ্রুত গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল। বোধ হয় এখন অফিসটাইম বলেই কাউন্টারে ভিড় কম। এখনকার যাত্রীদের মান্থলি আছে। যারা হঠাৎ-যাত্রী তারা এই সময়টাকে এড়িয়ে আসে। বেলঘরিয়া পর্যন্ত টিকিট কাটল অনিমেষ। হাতিবাগান দিয়ে একটা বাস যাওয়া-আসা করে বেলঘরিয়া পর্যন্ত। ফেরার সময় সেটায় আসা যাবে।

অনিমেষকে আসতে দেখে মেয়েটি প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ঢুকে গেল। পাশাপাশি কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে কিন্তু সেগুলোয় বাদুড়-ঝোলা ভিড়।

অনিমেষ বলল, 'আরে ব্বাস, এগুলোয় উঠবেন কী করে?'

মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কাছে যেটা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ আমাদের সেটা প্রাণ বাঁচানোর দায়। নিজে সুখে থাকলে অবশ্য এ রকম করা যায়।'

'মানুষকে আঘাত দিয়ে আপনার এক ধরনের আনন্দ হয়, না?'

মেয়েটি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে হাঁটছেন এ দৃশ্য পরিচিত কেউ দেখলে কী কৈফিয়ত দেব?'

'কৈফিয়ত কেন? আপনি আমার সঙ্গে হেঁটে অন্যায় করছেন নাকি?'

www.MurchOna.com

'এই সন্ধেবেলায় একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরঘুর করছি—সমাজটাকে তো আপনারাই নিয়ন্ত্রণ করেন।'

'এখন সমাজ বলে কিছু নেই।'

'তাই নাকি! তা হলে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা চান কেন?'

থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। কী কথা থেকে কোন কথায় চলে এল এ মেয়ে। এতক্ষণে ওর মনে এক ধরনের হীনতাভাব ছড়াতে শুরু করল। মেয়েটির সঙ্গে কথায় সে প্রতি মুহূর্তে হেরে যাচ্ছে।

'কী, মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভয় নেই, কেউ জিজ্ঞাসা করলে আলাপ করিয়ে দেব উনি একজন মহান কর্মী, আজ ইউনিভার্সিটিতে বিপ্লব করে এসেছেন। এ কথা শুনলে কেউ আর অন্য কিছু ভাববে না।'

মেয়েটি ওকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলে এল। এদিকের লাইনে কোনও গাড়ি নেই। যাত্রী হকার কুলিতে স্টেশন গমগম করছে। সেই প্রথম রাতটার কথা মনে পড়ে যায় যেদিন সে একা জলপাইগুড়ি থেকে এসে শিয়ালদায় নেমেছিল। এখানে এসে প্রথমে বোঝা যায়নি কলকাতার অ্যালার্জি হয়েছে। এ কথাটা ত্রিদিবের মুখে শোনা। এই যে মাঝে মাঝে বিক্ষোভ, ট্রাম-বাস পোড়ানো নাকি অ্যালার্জির মতো। চিংড়ি খেয়ে অনেকের শরীরে কয়েক দিনের জন্যে বেরিয়ে আবার যেমন মিলিয়ে যায় তেমনি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাকার টিকিট কাটলেন?'

'বেলঘরিয়া।'

'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

'বুঝলাম না।'

'ন্যাকামি করবেন না। আপনি আমার বাড়িতে যেতে চাইছেন নাকি?'

'আপনার আপত্তি থাকলে যাব না,' অনিমেষের মজা লাগছিল।

'নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। আমি একটা উটকো লোককে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি না। বাড়িতে যখন জিজ্ঞাসা করবে কেন এল তখন আমি কী বলব? অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছে?'

'না। বলবেন বেড়াতে এসেছে।'

'আপনি আমাকে কী ভাবেন?'

'একজন শিক্ষিতা মহিলা।'

'কোনও শিক্ষিতা একদিনের আলাপে কোনও ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যায় আদর করে কোনও প্রয়োজন ছাড়া! আর আপনিই বা কেমন লোক অযাচিত হয়ে আমাদের বাড়িতে যেতে চাইছেন?'

'বললাম তো আপত্তি থাকলে যাব না।'

'শুনেছেন তো, আমার আপত্তি আছে।'

'বেশ যাব না।'

'তা হলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'টিকিটটা যখন কেটে ফেলেছি তখন ট্রেনে উঠব। সেটায় নিশ্চয়ই আপনার আপত্তির অধিকার নেই।'

'তা নেই কিন্তু অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠবেন। আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন আমি ধন্যবাদ দিয়েছি। এর বেশি কিছু চাইবেন না।'

'আচ্ছা।'

কিন্তু অনিমেষ সরে গেল না। মেয়েটির মতো উদ্বিগ্ন মুখ করে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। এখন প্ল্যাটফর্মটা ভরে উঠেছে। হঠাৎ-খেয়ালে টিকিটটা কেটে একটু অস্বস্তি হচ্ছে এখন। মেয়েটি নিশ্চয়ই সহজ ব্যবহার করছে। যে কোনও ভাল মেয়েই এরকম কথা বলবে। যদিও ওর বাড়িতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা ওর ছিল না কিন্তু খেপিয়ে দিতে ভাল লাগছে। মেয়েরা একবার রাগলে বোধ হয় থামতে জানে না, এর মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। অনিমেষ চটপট আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা। দু-একজন দূর থেকে আচার খাওয়ার মতো মেয়েটিকে দেখছে বটে কিন্তু কথা শোনার মতো কাছাকাছি নেই। যদি ওর সঙ্গে বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে বাড়ি অবধি যায় তা হলে মেয়েটি কী করবে? ব্যাপারটা কল্পনা করতেই হাসি পাচ্ছিল ওর।

'পাশে দাঁড়িয়ে অমন ক্যাবলার মতো হাসবেন না।' ফোঁস করে উঠল মেয়েটি।

www.MurchOna.com

অনিমেষ অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল, 'আরে, আমি হাসতেও পারব না ?'

'দূরে গিয়ে হাসুন।'

'আপনি বড্ড রেগে গেছেন। এরকম যদি অভ্যেস হয় তা হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো উচিত। কারণ এটা একটা অসুখ।'

এই সময় ট্রেনটা এসে গেল প্ল্যাটফর্মে। যাত্রীরা নামতে না নামতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল সেটায় ওঠার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দৃশ্যটা আতঙ্ক নিয়ে দেখছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্রেনটা ভরে গেল মানুষে। এখনও প্রচুর লোক ছুটোছুটি করছে প্ল্যাটফর্মে একটু জায়গা পাওয়ার আশায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছু শোনা যাচ্ছে না। এই মানুষগুলো প্রতিদিন এ ভাবে গাদাগাদি করে যায়। মুখ দেখে বোঝা যায় না ওরা এতে অসন্তুষ্ট কি না। অভ্যেস বোধ হয় সব কিছু সহজ করে দেয়। এ নিয়ে বিক্ষোভ নেই, তবে এটুকুও না পেলে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড হয়। কতটুকু ন্যূনতম চাহিদা মানুষের তবু তাই মেটাতে সরকার অক্ষম। আচ্ছা কমিউনিস্ট পার্টি তো এ সব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার কথা মনে হতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। হঠাৎ কি করে যে ও উধাও হয়ে গেল বুঝতে না পেরে অনিমেষ চারপাশে তাকাতে লাগল। তবে কী ওই ভিড় ঠেলে মেয়েটি উঠে পড়েছে ট্রেনে ? এরকম একটা অসম্ভব কাজ একটা মেয়ের পক্ষে এখন আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না অনিমেষের। চোখের সামনেও মেয়েদের ঠেলাঠেলি করতে দেখেছে।

হঠাৎ কেমন নিঃসঙ্গ মনে হল ওর। এতক্ষন কথা কাটাকাটি করেও যা মনে হয়নি হঠাৎ ওকে না দেখে তাই হল। অনিমেষ ট্রেনের কামরাগুলোয় সাগ্রহে চোখ বোলানো শুরু করল। ভেতরে কেউ থাকলে এই ভিড়ে বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। এইভাবে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু অনিমেষের মনে হল এ অবস্থাতেই যদি ওকে দেখতে পেয়ে যায় সে তা হলে অনেক কিছু ব্যাপার সত্যি হতে পারে। যেন নিজের ভাগ্য যাচাই করার জন্যে ও কামরাগুলো দেখা শুরু করল।

এবং ভাগ্য এত কাছে অপেক্ষা করছে তা দেখে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। এই কম্পার্টমেন্টে লোক আছে কিন্তু অন্যগুলোর চেয়ে কম কারণ সামনে বড় বড় করে মহিলা এবং ফার্স্ট ক্লাশের চিহ্ন লেখা আছে। আর তারই জানলায় বসে মেয়েটি যে অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ করছে এটা বলে দিতে হবে না। কিছুই হয়নি এমন ভাব করে অনিমেষ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার ?'

'বাধ্য হয়ে। আপনিও উঠতে পারেন কারণ এখানে অন্য শ্রেণীর লোকও উঠে থাকেন। আপনার অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী, যাবেন না ?'

'আর ইচ্ছে নেই।'

'এত তাড়াতাড়ি ইচ্ছে চলে গেল ?'

'যার সঙ্গে যাব সেই যখন এরকম ভদ্রতা করতে পারল—'

'ও কথা আপনার মুখে মানায় না।'

'কী কথা ?'

'ভদ্রতা।'

'কেন ? আমি কি কিছু অভদ্রতা করেছি ?'

'এতক্ষণ যার সঙ্গে এলেন, কথা বললেন, বাড়ি যেতে চাইলেন, একবারও তার নাম জানতে ইচ্ছে করল না ? আমি মেয়ে এটাই কি আপনার কাছে সব ?'

অনিমেষ সোজা মুখের দিকে তাকাল। ট্রেনটা এবার ছাড়ছিল। মেয়েটি হাসল, 'নিজে কখনও ছোট হইনি, আজ হচ্ছি। আমার নাম মাধবীলতা মুখার্জি।'

'মাধবী ?'

'উহুঁ, ফুল নয়, আমি শুধুই লতা, মাধবীলতা।'

অনিমেষ ট্রেনটার চলে যাওয়া যেন দেখতে পেল না।

www.MurchOna.com

## ষোল

এমন বিষধর সাপ আছে যে দাঁত বসালেই মুহূর্তে শরীর নীল হয়ে যায়, কোনও বৈজ্ঞানিক তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি। অনিমেষ শুনেছে বিষ যখন শরীরে কাজ করে তখন আপাত যন্ত্রণার চাইতে নেশা মানুষকে আচ্ছন্ন করে, ঘুম পায়। এবং সেই খানিক ঘুম কখন চিরকালের হয়ে যায় সে টের পায় না।

নতুন হোস্টেলের এই ঘরে গতকালের রাত নিঝুম কেটেছে অনিমেষের। চোখের সামনে আকাশের চেহারা পালটানো, শেষ ট্রামের শব্দটা ডুবে গিয়ে হঠাৎ কলকাতা শীতল হল এবং শেষ পর্যন্ত কখন প্রথম ট্রাম নতুন দিনটাকে টেনে নিয়ে এল সে টের পায়নি।

চোখের পাতায় জোনাকির মতো আগুনের ফুলকি নেচে বেড়ায় যার সে ঘুমুবে কী করে! আর চোখ খুলতেই যার মুখ—সে মাধবীলতা।

ভোরের প্রথম আলো যে এত আন্তরিক হয়, এত সহজ নরম অনুভূতি বুকে ছড়ায় জানা ছিল না অনিমেষের। এই আলো এখন পৃথিবীর অনেক জায়গায় এমন সোহাগি হয়ে রয়েছে। কিন্তু অনিমেষের মনে হল, তার মতো এমন আপন হয়ে আর কারও কাছে যায়নি। জীবনে কখনও কোনও নেশা করেনি বা তার সুযোগ আসেনি কিন্তু কাল থেকে নিজেকে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। যেন সেই মারাত্মক সাপটা আচমকা ছোবল বসিয়ে দিয়ে গেছে এবং এখন তার আর কিছু করার নেই।

অথচ মাধবীলতাকে গতকাল দুপুরের আগে সে ভালভাবে চিনতই না। ক্লাশে মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়েছে কিন্তু সেই চোখের ভাষা পড়তে কখনওই সচেষ্ট ছিল না সে। কোনও সংস্কারের বশে প্রতিরোধ শক্তি যে তাকে বিরত করেছিল তা নয়, এ সব ব্যাপারে সে নিজেই নিস্পৃহ ছিল। এবং ইদানীং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সে এমন ডুবে ছিল জীবনের এই দিকটা খেয়াল হয়নি। অথচ গতকালের ওই রকম উত্তেজনাময় ঘটনাগুলোয় যখন তার নার্ভ টানটান ঠিক তখন এমন করে সে নিহত হবে তা কে জানত। হেসে ফেলল অনিমেষ জানলায় দাঁড়িয়ে। অনেকদিন আগে শোনা কথাটা মনে পড়ল, সে জানে না কখন মরে গেছে।

কিন্তু মাধবীলতাকে সে চেনে না। ওর পারিবারিক পরিচয় তার জানা নেই। শুধু এটুকুই মনে হয়েছে মেয়েটি নরম এবং বোকা নয়। কোনও কোনও মেয়ে বোধ হয় সহজে আত্মসমর্পণ করার জন্য জন্মায় না, মাধবীলতা এই ধরনের মেয়ে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার সময় অনিমেষ দেখেছে মাধবীলতার নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে এবং সেটাকে গুছিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলার ক্ষমতা রাখে। এ রকম সতেজ ডাঁটো আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে কোনও মেয়েকে অনিমেষ দেখেনি। কলকাতায় এসে নীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নীলা অবশ্যই খুব ডেসপারেট মেয়ে, কোনও রকম ভিজে ব্যাপার ওর নেই। কিন্তু নীলা কখনওই আকর্ষণ করে না, বুকের মধ্যে এমন করে কাঁপন আনে না। যে কোনও পুরুষ-বন্ধুর মতো নীলার সঙ্গে সময় কাটানো যায়। তা ছাড়া কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারেই নীলার মানসিকতা বদ্ধ, মাধবীলতার মতো এমন দ্যুতি ছড়ায় না।

অথচ গতকাল এমন কোনও সংকেত বা ইঙ্গিত মাধবীলতা দেয়নি যে অনিমেষের এ রকম হতে পারে। বরং বলা যায়, মাধবীলতা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকে আহত করে কথা বলছিল। অথচ যেই ট্রেনটা চলে গেল স্টেশন ছেড়ে অমনি অনিমেষকে কেউ যেন আচমকা ছুড়ে দিল এমন এক অসীমে যেখানে শুধুই ভেসে থাকতে হয়, ভেসে যেতে হয়। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল সে যে মাধবীলতাকে ঘিরে এ সব ভাবছে এটা তো সে সমর্থন নাও করতে পারে। এমনও হতে পারে মাধবী অন্য কাউকে ভালবাসে!

কথাটা মনে হতেই একটা অস্বস্তি শুরু হল। গতকাল থেকে যে জোয়ার সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল একটু একটু করে তা থিতিয়ে যেতে লাগল। মাধবীলতাকে সে জানে না এবং এ অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করে হয়তো খেলো হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া মাধবীলতার সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থাও তার অজানা। কাউকে পেতে হলে তার যোগ্য হতে হয়। অনিমেষের এই প্রথম মনে হল মানুষ হিসেবে তার যোগ্যতা কতখানি সে কখনও ভেবে দেখেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এমন একটা বিষয় নিয়ে পড়ছে যার বাজার মূল্য শূন্য, বাবার প্রচুর অর্থ নেই, শারীরিক সুস্থতা পায়ের জন্য সব সময় মেনে নেওয়া যায় না। একে কি যোগ্যতা বলে? তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে প্রবেশের পর পড়াশুনায় মন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত তার আত্মবিশ্বাস আছে, ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে একটু চেষ্টা করলেই সে রপ্ত করে নিতে পারবে।

www.MurchOna.com

কিন্তু এ সব তো যোগ্যতা-বিচারে প্রতিকূল মতামত সৃষ্টি করবে। এই বয়সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ভাবে নিজেকে যোগ্য করতে পারে না। যদি অর্থনৈতিক সাফল্য বা সামাজিক পদমর্যাদা যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তা হলে মাধবীলতার নাগাল পাওয়া অবশ্যই দুঃসাধ্য। বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত ও-দুটো সাফল্যের কথা তার চিন্তায় কখনও আসেনি। আজ মাধবীলতার জন্যে সেটা সম্ভব নয়। নিজের পছন্দ মতো কিংবা বলা যায় মনের মতো পড়াশুনায় সে চিরকাল নির্ভর ছিল। হয়তো বাবার নির্দেশ মেনে বাংলার বদলে অর্থকরী বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করলে আজ এ সব ভাবতে হত না।

অনিমেষ হেসে ফেলল, না, এজন্য ওর কোনও আফশোস নেই। দেশের জন্য এককালে যে ধরনের সেন্টিমেন্ট কাজ করত ওর মনে, ইদানীং সেটা নেই বটে কিন্তু অন্য রকম দৃষ্টিতে দেশ—এই সমাজব্যবস্থাকে দেখতে শুরু করেছে। ইদানীং সে বুঝতে পেরেছে যে সাধারণ মানুষ নিজেকে ভারতীয় বলে অনুভব করে না। এই ভারতবর্ষে জন্মে বড় হয়েও কেউ ভারতবর্ষ নিয়ে কোনও চিন্তা করে না। মানুষের চিন্তা-ভাবনা এখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে জড়িত। এই দেশ নিজের এই অনুভূতি যখন মানুষের নেই তখন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন কী করে আশা করা যায়! রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিশেষ বিশেষ চশমা দিয়ে সমস্যাগুলোকে দেখে। তবু অনিমেষের মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র কাছের দল যার সঙ্গে কাজ করলে এই পরিবর্তন সম্ভব। একটা বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র বা ডাক্তার হওয়ার চেয়ে একজন আন্তরিক কর্মী হওয়া অনেক কাম্য মনে করে সে।

কিন্তু এ সব কথা মাধবীলতাকে বোঝানো যাবে কি! যদি না যায়, যদি তাকে মাধবীলতা গ্রহণ না করে তা হলে কি ওর প্রতি অনিমেষের মনে যে অনুভূতি জন্ম নিয়েছে তা মিথ্যে হয়ে যাবে? শ্লেট মোছার মতো মুছে ফেলা যায়? সেই ছেলেবেলায় সীতা তার বালক মনে যে ঢেউ তুলেছিল, যার প্রকাশ কখনই সোচ্চার হয়নি, তা তো নেহাতই ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়, ধোঁয়া ধোঁয়া ছিল সব। কিন্তু যে অনুভূতি জলের দাগের মতো এখন অস্পষ্ট হয়েও রয়ে গেছে তাকে কি অস্বীকার করা যায়? আসলে ভালবাসা কখনও কোনও শর্ত মেনে আসে না, আমরা তার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করি। কেন যে এমন হয়!

জীবনে আর কখনও এমন করে সময় পার করার তাগিদ অনুভব করেনি অনিমেষ। আজকের প্রথম ক্লাশ বারোটায়। প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় হাতে। একটা মিনিট কাটতে যেন এক প্রহর লাগছে। বারোটা বাজলেই মাধবীলতার দেখা পাওয়া যাবে। এখন, চোখ বন্ধ করলেই সেই ঝকঝকে মুখ, সামান্য নিচু, মুখের ভঙ্গিমায় ধরে রাখা দীঘল চোখের চাহনি—যেন বুকের গভীরে অনন্ত হয়ে মিশে যায়।

দরজায় শব্দ হতে অনিমেষ কপাট খুলল। এই হোস্টেলের কনিষ্ঠ চাকর চা নিয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা মাত্র ঝড়ের মতো টেবিলে কাপ রেখে উধাও হল। ইদানীং বাসি মুখে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের অভ্যেস পালটে যায়? এই যেমন, চিরকাল সে নিজের জামাকাপড় নিজেই ধুয়ে নিত, জলপাইগুড়িতে থাকার সময় এই অভ্যেসটা হয়ে গিয়েছিল। আগের হোস্টেলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এখানে এসে ওই ছোকরা চাকরটা যখন পাঁচ টাকার বিনিময়ে সারা মাস কাজ করে দেবে বলল তখন অনিমেষ রাজি হয়ে গেল। পাঁচটা টাকা অত্যন্ত মূল্যবান ওর কাছে তবু ওই সময়টুকু বাঁচিয়ে আলসেমি করার বিলাসিতা এখন ভাল লাগে।

এই হোস্টেলের চেহারা অবশ্য সব দিক দিয়েই আলাদা। নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি এখানে অনেকটাই শিথিল। এর একটা কারণ শুধু কলেজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এখানে আছে। এমন কেউ শুধু সন্ধেবেলায় আইন কলেজে পড়ার সুবাদে দিনে চাকরি করা সত্ত্বেও এ হোস্টেলের আবাসিক। স্কটিশ চার্চ কলেজ অবশ্য এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুপারিনটেনডেন্ট ভদ্রলোক ওখানকার অধ্যাপক কিন্তু এটাকে একটা ভাল মেস ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

চায়ের কাপ শেষ করতে না করতেই দরজায় শব্দ হল। এ-ঘরে সে একা। ছাদের ওপর এ রকম নির্জনে ঘর পাওয়া কপালগুণেই সম্ভব হয়েছে। মাঝে মাঝে অনিমেষের মনে হয়েছে ভাগ্যদেবী তাকে খানিকটা কৃপা করে থাকেন। এটা ভাবলে আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়ে যায়। অনিমেষ দরজা খুলে দেখল দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বলল, 'বাবু, এক বুড্ডা আপকো ঢুঁড়তা হ্যায়?'

'কাঁহা?

'গেটপর বৈঠা হ্যায়।'

কেন কোনও বৃদ্ধ তাকে খুঁজতে এসেছে বোধগম্য হল না অনিমেষের। কলকাতায় এমন কোনও

বৃদ্ধের সঙ্গে ওর আলাপ নেই যে এখানে আসতে পারে। দারোয়ানকে বৃদ্ধকে ওপরে পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে গিয়ে মত পরিবর্তন করে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তারপর ধীরেসুস্থে নিজেকে মার্জিত করে সে খানিকটা সময় নিয়ে একতলায় নেমে এল। একতলায় এখন দারুণ কর্মব্যস্ততা। বিরাট চাতালে বাসন মাজা চলছে সশব্দে। এই সকালেই বাথরুমে লাইন পড়ে গেছে। অনিমেষ বাইরের গেটের দিকে এগিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। দারোয়ানটা টুলে বসে খইনি টিপছিল, জিজ্ঞাসা করতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অনিমেষের মনে হল ওর বুকের মধ্যে একটা লোহার বল আচমকা লাফিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে দিয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কোনও রকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল সে কোনায় রকের দিকে। বৃদ্ধ নিজেকে গুটিয়ে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। তাঁর পাশে দুটো বড় ঝোলা, ময়লা ধুতির ওপর একটা সুতির কোট যার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। মাথা পরিষ্কার করে কামানো বলে মুখের চেহারাটা একদম বদলে গেছে। অনিমেষ কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। কোনও রকমে সে উচ্চারণ করল, 'আপনি ?'

বৃদ্ধ চোখ মেললেন, ঘোলাটে চোখ। দৃষ্টি যে স্বাভাবিক নয় বোঝা যায় এবং শরীরের কাঁপুনিটা স্পষ্ট। অনিমেষ একটু সচেতন হয়ে ঝুঁকে প্রণাম করতে যেতেই একটা হাত ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিল, 'না, অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।'

অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই শরীর শিহরিত হল। যেন অকস্মাৎ কেউ একটানা সমস্ত ছেলেবেলাটাকে তার সামনে হাজির করল। এই শরীরের সঙ্গে কোনও মিল নেই, কিন্তু ওই কথাগুলো শুধু সরিৎশেখরই অমন ভঙ্গিতে বলতে পারেন। কিন্তু দাদুর এ কী চেহারা হয়েছে! গত দু-তিন সপ্তাহ সে জলপাইগুড়ি কিংবা স্বর্গছেঁড়া থেকে কোনও চিঠিপত্র পায়নি। কিন্তু সরিৎশেখরের মতো মানুষ দুটো ঝোলা নিয়ে মাথা কামিয়ে এমন নোংরা পোশাকে ঘুরে বেড়াবেন—কল্পনাতেও আসে না। অনেকগুলো প্রশ্ন এখন জিভে কিন্তু অনিমেষ নিজেকে সামলে নিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি হাঁটতে পারবেন ?'

'আমি তো হেঁটেই এলাম,' সরিৎশেখর জানালেন।

অনিমেষ জানে শত অসুস্থ হলেও দাদু তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলার মানুষ নন। সে দুটো ঝোলা কাঁধে দিয়ে দাদুর হাত ধরল, 'উঠুন!'

সরিৎশেখর ক্লান্ত চোখে তাকালেন, 'তোমার ঘর কদ্দুর ?'

ততক্ষণে সরিৎশেখরের শরীরের কম্পন অনিমেষ প্রবলভাবে অনুভব করছে। এ অবস্থায় ওঁকে তিনতলায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ? কিন্তু এ ছাড়া এ হোস্টেলে অন্য ব্যবস্থা নেই।

অনিমেষ বলল, 'তিনতলায়। আপনি আস্তে আস্তে উঠুন।'

হাতের মুঠোয় উত্তাপ লাগছে, সরিৎশেখরের জ্বর এসেছে অবশ্যই। এই শরীর নিয়ে অনিমেষের হোস্টেল খুঁজে এলেন কী করে সেটাই বিস্ময়ের কথা। উনি আসবেন এ খবর কেউ তাকে জানায়নি। অনিমেষের মনে হল, এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে সরিৎশেখর চুপচাপ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু মাথা ন্যাড়া কেন ? আর যে লোকটি কলকাতায় দীর্ঘকাল আসেনি তাঁর পক্ষে এরকম অসুস্থ শরীরে রাস্তা চিনে এই অবধি আসা কী করে সম্ভব হল ?

সরিৎশেখর টলছিলেন। চাতালটার কাছাকাছি এসে অনিমেষ বুঝতে পারল ওঁর পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়। সেই লম্বা-চওড়া শরীরটা এখন কেমন গুটিয়ে ছোট হয়ে এসেছে। যাঁকে একদিন বিশাল মনে হত এখন তিনি অনিমেষের কাঁধের নীচে মুখ নামিয়েছেন। অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছিল অনিমেষের। হোস্টেলের যারা নীচে এসেছিল বিভিন্ন দরকারে তারা অবাক হয়ে ওদের দেখছে।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'অনিমেষবাবু ওঁকে কি আপনার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছেন ?'

অনিমেষ দেখল ওর পাশের ঘরের ছেলে তমাল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে।

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু উনি কি ওপরে উঠতে পারবেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। সে ঝোলা দুটো তমালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ধরুন, প্লিজ।'

তমাল ঝোলা দুটো নিতেই সে একটু ঝুঁকে সরিৎশেখরকে দু'হাতে তুলে নিল। ব্যাপারটা এমন ঘটল যে সরিৎশেখর চমকে উঠে প্রতিবাদ করলেন, 'আরে, তুমি ভেবেছ কী ? আমি ঠিক যেতে পারব।'

www.MurchOna.com

হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ বলল, 'পারতেন, কিন্তু এ ভাবে যাওয়া আরও সহজ হবে। আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।'

অতবড় মানুষটাকে কোলে করে তুলতে অনিমেষের নিশ্বাস অস্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এককালের দশাসই চেহারাটা এখন যতই গুটিয়ে যাক তবু ওজন কম নয়। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় অনিমেষ নিজের পায়ে আবার সেই যন্ত্রণা বোধ করল। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে খুব কিন্তু সেটা করতে গেলে দাদুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেটা সে কোনওমতেই হতে দিতে রাজি নয়।

সরিৎশেখর নাতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। অনেক পথ এই শরীর নিয়ে ভ্রমণের ফলে তাঁর চিন্তাশক্তি শিথিল হয়ে পড়ছিল। অনিমেষের হাতে তিনি নিরাপদ এই বোধটুকু তাঁকে আরও নিশ্চিন্ত করে ফেলায় তিনি বললেন, 'একটা কাল ছিল যখন তুমি আমার কোলে ধামসাতে, আমার কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াতে, আর এমন একটা কাল এল যখন আমি তোমার কোলে চেপে ওপরে উঠেছি। বিধাতার কী নিয়ম, সব শোধবোধ হয়ে গেল।'

নিজের বিছানায় দাদুকে শুইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অনিমেষের পক্ষে কথা বলা সম্ভব ছিল না। হালকা হলে মনে হল, ওর বুক টনটন করছে, ঘন ঘন বাতাস নিচ্ছিল সে। নিতে গিয়ে লক্ষ করল সমস্ত ঘর অগোছালো, ময়লা জামা-প্যান্ট থেকে শুরু করে কাগজপত্র এলোমেলো ছড়ানো। এ রকম ঘরে সরিৎশেখর কখনও বাস করেননি। এবং চেতনা ঠিক হলেই তিনি অনিমেষকে অবশ্যই এর জন্যে তিরস্কার করবেন। সেই অবস্থাতেই দ্রুত হাতে ঘরটাকে ঠিক করে ফেলল অনিমেষ। সরিৎশেখর বোধ হয় দীর্ঘদিন পর বিছানা পেয়ে আরাম বোধ করছেন। কারণ বালিশে মাথা রাখা মাত্রই তিনি নেতিয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ, ঘুম ঘুম ভাবটা বোঝা যায়। কপালে হাত রেখে অনিমেষ এবার নার্ভাস হয়ে পড়ল। থার্মোমিটার সঙ্গে নেই কিন্তু জ্বরটা যে বেশ জোরালো তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তমাল ঝোলা দুটো টেবিলে রেখে চুপচাপ দেখছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর নাকি?'

'হ্যাঁ। দুই তিন হতে পারে।' অনিমেষ অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

'আপনার কেউ হন উনি?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা।'

তমাল ব্যস্ত হল, 'তা হলে আর দেরি করা ঠিক নয়। আপনি ডাক্তার ডেকে আনুন।'

এই হোস্টেলেও একজন বাঁধাধরা ডাক্তার আছেন। অমনোযোগী হওয়ার ফলে তাঁর সম্পর্কেও ছেলেদের বিস্তর নালিশ। কিন্তু বিনাপয়সায় দেখানো যায় বলে ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিয়েছে। তাঁকে খবর দিলে আসতে কত বেলা করবেন সে জানে। তার চেয়ে হোস্টেলের পাশেই গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে একজন ডাক্তারকে প্রায়ই সে লক্ষ করে থাকে, তকেই ডাকলে ভাল হয়। ভদ্রলোকের চেম্বারে বেশ ভিড় হয় যখন তিনি নিশ্চয়ই ভাল ডাক্তার। কিন্তু দাদুকে এ অবস্থায় একা ফেলে যেতে মন চাইছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তমাল বলল, 'আমি আছি, আপনি তাড়াতাড়ি করুন।'

কৃতজ্ঞ হল অনিমেষ। মানুষকে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা কখনওই উচিত নয়। একটা মানুষের অনেকগুলো মুখ থাকে আর প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরনের। একটিকে দেখে অন্যটিকে ধারণা করতে গেলে ঠকতে হয়। তমাল ডিগবয়ের ছেলে। অবস্থাপন্ন। পাউডার-সেন্ট ছাড়া কোনওদিন ওকে বেরুতে দেখেনি অনিমেষ। হোস্টেলের চাকরবাকরদের টাকা ছড়িয়ে হাতে রেখেছে। এ রকম বড়লোকের দুলালদের আদৌ পছন্দ করত না অনিমেষ। তাই যতটা সম্ভব ওকে এড়িয়ে যেত। প্রায় সমবয়সী হলেও তমাল তাকে বাবু বলে সম্বোধন করে। ডাকটা কানে লাগে, বোধ হয় নৈকট্য-স্থাপন করতে না চাওয়ার এটা একটা চেষ্টা। অথচ আজ দাদুকে নিয়ে সে যখন বিব্রত তখন অন্য ছেলেদের আগে তমালই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

ডাক্তার সেনের চেম্বারে এই সকালে তিন চারজন লোক প্রতীক্ষায় বসে। ভদ্রলোক এখনও আসেননি। অনিমেষ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ ওর খেয়াল হল তার নতুন হোস্টেলের ঠিকানাটা দাদু পেলেন কী করে। মহীতোষ জানেন খুবই সম্প্রতি এবং জেনেই তিনি সরিৎশেখরকে জানিয়ে দেবেন এতটা ভাবা যায় না। ইদানীং দাদুকে সে অনিয়মিত চিঠি দিচ্ছিল। কেন আগের হোস্টেল ছাড়তে হল সে বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়ে চিঠি দেবে দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু দেওয়া হয়ে ওঠেনি। মহীতোষের পাঠানো আগের মাসের টাকাটা পুরনো হোস্টেলের ঠিকানায় এসেছে। তা হলে? দাদু কি ওখানে গিয়েছিলেন? তার নতুন ঠিকানা ওখান থেকে সংগ্রহ করে এখানে এসেছেন? অনিমেষের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

www.MurchOna.com

এর মধ্যে চেম্বারে রোগীদের উপস্থিতি বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের পাতা এবং বিভিন্ন জার্নাল অনেকের হাতে হাতে। কিছু পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। তিনি কোনও দিকে না তাকিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

অনিমেষ উঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য পা বাড়াতেই একটা লোক বাধা দিল, 'অপেক্ষা করুন, উনি স্লিপ অনুযায়ী ডাকবেন।'

স্লিপ! অনিমেষের খেয়াল হল রোগীরা এসেই নিজের নাম লেখা কাগজ এই লোকটির হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেটার যে এতখানি প্রয়োজন তখন খেয়াল করেনি। তিন-চার জনের পরেই সে এখানে এসেছে, নতুন করে স্লিপ দিতে গেলে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে।

ব্যাপারটা বলতেই লোকটি জানাল, 'কিন্তু আমি কী করব বলুন। কেউ যাতে রাগ না করতে পারে তাই ডাক্তারবাবু এ নিয়ম করেছেন।'

'কিন্তু আপনি তো দেখেছেন যে আমি অনেক আগে এসেছি।'

'সে কথা অন্য লোক মানতে চাইবে কেন?'

'বেশ, আমি তো রোগ দেখাতে আসিনি। ওঁকে আপনি বলুন আমি শুধু একটা কথা বলব।' অনিমেষ আবেদন করল।

'না মশাই, ও সব ভাঁওতা দিয়ে ঢুকে অনেকেই রোগের কথা বলে।' লোকটা সামনে থেকে সরে গিয়ে স্লিপ সাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার রক্ত চড়ে গেল অনিমেষের। দ্রুত পা চালিয়ে ছোট ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। পেছনের লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়ে শেষতক সামলে নিয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। অনিমেষ ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধূপকাঠি জ্বেলে চোখ বন্ধ করে কিছু আওড়াচ্ছেন। ব্যবসা শুরু করার আগে ঠাকুর-প্রণাম বোধ হয়।

অনিমেষ একটু অপেক্ষা করে বলল, 'মাফ করবেন, আমি তিনজনের পর এসেছি কিন্তু স্লিপ দেওয়ার নিয়মটা জানতাম না। অথচ একজন ডাক্তারের প্রয়োজন খুবই। তাই আইনটা ভাঙতে হল।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে একবার দেখে শেষে মাথা নেড়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী?' লোকটি বলতে যাবার আগেই অনিমেষ বলল, 'আমার দাদু অত্যন্ত অসুস্থ, কাছেই, আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'ইম্পসিব্‌ল।' প্রৌঢ় খুব বিরক্ত হল, 'সকালে এত রোগী ফেলে আমি কলে যেতে পারব না। ইউ ফাইন্ড সাম আদার ডক্টর।'

'আপনার দশ মিনিটও ব্যয় হবে না। অনুগ্রহ করে চলুন। এখানে আর কে ডাক্তার আছেন জানি না।'

'কেন সময় নষ্ট করছেন? দশ মিনিটে আমি তিনটে পেশেন্ট দেখতে পারব। প্লিজ গো আউট।' হাত বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তার।

জেদ চেপে গেল অনিমেষের। সে টেবিলের প্রান্তে দু'হাত ধরে বলল, 'কিন্তু আমার দাদু খুব অসুস্থ, আপনাকে যেতে হবে।'

'যেতে হবে? গায়ের জোর দেখাচ্ছেন?' ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'যদি তাই মনে করেন আমি নিরুপায়।' অনিমেষ চোয়াল শক্ত করল।

'ইজ ইট সো? আমি আপনাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে পারি তা জানেন? আপনি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে ভয় দেখাচ্ছেন।'

'আপনি যাই ভাবুন কিন্তু সেটা পরে ভাববেন। দশ মিনিট যদি ব্যয় করেন তা হলে এমনকিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি যদি চান তা হলে বাইরের ভদ্রলোকদের কাছে আমি সময়টা চেয়ে নিতে পারি।'

'নো, নেভার। একবার কলে গেলে সেটা উদাহরণ হয়ে থেকে যাবে। আমি দুপুরে যাওয়ার সময় যেতে পারি।'

'তখন যদি পেশেন্ট মরে যায়!'

'কান্ট হেল্প।'

'আপনি কিন্তু আমাকে উত্তেজিত করছেন।' অনিমেষের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, 'হোস্টেলের ছেলেরা জানলে আপনি বিপদে পড়বেন।'

www.MurchOna.com

'হোস্টেল! এর মধ্যে হোস্টেল আসছে কোত্থেকে ?'

'আমি হোস্টেলে থাকি। সেখানেই আপনাকে যেতে হবে। চিরকাল যেভাবে টাকা রোজগার করে এসেছেন এবার তার ব্যতিক্রম করতে হবে।'

'সমাজ সংস্কারক মনে হচ্ছে! কমিউনিস্ট নাকি ?'

'আপনি মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছেন।'

'কী আশ্চর্য। এত ডাক্তার থাকতে আমাকে নিয়ে—তা কী হয়েছে—আপনার পেশেন্টের ? সিরিয়াস ব্যাপার হলে হাসপাতালে রিমুভ করুন।'

'সেটা ওঁকে দেখে আপনি বলবেন। বয়স হয়েছে, খুব জ্বর আর মনে হচ্ছে ভীষণ দুর্বল। রোগটা বুঝতে পারলে আপনার কাছে আসব কেন ? নিন, উঠুন।' প্রায় ধমকের গলায় কথাটা বলতে ভদ্রলোক নার্ভাস হয়ে গেলেন। অনিমেষ ততক্ষণে চেম্বার ছেড়ে ভিজিটার্স রুমে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের উত্তেজিত কথাবার্তা এখানকার মানুষগুলো নিশ্চয়ই শুনেছেন কারণ তাঁরা অবাক চোখে অনিমেষকে দেখছেন। অনিমেষ হাতজোড় করে বলল, 'দেখুন, আমি আপনাদের কাছ থেকে মাত্র দশ মিনিটের জন্য ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার দাদু অত্যন্ত অসুস্থ। হয়তো আপনাদের একটু অসুবিধে হবে কিন্তু দয়া করে মার্জনা করবেন।'

কেউ কেউ উসখুস করলেও মুখে আপত্তি প্রকাশ করল না।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে অনিমেষ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে হোস্টেলে পৌঁছে গেল। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত চেম্বার থেকে বেরুবেন কি না এ সন্দেহ ছিল কিন্তু হোস্টেলের নাম করতে যে এতটা কাজ হবে বোঝা যায়নি।

হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'হোস্টেল থাকেন সে-কথা প্রথমে বললেই তো হত।'

'কেন ?'

'কিছু মনে করবেন না, হোস্টেলের ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে খুব রাগারাগি করে। তা আপনাদের তো একজন ডাক্তার আছে!'

'তিনি এত তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন না।'

ঘরে ঢুকে অনিমেষ অবাক হল। তমাল সরিৎশেখরের কপালে জলপটি লাগিয়ে পাশে বসে মাথায় পাখার হাওয়া করে যাচ্ছে। ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে জ্বরটা আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

কালবিলম্ব না করে ডাক্তার পরীক্ষা করতে বসে গেলেন।

ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অনিমেষ ভাবল এবার তমালকে ছুটি দেওয়া উচিত। কথা বলতে গিয়েও সঙ্কোচ হল। কেউ যদি খুব আন্তরিক হয় তার সঙ্গে ভদ্রতা করাটা অনেক সময় অত্যন্ত বেমানান দেখায়।

ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ পরক্ষিা করার পর ব্যাগ খুলে একটা সিরিঞ্জ বের করে ইঞ্জেকশন দিলেন। সামান্য যে ব্যথাটুকু লাগল তাতেই দাদু চোখ খুলে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনিমেষ বুঝতে পারছিল যে ওঁর চেতনা আর দখলে নেই। হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগল অনিমেষের। যদি কিছু হয়ে যায় ? দাদু নেই এ কথা ভাবতেই বুকে কাঁপুনি এসে গেল। এই মানুষটার কাছে যে এমন ঋণবদ্ধ যে এঁকে ছাড়া কিছু ভাবা অসম্ভব। তার সমস্ত ছেলেবেলা এই মানুষটা নিজের ইচ্ছে মতো সাজিয়ে দিয়েছেন। তার চিন্তা, মানসিক প্রকাশ এঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এক সময়। এখন সেটা যতই নিজের পথে চলুক, মূল ব্যাপারটায় দাদু এখনও জড়িয়ে আছেন। অনেক অনেকদিন পরে সেই ছেলেবেলার স্মৃতিটা ভেসে এল। কোনও আশঙ্কার সামনে দাঁড়ালে একটা লাইন স্মরণ করে কপালে তিনবার মা অক্ষর লিখে চোখ বন্ধ করে প্রণাম করত। ছেলেবেলায় এটা দারুণ কাজ করত। নিজের অজান্তে অনিমেষ এতদিন পরে তার পুনরাবৃত্তি করল। ওঁ, ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তার আগ্রহ বা ভক্তির কোনও প্রকাশ কলকাতায় এসে ঘটেনি। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। মার্কস কিংবা লেনিন পড়ার সময় এই সব সংস্কারগুলোকে সে নির্মমভাবে সরিয়ে দিয়েছে। একজন মাও সে-তুং কিংবা হো চি মিনের জীবনে অন্য ধর্মবিশ্বাসের কোনও প্রয়োজন নেই। অথচ রক্তে ডুবে থাকা এই সংস্কার হঠাৎ নিজের অজান্তে ভুস করে মাথা তুলল। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেতেই সজাগ হল অনিমেষ। তমাল বলল, 'ভয় পাবেন না, উনি জলে পড়ে নেই।'

ডাক্তার কোনও কথা বলছিলেন না। এর মধ্যে প্রায় পনেরো মিনিট সময় চলে গেছে। শেষ

পর্যন্ত পালস্ দেখে ভদ্রলোক সহজ হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিমেষকে বললেন, 'মনে হয় খুব টর্চার করেছেন। ইঞ্জেকশনটায় কাজ হয়েছে, এখন স্বাভাবিকভাবে ঘুমোবেন। আমি যে ওষুধ লিখে দিচ্ছি সেগুলো খাইয়ে কাল রিপোর্ট করবেন।'

প্রেসক্রিপশন লেখার সময় অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ভয়ের কিছু আছে?'

ডাক্তার লেখা শেষ করে বললেন, 'ছিল। হরলিক্স, বিস্কুট আর মিষ্টি ফল ছাড়া আজকে কিছু দেওয়ার নেই। মনে হচ্ছে তিন-চারদিন কিছুই খাননি আর খুব পরিশ্রম করেছেন। আচ্ছা চলি।'

প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে অনিমেষ ড্রয়ার খুলে টাকা বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ফিস কত আমি ঠিক জানি না —।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'পড়ো না চাকরি করো?'

'পড়ি।'

'আমি চেম্বারে বত্রিশ টাকা নিই। কলে গেলে ডাবল হয়। আমাকে টাকা দেখাতে এসো না ছোকরা। দশ টাকা দাও।' বিস্মিত অনিমেষের হাত থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'ক্লাশ কামাই করো। অন্তত একটা দিন এঁকে সব সময় চোখে রাখা দরকার।' ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে বললেন, 'আর হ্যাঁ, তোমার রাস্তাটা সবাইকে শিখিয়ে দিয়ো না।'

তমাল ওঁকে পৌঁছতে নীচে নেমে গেল অনিমেষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আর একবার মানুষের অন্য মুখ দেখল সে।

ওষুধপত্র আনিয়ে অনিমেষ দাদুর পাশে বসে বাতাস করছিল। সকালে যে সময়টা কাটছিল না সেট এখন দৌড়ে যাচ্ছে। এখন দুপুর। হোস্টেল ফাঁকা। বারোটার ক্লাশটা করা হল না। আজ সকালে যে তাগিদ বুকের মধ্যে ছটফট করছিল সেটা এখন মিইয়ে গেছে। মাধবীলতাকে দেখার ইচ্ছের চেয়ে এই বৃদ্ধের পাশে বসে থাকতে বড় আরাম হচ্ছিল। দাদুর কথাটা মনে পড়ল, সব শোধবোধ হয়ে গেল। মাথা নাড়ল অনিমেষ, না, কখনওই শোধ হয় না।

দুপুর ঘন হলে সরিৎশেখর চোখ খুললেন। নাতিকে দেখে ধীরে ধীরে বললেন, 'অনি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম, না?'

অনেকদিন পর অনিমেষ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

## সতেরো

সন্ধে নাগাদ সরিৎশেখরকে খানিকটা সুস্থ দেখাচ্ছিল। সারাদিন জল আর বিস্কুট ছাড়া কিছু খাননি। অনিমেষ জোর করে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিলে বৃদ্ধের গলার স্বর একটু স্বাভাবিক হল। সরিৎশেখর বললেন, একটু বাথরুমে যাবেন।

সারাটা দিন শুয়েই কাটিয়েছেন তিনি, ওঠার কোনও কারণও ছিল না। ওরকম জ্বরো রোগী যে হেঁটে চলে বেড়াবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষের খেয়াল হল যে দাদু একবারও বাথরুমে যাননি। এবং কথাটা শোনামাত্র সে বিচলিত হয়ে পড়ল। ওদের এই হোস্টেলের বাথরুম-পায়খানা খুব সভ্য ধরনের নয়। এতগুলো মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হয়তো কিছু সুবন্দোবস্ত করা যেত কিন্তু তার সুরক্ষা সম্ভব নয়। প্রতি তলায় একটা করে ঘেরা জায়গা আছে ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্যে কিন্তু বৃহৎ ব্যাপারের ব্যবস্থা নীচে। জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমন স্যাঁতসেঁতে। আগের হোস্টেলটা এ সব ব্যাপারে অনেক ভদ্র ছিল। কিন্তু এই বাড়িটা এত প্রাচীন এবং কিছুটা রহস্যময় ভঙ্গিতে গঠিত যে এর উন্নতি করা অসম্ভব। জলপাইগুড়ি থাকতে যে মানসিক গঠন ও অভ্যাস অনিমেষের ছিল কলকাতার হোস্টেলে থাকতে এসে তা কিছুটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। ওটা এমন বয়স যা সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে। এখন এগুলোর গুরুত্ব সারাদিনের জীবনে এত কম যে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার বোধ করেনি অনিমেষ। মনে পড়ে, প্রথম দিন এক ঘরে অপরিচিত ছেলের সঙ্গে থাকতে হবে জেনে চোখে জল এসে গিয়েছিল। সারাটা ছেলেবেলা সে কারও সঙ্গে ভাগ করেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে তো তাও অভ্যেস হয়ে গেল।

কিন্তু সরিৎশেখর কী করে এই রকম ব্যবস্থা মেনে নেবেন? সারাটা জীবন যে মানুষ সাহেবদের সঙ্গে কাটিয়ে মানসিকভাবে কতগুলো রুচি মেনে চলেন, তাঁর পক্ষে এই ধরনের বাথরুম ব্যবহার করা অসম্ভব। হয়তো ভেতরে ঢুকেই বেরিয়ে আসবেন। কী করা যায় বুঝতে পারছিল না অনিমেষ।

সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপর দাদুকে সযত্নে ধরে ধরে সামনের ছাদে নিয়ে গেল। কোনার দিকে দুটো দিক দেওয়াল ঘেরা জায়গাটায় পৌঁছে বলল, 'এখানেই সেরে নিন।' ভেতরে দুটো সিমেন্ট লাগানো ইট ছাড়া কিছু নেই।

অনিমেষ যা আশঙ্কা করছিল তাই হল, সরিৎশেখর বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখানে জলের কল নেই?'

'না। মানে, এটা খুব প্রয়োজনের জন্যে। রোজ জমাদার এসে ধুয়ে দিয়ে যায়।' অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল।

'কিন্তু জল না হলে হাত ধোব কী করে?' সরিৎশেখর অবাক।

অনিমেষ এক ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে সেটা আবার সরিৎশেখরের কাছে নিয়ে এল। ব্যাপারটা দেখে সরিৎশেখর হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'তুমি খাওয়ার জলে শৌচ কর নাকি আজকাল? ছি ছি!'

অনিমেষ বলল, 'আপাতত এই জলে কাজ মিটিয়ে নিন, আমি ভাল করে ধুয়ে রাখব।'

ঘরে ঢুকে সরিৎশেখর বললেন, 'শিক্ষা মানুষকে এমন নোংরা করে ভাবতে পারি না। তোমাকে এতদ্দিন আমি কী শেখালাম!'

অনিমেষ বলল, 'এখানে আমি একা কী করব? যেমন পরিবেশ তেমন ভাবেই চলতে হচ্ছে।'

'তোমরা হোস্টেলের মালিককে বলো না কেন?'

'কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না দাদু।'

'বাঃ, চমৎকার। সভ্য সমাজের মিনিমাম প্রয়োজন সম্পর্কেও তোমরা এত উদাসীন? মাঝরাতে পেট খারাপ হয় না কারও?' সরিৎশেখর কড়া চোখে নাতিকে দেখলেন।

'আপনি এ রকম পরিবেশে তো কখনও থাকেননি তাই চোখে লাগছে। কলকাতা শহরের লোক এ সবে অভ্যস্ত।' জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বলল অনিমেষ। কিন্তু বলার সময়েই সে বুঝতে পারছিল দাদু তার এ সব কথায় কোনও আমল দেবেন না। বাথরুমে এই, পায়খানায় ঢুকতে গেলে দাদু যে কী কাণ্ড করবেন ভাবতেই শক্ত হয়ে গেল। আসলে এ সব খামতি নিজের চোখে ঠেকেনি কিংবা ঠেকলেও পাত্তা পায়নি।

সরিৎশেখর বললেন, 'এই ঘরে তুমি থাকো?'

অবাক হল অনিমেষ। এ কী রকম কথা? অন্যের ঘরে কি সে দাদুকে থাকতে বলবে? তবু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে ঘাড় নাড়ল।

'এ ভাবে তোমার থাকতে ইচ্ছে করে?'

অনিমেষ ঘরটার দিকে তাকাল। রোজ দেখে অভ্যস্ত চোখে ঘরটা একই আছে। সে বলল, 'এই ঘরটাই সবচেয়ে নিরিবিলি।'

'আমি সে-কথা বলছি না। বিছানার চাদরটা ক' মাস কাচোনি? বালিশের ওয়াড়টার চেহারা দেখেছ? ওখানে মুখ রাখতে তোমার প্রবৃত্তি হয়? বইপত্তর স্তূপ করে ছড়ানো, এখানে ওখানে জামা ঝুলছে, দেওয়ালে ঝুল। একটা মানুষের রুচি তার শোয়ার জায়গায় ফুটে ওঠে। তাই না?' সরিৎশেখর নিজের ঝোলাটা এগিয়ে দিলেন, 'এতে একটা চাদর আছে, তাই পেতে দাও।'

অনিমেষ খুব অসহায় বোধ করছিল।

সে যতটা সম্ভব গোছগাছ করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও দাদু এগুলো আবিষ্কার করলেন। বিছানার চাদর তার দুটো, আর একটা সেট বালিশের ওয়াড় ধোব ধোব করে ধোওয়া হয়নি। অনিমেষের চোখে এগুলো তেমন নোংরা নয়। এ হোস্টেলেরই অনেক ছেলে আছে খুব সাজগোজ করে থাকে। এমনকী ফুলদানি এবং ধূপ জ্বালার শখও আছে অনেকের। ওরকম মেয়েলি স্বভাব অনিমেষ রপ্ত করতে পারেনি।

মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে দাদুকে শুইয়ে দিয়ে অনিমেষ বলল, 'আপনি একটু বিশ্রাম নিন, আমি ঘুরে আসছি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আজ তো তোমাকে ক্লাশ করতে দিলাম না, সন্ধেবেলায় পড়তে বসবে না?'

কথাটা শুনে অনিমেষের মজা লাগল। কলকাতায় আসার পর তাকে কেউ পড়তে বসার কথা বলেনি। অথচ ওই একটা কথায় দাদু সমস্ত ছেলেবেলাটাকে সামনে এনে দিলেন। এই মানুষই সন্ধেবেলায় চিৎকার করে না পড়লে এমন শাসন করতেন যে অনিমেষ তটস্থ থাকত। দাদুকে সে এখন কী করে বোঝাবে যে পড়াশুনো ব্যাপারটা সময় মেপে করার অভ্যেসটা আর নেই। প্রয়োজনমতো সেটা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

www.MurchOna.com

অনিমেষ মুখে কিছু বলল না। হাত বাড়িয়ে সরিৎশেখরের কপাল স্পর্শ করে বলল, 'নাইন্টি নাইনের বেশি হবে না। এখন চুপ করে শুয়ে থাকুন। অনেক কথা বলেছেন। আমি ডাক্তারকে রিপোর্ট দিয়ে আসি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'বড্ড কড়া ওষুধ এনেছ, মাথা ঝিমঝিম করছে।'

অনিমেষ বলল, 'ডাক্তারকে বলব।'

ঘরের দরজা ভেজিয়ে সে ভাবল তমালকে একবার খোঁজ করবে কি না। বুড়ো মানুষটাকে একদম একা রেখে যেতে মন চাইছে না। তারপর মত পালটাল। এই সন্ধেছোঁয়া সময়টা কোনও জোয়ান ছেলে হোস্টেলে পড়ে থাকে না। আর থাকলেও তাকে এক অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে বসিয়ে রেখে যাওয়া অন্যায় হবে। তমাল নিজে আজ সকালে যা করেছে তাই অনেক।

নীচের গেটে সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই প্রবীণ অধ্যাপকটির ওপরে যদিও হোস্টেলের দায়িত্ব কিন্তু কোনও ব্যাপারে নাক গলান না। এমনকী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছেলেদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রতি মাসে একজন করে ম্যানেজার ঠিক করে দেন, সেই চালায়। দাদু ওর ঘরে আছেন এই খবরটা নিজে থেকে ভদ্রলোককে দেওয়া উচিত, যদিও এরকম চালু আইনটা কেউ বড় একটা মানে না। অনিমেষকে দাঁড়াতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে? ও হ্যাঁ, তোমার ঘরে একজন অসুস্থ বৃদ্ধ এসেছেন শুনলাম। তিনি কে হন তোমার?'

'আমার ঠাকুরদা।'

'কেমন আছেন এখন?'

'ভাল।'

'ওঁর তো এখানে থাকতে অসুবিধে হবে। তোমার কলকাতা শহরে আর কোনও আত্মীয় নেই?'

'না। উনি একটু সুস্থ হলেই চলে যাবেন। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'ঠিক আছে।' ভদ্রলোক চলে যেতে অনিমেষের খেয়াল হল সারাদিনে দাদুকে জিজ্ঞাসাই করা হয়নি কী কারণে তিনি মাথা ন্যাড়া করে একা একা কলকাতায় এলেন? আশ্চর্য! সে যে কেন একটুও প্র্যাকটিক্যাল হতে পারল না আজও!

ডাক্তার চেম্বারেই ছিলেন। ভদ্রলোকের পসার খুব জমজমাট। কলকাতা শহরের মানুষের রোগ বোধ হয় লেগেই থাকে। এবং এতে ডাক্তাররা খুশিই হন। অপেক্ষারত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে অনিমেষের মনে হল, আচ্ছা, যদি আজ এঁদের সবাই সুস্থ থাকতেন তা হলে ডাক্তারের মন কেমন থাকত? অর্থের জন্যে মানুষের মন সব সময় নিম্নগামী হয়।

সকালে যে লোকটা তাকে আটকেছিল সে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। বেশ খাতিরে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?'

এইসব ন্যাকামো অনিমেষের সহ্য হচ্ছে না আজকাল। সে এখানে বেড়াতে আসেনি জেনেও এ ধরনের প্রশ্নের কোনও মানে আছে? বাজারের থলে হাতে দেখেও কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কী বাজারে যাচ্ছেন, তখন ন্যাকামো ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। অনিমেষ মুখে কিছু না বলে ঘাড় নাড়ল।

'পাঁচ মিনিট দাঁড়ান। ডাক্তারবাবু একজনকে চেক করছেন, মেয়েছেলে তো! বসুন না, ওখানে বসুন।' লোকটা ব্যস্ততা দেখাল।

'ঠিক আছে।' অনিমেষ ওকে এড়াতে সামনের টেবিল থেকে ম্যাগাজিন তুলে চোখ রাখল। আজ সকালে এই লোকটা তাকে পাত্তা দিয়ে চায়নি আর এখন খাতির করছে কেন? ঘরে এখন কমসেকম বারো জন লোক, সিরিয়ালি এলে ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে হতে পারে, অথচ লোকটা বলল পাঁচ মিনিট দাঁড়ান! তার মানে নিয়ম ভাঙবে লোকটা। তখন যদি সবাই প্রতিবাদ করে—। অনিমেষ ঠিক করল কেউ কিছু বললে সে ভেতরে ঢুকবে না। ঘণ্টা দুই পরে ঘুরে আসবে।

কিন্তু ভদ্রমহিলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকটা যখন হাত নেড়ে তাকে ভেতরে যেতে বলল তখন কেউ আপত্তি করল না। এতকাল শুনে এসেছে অসুস্থতা মানুষকে অধৈর্য করে, কিন্তু এঁরা বেশ চুপচাপ।

পরিশ্রম করে ডাক্তার একটু আরাম করছিলেন সিগারেট ধরিয়ে, অনিমেষকে দেখে ভ্রু কোঁচকালেন, 'ও তুমি! কতক্ষণ এসেছ?'

'এইমাত্র।' অনিমেষ বসল না। কারণ বসার মতো সময় নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কেমন আছেন?'

www.MurchOna.com

'এখন একটু ভাল। জ্বর কম কিন্তু খুব দুর্বল বোধ করছেন। ওষুধগুলো খুব কড়া বলছিলেন।' অনিমেষ বলল।

'পেচ্ছাপ হয়েছে?'

'একবার, বিকেলে।'

'শোনো ওঁর বয়স হয়েছে। আজ যদি জ্বর চলে যায় তো ভাল কিন্তু আবার যদি আসে তা হলে তুমি ম্যানেজ করতে পারবে না। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি তো আছেই, মনে হয় ক'দিন কিছু খাননি। আবার যদি জ্বর আসে ব্লাড আর ইউরিন পরীক্ষা করিয়ে নেবে। প্রেসক্রিপশনটা দাও।' হাত বাড়ালেন ডাক্তার।

অনিমেষ পকেট থেকে কাগজটা বের করে এগিয়ে দিতে তাতে খস খস করে কয়েকটা শব্দ লিখে ফেরত দিলেন, 'দুটো ওষুধ চেঞ্জ করে দিলাম। আজ রাত্রে হরলিক্স আর সন্দেশ দেবে; দুধ সহ্য নাও হতে পারে। কাল যদি জ্বর না থাকে এই ফুডগুলো দেবে। ঠিক আছে।' মাথা নেড়ে ওকে বিদায় করতে চাইলেন ডাক্তার।

অনিমেষ ওষুধগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে ভাবছিল, যেগুলো সকালে কেনা আছে সেগুলো কী করবে জিজ্ঞাসা করা উচিত কিনা! কিন্তু কথা না বাড়িয়ে সে দরজার দিকে ফিরতেই শুনল, 'হোস্টেলে কোনও বৃদ্ধ রোগীর দেখাশোনা হয় না। ওঁকে অন্য কোথাও শিফট কর। আর আমার চেম্বারে একটা ফোন আছে। এ ভাবে হুটহাট চলে আসার চেয়ে টেলিফোনে কথা বললে ভাল হয়।'

কথাটা চুপচাপ শুনল অনিমেষ। অন্যায় কিছু বলেননি ডাক্তার। অন্য সময় সে কী করত বলা যায় না, এখন মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকেছে। আজ সকালে ওষুধপত্র কিনতে বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে। বাবা যে টাকা পাঠান তাতে সব খরচ মিটিয়ে সামান্যই নিজের জন্যে থাকে। এখানে আসার পর কোনও বড় রকমের অসুখ-বিসুখ করেনি তার, বাড়তি খরচের প্রশ্ন ওঠেনি। অনেকে বাড়ি থেকে পাঠানো টাকার কিছু কিছু প্রতি মাসে জমিয়ে রাখে। অনিমেষের ক্ষেত্রে সে কথা ওঠে না।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সামনের ওষুধের দোকানে গিয়ে প্রেসক্রিপশনটা দেখাতে আরও কিছু টাকা চলে গেল। তার কাছে বড় জোর কুড়িটা টাকা পড়ে আছে। মাসের একেবারে শেষ হলে দুটো টাকাও থাকত না। অনিমেষ ভাবছিল, দাদু নিশ্চয় বেশিদিন থাকবেন না। কিন্তু বাকি মাসটা কীভাবে চালাবে! বাবার কাছে নতুন করে টাকা চেয়ে চিঠি দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু চিন্তা করতে গিয়ে অনিমেষ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে থতমত হয়ে গেল: পৃথিবীতে তার যদি সবচেয়ে আপন বলে কেউ থাকে তা হলে সরিৎশেখর। ছোটবেলায় এই মানুষটিকে ঘিরে সে কত রকমের স্বপ্ন দেখত। বাবা, ছোটমা কিংবা পিসিমা হেমলতাও সেই স্বপ্নের ধারেকাছে আসতে পারেননি কখনও। আর আজ অসুস্থ সরিৎশেখর মাত্র একটা দিন তার কাছে এসে ওঠায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। অনিমেষ নিজেকে শাসন করল। দাদু এত জায়গা থাকতে তার কাছে এসে উঠেছেন এটাই ভাগ্যের কথা। তাঁর জন্যে যদি খরচ হয় তো হোক। নিজের কাছে না থাকলে হোস্টেলের ছেলেদের কাছে ধার করলে চলবে। আর কেউ না থাক পরমহংস আছে। টিউশনির টাকা জমিয়ে রাখে ও। চাইলে নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু এ ঘটনা থেকে একটা সত্য খুব জোরালো হল অনিমেষের কাছে। না, আর ঢিলেমি নয়, এবার কিছু টাকা রোজগার করতেই হবে। টিউশনির কপাল সবার থাকে না। তা ছাড়া অন্য লোকের বাড়ির মর্জি মতন পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

হাতিবাগানের মোড়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিল অনিমেষ। এখন, এই সন্ধেবেলায় বেশ ভিড় হয়। মেয়েরাই কেনাকাটা করতে অথবা দোকান দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। অনিমেষের এ সব দিকে খেয়াল ছিল না। কিছু একটা গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেই এ রকম হয়। আশেপাশের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। ওই অবস্থায় মনে হল কেউ যেন তাকে ডাকছে। তারপর আচমকা কারও হাতের ঝাঁকুনিতে ও সজাগ হল। চমকে যাওয়া ভাবটা সামলে পেছনে ফিরে ও সত্যি অবাক হল।

'তুমি কী তোমার মধ্যে ছিলে? কী ভাবছিলে এত?'

'একী সারপ্রাইজ সুবাসদা। কোত্থেকে এলে?'

'বেলগাছিয়ায় গিয়েছিলাম। ট্রাম থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে নেমে এলাম। তখন থেকে নাম ধরে চেঁচাচ্ছি কোনও সাড়া নেই। অসুখ-টসুখ আছে নাকি?'

অনিমেষ লজ্জা পেল, 'না না। আসলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম এই আর কি। আঃ, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু তুমি যে কলকাতায় আছ তাই জানতাম না। বিমানদা

www.MurchOna.com

বা সুদীপ—কেউ তো বলেনি।'

'বলেনি, হয়তো বলতে ইচ্ছে হয়নি কিংবা ভুলে গেছে।' সুবাস যেন হাসল।

কথাটা কেমন বেসুরো লাগল কানে, অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সব কথা না বোঝাই ভাল। অনেক সময় বুঝতে না চাইলে উপকার হয়। তার চেয়ে চলো আমরা একটু চাই খাই। সেই বিকেল থেকে ঘুরছি, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ওই তো একটা চায়ের দোকান, চলো।' সুবাস অনিমেষের হাত ধরে রাস্তা পার হবার জন্য এগোল।

সুবাসদার কথাবার্তা একটু অন্যরকম। অনিমেষের মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে। সুবাসদাকে ওর ভাল লাগে। বলতে গেলে কলকাতায় পা দিয়েই সুবাসদার সঙ্গে তার যোগাযোগ। বোধ হয় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে সেদিন বাঁচিয়েছিল সুবাসদা। লোকটা খুব চাপা এবং কারও ব্যাপারে নাক গলাতে ভালবাসে না।

কিন্তু এখন চায়ের দোকানে বসলে হোস্টেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যদিও এর পরে দাদুকে ওষুধ দিতে হবে রাত দশটা নাগাদ তবু অতক্ষণ একা একা থাকতে ওঁর অসুবিধে হতে পারে। কাউকে বলেও আসা হয়নি। দেরি করে হোস্টেলে ফিরলে দাদু অসন্তুষ্ট হবেন। ভাববেন এই রকম সময়ে ফেরা ওর নিয়মিত অভ্যেস।

রাস্তা পার হতে হতে অনিমেষ মনে মনে হেসে ফেলল। স্কুলে পড়ার সময় দাদুর ভয়ে সন্ধের আলো জ্বলবার আগেই খেলার মাঠ থেকে দৌড় শুরু করত বাড়িতে ফেরার জন্যে। আলো জ্বলে গেলে বুক ধড়াস ধড়াস করত শাস্তি পাওয়ার ভয়ে। সেই ব্যাপারটাই যেন এতদিন বাদে কলকাতায় তার কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু সুবাসদাকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারত সে ডাক্তারের দেখা পেয়েছে স্বাভাবিকভাবে দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর। তা হলে তো সেই দেরি হতই যার জন্যে কিছু করার ছিল না তার। মনে মনে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল অনিমেষ। অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি করে ফিরলেও ম্যানেজ করা যায়।

রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দুটো বসার জায়গা জোগাড় করল ওরা। একই টেবিলে অন্য লোক রয়েছে। তারা যে কথা বলছে তা স্বাভাবিকভাবে এমন চেঁচিয়ে বলার নয় তবু অনর্গল বলে যাচ্ছে। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ করেছে অনিমেষ। ট্রামে বাসে মানুষেরা এমন স্বচ্ছন্দে পারিবারিক গল্প করে যে মনে হয় সেখানে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। ট্রাম-বাসের ঠাস ঠাস ভিড় যেন নির্জন গাছের মতো।

দুটো চা বলে সুবাসদা নিচুগলায় বলল, 'এখন কী করছ ?'

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না অনিমেষ। ছাত্র হিসেবে তার এখন পড়াশুনা করার কথা। তবু এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই অকারণ নয়। ইঙ্গিতটা অনুমান করলেও এড়িয়ে গেল অনিমেষ। মুখে কিছু না বলে হাসল।

সিগারেট ধরিয়ে সুবাসদা বলল, 'তোমাদের ইউনিয়নের কাজকর্ম কেমন চলছে ?'

'ভালই। আসলে ছাত্রদের দাবিদাওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে ভি সি-র কাছে যাওয়া আর শ্লোগান দেওয়া ছাড়া ইউনিয়নের কাজকর্ম আর কী আছে বলুন ?'

দিয়ে-যাওয়া-চায়ে চুমুক দিল অনিমেষ। দিয়ে মনে পড়ল আজ বিকেলে তার চা খাওয়ার কথা খেয়ালই ছিল না।

'তুমি পার্টির অফিসে যাচ্ছ না ?'

'দু' তিন দিন গিয়েছিলাম; ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না, আমি বোধ হয় গায়ে পড়ে আলাপ করতে পারি না—তাই।'

'কয়েকদিন আগে পুলিশের গুলিতে দু'জন কমরেড খুন হয়। তোমরা এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট করেছিলে, কেমন হয়েছিল ?'

'স্যাকসেসফুল। আসলে এ সব ছুতো পেলে ছাত্ররা ক্লাশে ঢোকার দায় থেকে বাঁচে, তা সে যেই ডাকুক না কেন!' অনিমেষ বলল।

'কিন্তু ধর্মঘটটা করলে কেন ?'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল, 'মানে ?'

'কত লোক তো প্রতিদিন খুন হচ্ছে সেজন্যে তো তোমরা ধর্মঘট করছ না! এই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবী খুন হলেন, তোমরা কোনও প্রতিবাদ করনি, এখন করলে কেন ?'

অনিমেষ সুবাসদার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থটা ধরতে চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হল। সে বলল,

www.MurchOna.com

'এ তো সোজা কথা। যে দু'জন মারা গেছে তারা পার্টির লোক আর আমাদের ছাত্র সংগঠন সেই পার্টির মতবাদে বিশ্বাস করে তাই প্রতিবাদ জানানো দরকার ছিল।'

'বেশ বেশ, আমি এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। ছাত্ররা এখন আর দেশের বৃহত্তম শক্তি হিসেবে কেন গণ্য হবে না সে সন্দেহ কেউ করবে না। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ছাত্র সংস্থা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থা অনুসরণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে ছাত্র সংস্থাগুলো রাজনৈতিক দলের একটা শাখা। তাই তো?'

'এ কথা সবাই জানে সুবাসদা। তুমি কী বলতে চাইছ?'

'পার্টি যদি ভুল করে এবং সেই ভুলটা ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেয় তা হলে তুমি কি সেটা সমর্থন করবে?' অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল সুবাস সেন।

অনিমেষ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'তা কেন? পার্টি যদি ভুল করে তা হলে সেটা দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করা উচিত।'

'কিন্তু নেতারা যদি জেনেশুনে ভুল করেন, তা হলে?'

'তা কেন করবে?'

'করবে এবং করছে। এটাও এক ধরনের রাজনীতি।'

'কী করে সম্ভব সুবাসদা! প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। না হলে একটার সঙ্গে আর একটার কোনও পার্থক্য থাকবে না। নেতারা যদি সেই আদর্শ মানতে না চান তা হলে তার প্রতিবাদ দল থেকেই উঠবে। যারা কর্মী, তারা চুপ করে থাকবে কেন?'

'চুপ করে থাকবে স্বার্থের জন্যে।'

'না, এ কথা আমি মানি না।'

'আমি মানি।'

'কারণ?'

'কারণ এই প্রতিবাদ করার জন্যে আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যে ক'জন বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলাম তারা ছাড়া আর কেউ একটা কথা বলেনি। এমনকী আমাদের ওপর যে আচরণ করা হল তার সমালোচনা করার সাহস কেউ করেনি।'

অনিমেষ হতবাক্ হয়ে গেল। সুবাসদাকে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে? সেই সুবাসদাকে? যে এতগুলো বছর দলের জন্যে প্রাণপাত করে গেল, নিজের ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে বীরভূমের গ্রামে দলের হয়ে কাজ করে বেড়াল, তাকে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অনিমেষের। কোনও রকমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হয়েছে এই ব্যাপারটা?'

সুবাসদা হাসল, 'মাসখানেক। তুমি জানতে না দেখে অবাক হচ্ছি।'

'না আমি জানি না। বিমানদারা জানে?'

'অবশ্যই। ওরাই তো সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আমাকে তাড়ানোর ব্যাপারে। দ্যাখো, বিধান রায় মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের নেতারা যেন গন্ধ পাচ্ছেন একদিন মন্ত্রিত্বটা দলের হাতে আসবে। তারপর থেকে সবার চালচলন মতামত দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এটাই হল সবচেয়ে দুঃখের কথা। এখন কেউ কাউকে চটাতে চায় না। চোখ বুজে অন্যায় এড়িয়ে যাচ্ছে সবাই।'

'তোমাদের কী কারণে এক্সপেল করা হল?'

'পার্টির বর্তমান কার্যধারার সমালোচনা করেছিলাম। মুখে যা বলা হয়েছিল কাজে তা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন গ্রামে থেকে ওখানকার মানুষগুলোর কাছে ক্রমশ প্রতারক হয়ে যাচ্ছি। কমিউনিজমের প্রথম কথাই হল মানুষের সমানভাবে বাঁচার অধিকার আদায় করতে হবে। অথচ দলের মধ্যে ছোটখাটো হিটলারের ছড়াছড়ি। নিঃস্ব মানুষের পার্টি কখনও জোতদারের ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না। গত কুড়ি বছরে পার্টির নেতারা কতগুলো ফাঁকা বুলি আওড়ে যাচ্ছে যেগুলোর বাস্তব রূপায়ণের কোনও চেষ্টা এ দেশে হয়নি। এ দেশের কমিউনিজম তাই একটা হাওয়ার বেলুনের মতো, ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা বলেছিলাম নতুন রক্ত চাই নেতৃত্বে। যে মানুষগুলো এতগুলো বছরে দলকে সুনির্দিষ্ট পথে চালাতে পারল না তাদের সরে যেতে হবে। এর ফল একটাই হল এবং আমরা জানতাম, আমাদেরই সরে যেতে হয়েছে।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এ রকম করলে দল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। যত ভাঙন হবে তত শত্রুপক্ষ উৎসাহিত হবে।'

'শত্রুপক্ষ? আমরাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

www.MurchOna.com

'কিন্তু— ।'

'শোনো, কমিউনিস্ট পার্টির দুটো ভাগ হল কেন ? চিনা সমস্যা ? মোটেই না। তুমি কি জানো, হোম মিনিস্টার যখন রেডিয়োতে ঘোষণা করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির একটা শাখা এই দেশে সশস্ত্র বিপ্লব আনতে চায় চিনের স্বার্থে তখন আমাদের প্রধান নেতা কী বলেছিলেন তাকে ? সেই সকালে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন আমরা কমিউনিস্টরা আইনসম্মত গণতান্ত্রিক কার্যধারায় বিশ্বাস করি। কোনও রকম সশস্ত্র বিপ্লবের ধারেকাছে আমরা নেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা হলে দল ভাগ হল কেন ? কমিউনিস্ট পার্টির ডান-বাম যদি একই পথে চলে তা হলে আলাদা হাঁড়ি করতে হল কেন ? সেটা নেতৃত্বের গোলমাল না আদর্শের সংঘাত তা এখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।'

সুবাসদা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। রেস্টুরেন্টের অনেকেই এ দিকে এখন তাকাচ্ছে। এমনকী সামনের লোক দুটোও। সেটা বুঝতে পেরে সুবাসদা উঠে দাঁড়াল। দাম মিটিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এখনও মানিকতলায় আছ, তাই না ?'

অনিমেষ বলল, 'না। আমি এই গ্রে স্ট্রিট-হরি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ের হোস্টেলে এসেছি। আসবে ?'

'আজ থাক। তোমাকে আমার দরকার। ব্যাপারটা ভাবো। এ সব কথা এখনই কাউকে বলার দরকার নেই। আমি শিগগিরই দেখা করব।'

'কী করছ সুবাসদা ?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের এখন কী করা উচিত তাই ভাবছি অনিমেষ।'

## আঠার

হোস্টেলে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল ওর ঘরে বেশ ভিড়। তমাল আর পাশের ঘরের দুটি ছেলে বেশ মেজাজে আড্ডা জমিয়েছে দাদুর সঙ্গে। সরিৎশেখর ডুয়ার্সের পুরনো দিনের গল্প বলছেন। তমাল চেয়ারে বসেছে আর দু'জন জানলার কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

অনিমেষ দরজায় দাঁড়াতেই বিছানায় বসা সরিৎশেখরের নজর পড়ল প্রথম, কথা থামিয়ে বললেন, 'এখানে ডাক্তারকে বোধ হয় সহজে পাওয়া যায় না!'

অনিমেষ হেসে ঘাড় নাড়ল। দাদুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে হলে এ প্রশ্নটা করতেনই না। দেরি হলে বকাঝকা করে বাড়ি মাথায় করতেন। হঠাৎ অনিমেষের মনে পড়ল এই লোকটার ভয়ে এককালে স্বর্গছেঁড়ায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। অনিমেষ ওষুধগুলো টেবিলে রাখল, 'এখন শরীর কেমন আছে ?'

'ভাল, বেশ ভাল। এই যে তোমার বন্ধু আমাকে সন্দেশ খাওয়াল, চমৎকার খেলাম।' ফোকলা মুখে হাসলেন সরিৎশেখর।

তমাল অনিমেষকে বলল, 'দাদুর কাছে তোমাদের ওখানকার গল্প শুনছি। দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। চা বাগান কী করে পত্তন হল তার জীবন্ত সাক্ষী দাদু। আমরা তো সেই 'দুটো পাতা একটি কুঁড়ি' থেকেই যেটুকু জেনেছি।'

অনিমেষের এত ভিড় ভাল লাগছিল না। একেই ঘরটা ছোট তার ওপর এত লোক একসঙ্গে হলে ভাল করে দাঁড়ানো যায় না। সে বলল, 'বাবাকে চিঠি দেওয়া হল না। ভাবছি কাল সকালে একটা টেলিগ্রাম করে দেব!'

'হোয়াই ?' সরিৎশেখরের ভুরু কুঁচকে গেল।

অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল। এ রকম প্রশ্ন কেন ? উনি এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছেন এ খবর জানানোর অন্যায়টা কী ? 'বাবা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন!'

'আমার মনে হচ্ছে চিন্তাটা তোমারই বেশি হচ্ছে। তা ছাড়া তোমার টেলিগ্রাম যাবার আগেই আমিই পৌঁছে যাব। ও সব করতে যেয়ো না।' সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি পৌঁছে যাবেন মানে ?'

'আমি ঠিক করেছি কাল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে চলে যাব।'

'সেকী! এই শরীর নিয়ে আপনি যাবেন কী করে! পথেঘাটে কিছু হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। শরীর ঠিক করে তারপর যাবেন।' অনিমেষ খুব অসন্তুষ্ট গলায় বলল। যে লোকটা সকালবেলায় ওরকম ধুঁকেছে সেই সন্ধেবেলায় এ রকম কথা বলছে ?

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর হাসছিলেন, 'আমার শরীরকে আমার চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই কেউ বুঝবে না। যেটুকু দুর্বলতা আছে তা বয়সটার জন্যে। জলপাইগুড়িতে ফিরে গেলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে।'

এতক্ষণ ওরা চুপচাপ কথা শুনছিল। এবার তমাল বলল, 'কিন্তু দাদু, আরও দু-তিন দিন থেকে গেলে দোষটা কী। শরীর ফিট হয়ে গেলে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ঘুরে পুজোটুজো দিয়ে তবে যান। আমাদের কাছে যখন এসেছেন তখন তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেনই বা কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'বেঁচে থাকি যদি নিশ্চয়ই আবার আসব ভাই, অনিমেষ চাকরি-বাকরি করে ঘরদোর করুক তখন এসে থাকব। এখন এই খাঁচায় আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব।'

'খাঁচা?' অনিমেষ অবাক হল।

'খাঁচা নয়! স্বর্গে আছি পাতালে যেতে হবে পায়খানা করতে। তাও যদি একই সঙ্গে কয়েকজনের প্রয়োজন হয় তা হলে লাইন দিতে হবে সেখানে। আমি মনে করি মানুষের শোয়ার ঘর আর পায়খানা একই রকমের আরামদায়ক হওয়া উচিত। তার ওপর এই রকম কানের কাছে দিনরাত ট্রামের ঢং ঢং আওয়াজ অসহ্য।' সরিৎশেখর মুখ বেঁকালেন।

অনিমেষ হেসে বলল, 'তা হলে বুঝুন আমি—আমরা কী রকম আরামে থাকি!'

সরিৎশেখর উত্তেজিত হলেন, 'এটা তোমাদের কী দুর্ভাগ্য তোমরা বুঝছ না। একটি ছাত্রকে যদি ন্যায্য পয়সা দিয়েও এই রকম নরকে থাকতে হয় তা হলে তার কাছ থেকে দেশ কী আশা করবে? এইভাবে তোমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

পাশের ঘরের আর একটি ছেলে বলল, 'বিশৃঙ্খলা মানে?'

সরিৎশেখর কঠিন মুখে বললেন, 'এখন কত রাত? এই সময় প্রতিটি ছাত্রের কী করা উচিত? আর তোমরা আমার সঙ্গে গপ্পো করছ, এটা বিশৃঙ্খলা নয়?'

কথাটা শুনে ছেলেদের মুখ কালো হয়ে গেল। অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল। দাদু যে এ রকম মুখের ওপর ওদের কথা শোনাবেন সে ভাবতে পারেনি। অবশ্য এটাই সরিৎশেখরের আসল চরিত্র। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারেন না।

তমাল উঠে দাঁড়াল, 'আমি কিন্তু আপনার কথা মানছি না। আমরা যারা হোস্টেলে থেকে পড়ি তারা জানি আমাদের পাশ করতেই হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। নিজেদের পড়াশুনা আমরা নিজেদের সুবিধেমতো সময়ে করে নিই। আপনার কাছে যেটা পড়াশুনার সময় বলে মনে হচ্ছে সেটা আমার কাছে জিরোবার মনে হতে পারে। ধরুন সারাদিন ক্লান্তির পর ট্রামে-বাসে ঝুলে হোস্টেলে ফিরে পড়তে বসলে আমার ব্রেন তা অ্যাকসেপ্ট করবে না। অথচ দশটার পর পড়লে ওটা আমার বুঝতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কোনটা বিশৃঙ্খলা এবার বলুন?'

সরিৎশেখর কিছুক্ষণ তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বোঝা যাচ্ছিল তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। তারপর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'আমি তোমাদের ঠিক বুঝতে পারিনা। প্রায়ই কাগজে ছাত্রদের ট্রাম-বাস পোড়ানোর কথা পড়ি। তখন মনে হয় তোমরা যাতে পড়াশুনো ছাড়া সব কিছু করো তার জন্যে একটা প্ল্যান চলছে। হয়তো তোমরা ভাল ছেলে তাই এ ভাবে থেকেও একটা পথ বের করে নিয়েছ। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান নয় তারা তো তলিয়ে যাবে।'

এর পর আর কথা জমল না। দাদুর কথার সুর ওদের কানে লেগে আছে অনিমেষ বুঝতে পারছিল। এক একটা অজুহাত দেখিয়ে বা না দেখিয়ে ওরা চলে গেল। ঘর নির্জন হয়ে গেলে অনিমেষ বলে ফেলল, 'আপনি ও ভাবে না বললেই পারতেন!'

'কী ভাবে?'

'এই সরাসরি—মুখের ওপর।'

'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। তোমার কি অন্যায় মনে হচ্ছে?'

'আমরা অপ্রিয় সত্যি বলতে চাই না।'

'অপ্রিয় সত্যি!' সরিৎশেখর হাসলেন, 'তা হলে তুমি এটাকে সত্যি বলতে চাইছ?'

'হয়তো, আবার তা নাও হতে পারে। দাদু, আমরা জলপাইগুড়িতে সব কি যে-রকমভাবে দেখতাম এবং ভাবতাম, কলকাতায় এসে জানলাম সেটাই অন্যভাবে দেখা যায় বা ভাবা যায়। তাই এখানে সব কিছুই অন্য রকম। আসলে জলপাইগুড়ি আর কলকাতার পরিবেশ একদম আলাদা, সবাই পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেয়।'

সরিৎশেখর নাতিকে ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, 'লন্ডনে দুপুর বেলায় বরফ পড়ে, সাহারায় আগুন জ্বলে আর কলকাতায় ঘাম হয়। কিন্তু ওই একই সময়ে তিনটে জায়গার মানুষের

www.MurchOna.com

বোধগুলোর কিন্তু পরিবর্তন হয় না। থাক ছেড়ে দাও এ সব কথা। তোমার ডাক্তার কী বলল?'

অনিমেষ ডাক্তারের কথা জানাল। সরিৎশেখর শুনে বললেন, 'ও সব আর দরকার হবে না। রাত্রে যদি ঘুম হয় তা হলেই হবে। এই বয়সে ওষুধপত্র শরীরকে কাহিল করে দেয়। তা হলে কাল সকালে আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়ো।'

'আপনি কালকে যাবেনই?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার ফিরে যাওয়া দরকার তাই।'

'তা হলে ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছেন কেন? আমি তো স্টেশনে গিয়ে সিট রিজার্ভ করিয়ে আপনাকে বসার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার তো তাই করা উচিত।'

'কী দরকার। আমি তো এতটা রাস্তা একা একা ঘুরলাম, তুমি তো সঙ্গে ছিলে না। এখানে এসে আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম বলেই তোমাকে বিরক্ত করেছি। আবার শরীরটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিজেই চলে যেতে পারব। এই জন্যে মিছিমিছি তোমার একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। কাল স্টেশনে গেলে তোমার আর একটা দিন কলেজ নষ্ট হবে। সেটা আমি চাই না।' সরিৎশেখরের গলা কেমন নিরাসক্ত লাগছিল।

অনিমেষের মনে হচ্ছিল দাদু অনেক দূরের মানুষ। সকালে দাদুকে দেখে বুকের মধ্যে যে আবেগের জোয়ার এসেছিল তা এই মুহূর্তে নিঃসাড়। এই মানুষটার বুকে হামাগুড়ি দিয়ে ওর শৈশব কেটেছে। রিটায়ার করে যখন সরিৎশেখর স্বর্গছেঁড়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে জলপাইগুড়িতে চলে এলেন তখন সে সাত-আট বছরের বালক, বাবা-মাকে ছেড়ে ওঁর সঙ্গ ধরেছিল। স্কুলের ক্লাশগুলো একটা একটা করে ডিঙিয়েছে এই মানুষটার কড়া নিয়মের মধ্যে থেকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে সরিৎশেখরকে কোনওদিন চিনতে পারেনি। এ কথা ঠিক, এরকম ঘরে থাকার অভ্যেস দাদুর নেই। হোস্টেলের বারোয়ারি ব্যবস্থায় দাদুর অসুবিধে হবে। কিন্তু তা হলেও এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছে না অনিমেষ। হঠাৎ তার খেয়াল হল দাদু কোথায় গিয়েছিলেন, কেন গিয়েছিলেন তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

নিচু গলায় অনিমেষ বলল, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'গয়া।'

'গয়া? গয়াতে কেন?'

'শ্রাদ্ধ করতে।'

'কার শ্রাদ্ধ?'

'আমার নিজের।'

স্তব্ধ হয়ে গেল অনিমেষ। সরিৎশেখরের মুণ্ডিত মস্তকে গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা চুলের আভাস হঠাৎ তার চোখে কেমন অপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছিল। কোনও মানুষ জীবিত অবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ করে আসছে এটা কল্পনাতেও ছিল না তার। বিশেষ করে সেই লোক যিনি বৃদ্ধ বয়সেও ধর্মকর্ম মানেননি, দীক্ষাটিক্ষা নেননি। যা সত্যি মনে হয়েছে তাই করেছেন, আপোস করার জন্যে কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। সে কোনও রকমে বলতে পারল, 'আপনি এমন করলেন কেন?'

'তোমার খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি আপনাকে—!' অনিমেষের কণ্ঠে আবেগের প্রাবল্য হল। সে কোনও রকমে বলতে পারল, 'শ্রাদ্ধের পর মানুষের জাগতিক সুখ দুঃখ—।'

'রাইট।' সরিৎশেখর সোৎসাহে ঘাড় নাড়লেন, 'ঠিক বলেছ। আমি এখন এক অর্থে মৃত। কিছুদিন থেকে ব্যাপারটা ভাবছিলাম। সারা জীবন ধরে আমি অনেক কিছু করেছি। একজন সাধারণ মানুষের যা যা করা উচিত সব। ইদানীং আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। খেতে ভালবাসতাম খুব, আজকাল শরীর খাবার নিতে পারে না। তোমার পিসিমা চাল-ডাল গলিয়ে একটা পিণ্ডির মতো করে দেয় তাই আধ ঘণ্টা ধরে গলায় ঢালি। গিলতেও কষ্ট হয়। যতদিন নিজের শক্তি ছিল ততদিন কারও পরোয়া করিনি। কিন্তু অথর্ব হওয়া মাত্র অন্যের করুণা প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কিছুই অসম্ভব। অর্থ

www.MurchOna.com

কষ্ট বড় কষ্ট অনিমেষ। আমার মতো মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন সেটা অভিশাপের মতো মনে হবে। তোমার বাবা আমাকে টাকা দেয়। দু-তিন দিন দেরি হলে মনে হয় সে আমাকে অবহেলা করছে। এই মনে হওয়াটা থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে! যেহেতু সংসারে আছি তাই অথর্ব হলেও লোভ মোহ ক্রোধ থেকে আমার মুক্তি নেই। এগুলো যত থাকবে তত আমি জর্জরিত হব। ক'দিন আগে তোমার জ্যেঠামশাই সস্ত্রীক আমার কাছে চলে এল। অত্যন্ত জীর্ণদশা তার। খেতে পায় না। এসে এমন ভাব দেখাল যেন আমার সেবা না করলে তার ইহকাল নষ্ট হয়ে যাবে। যে ছেলেকে এককালে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম, বারংবার যার ছায়া আমি এড়িয়ে চলেছি তাকেই আমি মেনে নিলাম। আমি বুঝতে পারছি আমাকে সেবা করার নাম করে সে আমারই অন্ন ধ্বংস করতে চায়। আমি মরে গেলে ঘরবাড়ির দখল নিতে চায় তবু আগেকার সেই শক্ত ভাবটা কোথায় চলে গেল আমার। আমাকে সে তেল মালিশ করে দেয়, হাতে ধরে কালীবাড়ি নিয়ে যায়, এই বৃদ্ধ বয়সে আর একা থাকতে হয় না আমাকে, এটাই আমার কাছে এত বড় যে আমি তার অতীতের সব অন্যায় ভুলে যেতে পারলাম। তোমার বাবার সেটা পছন্দ হল না। এককালে যে আমাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, আমার সম্মান পাঁচজনের কাছে লুটিয়ে দিয়েছিল, আবার তাকে আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি সেটা সে মানতে পারছিল না। অনিমেষ, নিজে উপলব্ধি করলাম, যখন রক্তের জোর চলে যায় তখন মানুষ খুব লোভী হয়ে পড়ে। নিজেকে আমি এককালে যতটা কঠোর ভাবতাম এখন আবিষ্কার করলাম আমি আদপেই তা নই। শুধু জেদের বশে অন্য রকম চলার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই সময় তোমার পিসিমা বলল, সে নাকি শুনেছে—ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে আমি চলে গেলেই বাড়িটা পেয়ে যাবে। কবে যাব তাই চিন্তা। মুহূর্তেই আমি অন্য রকম হয়ে গেলাম। সেই দিনই ওদের আবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। যাওয়ার সময় আমার মুখের ওপর অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে গেল ওরা। পরে মনে হল এ রকমটা কেন আমি করলাম? ওই বাড়িটাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলেই কি ওটা নিয়ে কোনও লোভ সহ্য করতে পারলাম না? তা হলে ভালবাসাটা তো একটা লোভেরই অন্য পিঠ। হঠাৎ মনে হল পৃথিবীতে যে ক'টা দিন একটা মানুষের বেঁচে থাকা দরকার তার থেকে অনেক বেশি দিন আমি বেঁচে আছি। দীর্ঘজীবন বড় অভিশাপের!' এক নাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন সরিৎশেখর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'পিছু টান মুছে ফেলব ঠিক করলাম। এক রাত্রে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলাম গয়া। আমার মৃত্যুর পর লোকে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে আর লোকজনকে ডেকে খাওয়াবে এটা সহ্য হবে না। নিজের পাট নিজেই চুকিয়ে দিয়ে এলাম। এখন নিজেকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন আকাশ থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখার মতো মজা লাগছে। তোমার বন্ধুরা আমাকে দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাট দেখার কথা বলেছিল। ও সব জায়গায় যাবে যারা আমি তো তাদের দলে নই। আমার তো সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন যে ক'দিন থাকব চোখ চেয়ে দেখব আর কান খুলে শুনব। কিন্তু এই দেখা বা শোনা আমার মনে কোনও রেখাপাত করবে না। মানুষ বেঁচে থাকে আশা নিয়ে। আমি সেই ইচ্ছেটুকু গয়ায় রেখে এসেছি। জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি কারণ আমাকে এখনও কিছুদিন এই শরীরটাকে টানতে হবে। তোমার পিসিমা সেই বালবিধবা হবার পর থেকে আমার ঘাড়ে আছে। সে আমাকে বোঝে।'

অনিমেষ মানুষটার দিকে অপলক তাকিয়েছিল। এখন সরিৎশেখরের ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে কেমন অন্যরকম চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে সংযত করতে। সরিৎশেখর উর্ধ্বমুখে বসে আছেন এখন। কিছুক্ষণ ঘরে কোনও শব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাত্রে কী খাবেন?'

'কিছু না। সন্দেশটা খেয়ে পেট ভার হয়েছে। তুমি বরং এক গ্লাস জল দাও।'

সরিৎশেখর উঠলেন। এখন থেকে পদক্ষেপ অনেকটা স্বাভাবিক। অনিমেষ দেখল উনি ছাদের কোনায় একা একা হেঁটে গেলেন। টেবিলে জল রেখে অনিমেষ দ্রুত বিছানাটা ঠিক করে দিল। ইচ্ছে করলে সে আজ রাতে অন্য কোনও ঘরে শুতে পারে। কিন্তু দাদুকে একা রেখে দিতে মন চাইছে না। সে একটা চাদর বিছিয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকবে বলে ঠিক করল।

রাতের খাওয়া নীচে সেরে এল অনিমেষ। এসে দেখল সরিৎশেখর চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। ঘুমুচ্ছেন ভেবে নিঃশব্দে সে মেঝেতে বিছানা করছিল নিজের, সরিৎশেখর বললেন, 'কোনও ঘরে খাট খালি নেই?'

'কেন?'

'মেঝেতে শুলে অসুস্থ হতে পারো। যদি খাট খালি থাকে সেখানে শোও।'

www.MurchOna.com

'না, আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তুমি কি ভাবছ একা থাকলে রাত্তিরে আমি মরে যেতে পারি ?'

'এ কথা কেন বলছেন ?'

'তুমি তো শুনলে আমার জন্যে ভাবনা করা নিষ্ফল। অবশ্য তোমার অসুবিধা হবে তেমন হলে। কিন্তু যে ছেলে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে তার এমন মন থাকা উচিত নয়।'

আচমকা ইলেকট্রিক শক খাওয়া অনুভূতি হল অনিমেষের। ও মুখ তুলতে পারছিল না। দাদু এ কথা এতক্ষণ পরে কেন বললেন ? পুলিশের সঙ্গে লড়াই তো সে কখনও করেনি। করতে যাওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতিও হয়নি। অবশ্য ক'দিন আগে ইউনিভার্সিটির সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটায় সে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাকে কি পুলিশের সঙ্গে লড়াই বলা যায় ? কিন্তু প্রশ্ন হল দাদু সে-কথা জানলেনই বা কী করে ? কলকাতায় সে এসেছে পড়াশুনা করতে। সে যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে, বামপন্থী রাজনীতিতে সে বিশ্বস্ত এবং ইউনিয়নের জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করে—এ সব ব্যাপার তো সরিৎশেখরের জানার কথা নয়। পরীক্ষায় ফেল করেনি মানে বাবার পাঠানো টাকার অপব্যয় হয়নি। ছুটিতে সে যখন জলপাইগুড়িতে গিয়েছে তখন চুপচাপ বাড়িতে বসে থেকেছে। তার আচরণ দেখে কারও বোঝার অবকাশ ছিল না যে সে কলকাতায় এ সব ব্যাপার করছে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল তার মুখের ওপর সরিৎশেখরের দুটো চোখ স্থির হয়ে আছে। অতএব তাকে এক্ষুনি একটা জবাব দিতে হবে। দাদুর কাছে মিথ্যে কথা বললে ছেলেবেলায় বুক কেঁপে যেত, কখনওই পারত না। সরিৎশেখরের মুখের দিকে না তাকিয়ে অনিমেষ হাসবার চেষ্টা করল, 'এ খবর আবার কোথায় পেলেন! পুলিশের সঙ্গে আমি লড়াই করতে যাব কেন ? আর সেরকম হলে আমাকে ওরা ছেড়ে দিত ?'

'তুমি কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছ এ কথা মিথ্যে ?'

'আপনি কোত্থেকে জানলেন ?'

'আগে বলো মিথ্যে কি না ?'

'কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করি মানেই পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করছি ?'

'আজ করছ না, কাল করবে, পরশু করবে।' সরিৎশেখর দৃঢ় গলায় বললেন, 'তুমি এখন ছাত্র। তোমার কর্তব্য ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করা, যোগ্য করা। তা না করে তুমি কমিউনিস্ট হয়েছ। দেশে বিপ্লব আনতে চাও ? এরকম একটা নেশায় তোমাকে ধরবে আমি চিন্তাও করিনি। যেদিন তুমি জলপাইগুড়ি থেকে প্রথম এসেছিলে সেদিন আমি তোমায় বলেছিলাম, তুমি কৃতী হয়ে ফিরে এসো, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু তোমার স্কুলের এক মাস্টার যখন আমায় বলল যে তুমি ইউনিয়ন করছ, দিনরাত পার্টি নিয়ে মত্ত আছ, আমার আর অপেক্ষা করার কোনও প্রয়োজন থাকল না। বলতে পারো এটাও একটা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা। তোমার জন্যে একটা স্বপ্ন দেখা সেটা ভেঙে গেলে কষ্ট হচ্ছিল খুব। তা গয়া থেকে ঘুরে এসে আমার সেই কষ্টটা আর নেই। এখন তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখি না।'

'আপনি বোধ হয় একটু অতিরঞ্জিত সংবাদ পেয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করলেই যে একটা ছেলের ভবিষ্যতের বারোটা বেজে গেল—এ ধারণা এখন অচল।' অনিমেষ সরিৎশেখরের শেষ কথাটার কোনও গুরুত্ব দিতে চাইল না। ও চাইছিল দাদুকে কমিউনিজমের আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসে যাতে ওঁর বদ্ধ ধারণা কিছুটা পালটে দিতে পারে!

কিন্তু সরিৎশেখর সেদিকে গেলেনই না। অনিমেষের কথা শুনে চুপচাপ শুয়ে থাকলেন।

রাত বেশি হলে ট্রামের শব্দ আরও বিকট হয়ে ওঠে। আলোচনাটা উঠেও থেমে গেল বলে অনিমেষ অস্বস্তি বোধ করছিল। আগে দাদুর কাছে খোলাখুলি মনের কথা বলতে পারত সে। আজকাল সেই ইচ্ছেটা আছে কিন্তু সরলতাটুকু কখন হারিয়ে গেছে। তাই যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাতে হয়।

একসময় সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি কি এখন পড়াশুনা করবে ?'

অনিমেষ বলল, 'আজকে ভাল লাগছে না দাদু।'

'তা হলে আলোটা নিবিয়ে দাও।' সরিৎশেখর পাশ ফিরে শুলেন।

সকালে সরিৎশেখর অন্য মানুষ। একদিনের বিশ্রামের পর শরীর একটু স্থির হওয়ার আবার আগের ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। জ্বর আসেনি আর। সেই ভোর রাতে যখন সবাই ঘুমুচ্ছে তখন অনিমেষকে ডেকে তুলেছেন। ঘুম চোখে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই সময়ে উঠছেন কেন ? অন্ধকার আছে বাইরে।'

www.MurchOna.com

'দেরি নেই ভোর হবার; প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলো সেরে নিই। আশা করি এখন লাইন পড়েনি।'

সরিৎশেখরের কথা শুনে হেসে ফেলল অনিমেষ। দাদুর মাথায় ওই একটাই চিন্তা পাক খাচ্ছে।

তখন ঠাকুর-চাকরও ওঠেনি। নির্বিঘ্নে নীচের কাজ সেরে ওপরে উঠে এসে সরিৎশেখর বললেন, 'তোমাদের বাথরুম পায়খানায় কি চব্বিশ ঘণ্টা আলো জ্বলে? ওরকম স্যাঁৎসেঁতে হয়ে থাকে সব সময়?'

অনিমেষ বলল, 'পুরনো বাড়ি তো, তাই আলো ঢোকে না।'

'তুমি কলকাতার জন্য উপযুক্ত হয়েছ।'

কথাটা হয়তো সরিৎশেখর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কিন্তু অনিমেষের মনে হল এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। কলকাতায় বাস করতে গেলে কতগুলো যোগ্যতার খুব দরকার। বিবেক ভদ্রতা স্নেহ অথবা সৌজন্যের চিরাচরিত সংজ্ঞাগুলো এখানে প্রয়োজন মতো অদলবদল করে নেওয়া হয়। যে মানুষ এ সব বোঝে না তাকে প্রতি পদক্ষেপে ঠোকর খেতে হয়। অনিমেষ এই কয় বছর কলকাতা বাসের পর এ সবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া করে ফেলেছে।

এখন আকাশে প্রচুর তারা। চারধার এত বেশি চুপচাপ যে মনে হয় এটা কলকাতা নয়। ঘুমের মধ্যে শেষ ট্রাম চলে গেছে আর প্রথম ট্রাম চলার এখনও সময় হয়নি। অদ্ভুত করুণ এবং বিষণ্ণ লাগছিল আকাশ। সারারাত জ্বলার পর এই সময় রাস্তার আলোগুলো এমন হলদে হয়ে যায় কেন? ছাদে দাঁড়িয়েছিল অনিমেষ এমন সময় সরিৎশেখর লাঠি হাতে ঘর থেকে বের হলেন। যে ময়লা পোশাকগুলো গতকাল খুলে রেখেছিলেন ঘরে ঢুকে আজ সেগুলো পরনে।

অনিমেষ এগিয়ে এল, 'এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'একটু বেড়িয়ে আসি। কেন, তুমি মর্নিং ওয়াক করো না?'

ঠোঁট কামড়াল অনিমেষ। জলপাইগুড়ির সেই দিনগুলো! বছরের পর বছর এই মানুষটা প্রত্যেক ভোরে তাকে নিয়ে হেঁটেছেন তিস্তার পাশ দিয়ে। ওটা তো অভ্যাস হয়ে যাওয়ার কথা। কথায় বলে বাল্যের অভ্যেস আমৃত্যু থাকে। কিন্তু কলকাতায় আসার পর ওটা কখনও মনেই আসেনি। এখন ভোরে বরং ঘুম গাঢ় হয়। কলকাতায় যে যত দেরিতে ওঠে সে তত প্রতিভাবান।

অনিমেষ বলল, 'সে অভ্যেসটা চলে গেছে। কিন্তু এখানে মাঠ বা নদী খুব কাছাকাছি নেই, হাঁটবেন কোথায়?'

'কেন? এতবড় রাস্তা আছে। গাড়িঘোড়া না থাকলে ওখানে হাঁটতে তো কোনও অসুবিধা নেই। তোমাদের সদর দরজা খোলা আছে?'

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না গতকাল ওরকম ধুঁকতে আসা মানুষটি এরকম তাজা হয়ে যান কী করে। সে বলল, 'না গেট বন্ধ। আপনি চলুন আমি দারোয়ানকে ডেকে তুলি।'

একটা শার্ট গলিয়ে নীচে নেমে দারোয়ানকে তুলতে একটু ঝামেলা করতে হল। এই কাকভোরে কেউ বাইরে যায় না।

ওরা বেরিয়ে গেলে দারোয়ান আবার দরজা বন্ধ করে দিল। সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি এলে কেন?'

শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে অনেকদিন বাদে অনিমেষের এই সময় ভাল লাগছিল। একবার ঘুম চলে গেলে এরকম কাকভোরকে খুব আপন মনে হয়। সে কোনও উত্তর না দিয়ে সরিৎশেখরের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে লাগল।

এখন পথ নির্জন। রাস্তার হলদেটে আলো ছাড়া আকাশে কোনও আয়োজন শুরু হয়নি। ফুটপাতে কিছু ঘুমন্ত মানুষ ছাড়া লোকজন দেখা যাচ্ছে না। সরিৎশেখর লাঠি ঠুকে হাঁটছেন। এখন ওঁর চলা অত্যন্ত মন্থর। এককালে যাঁর সঙ্গে সে হেঁটে তাল রাখতে পারত না এখন তাঁর সঙ্গে পা মেলাচ্ছে হাঁটি হাঁটি করে। সরিৎশেখরের যে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে এটা বুঝতে পারল অনিমেষ। নেহাত জেদের বশেই হাঁটছেন তিনি। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু ছাড়িয়ে ডান হাতি একটা পার্কের সামনে দাঁড়াল ওরা। অনিমেষ বলল, 'এখানে একটু বসবেন?'

সরিৎশেখর স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, বসলে একটু ভাল হত।'

পার্কে ঢুকে বিব্রত হল অনিমেষ। অনেকগুলো বেঞ্চি পার্কময় ছড়ানো কিন্তু তার একটাতেও বসার পাটাতন নেই। কেউ বা কারা সযত্নে পার্কটাকে নেড়া করে রেখে দিয়েছে। দাদুকে নিয়ে একটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে অনিমেষ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। এর জন্যে তার কোনও দায়িত্ব না থাকলেও মনে হচ্ছিল কলকাতার মানুষ হিসাবে সে কতগুলো লজ্জার মুখোমুখি হচ্ছে।

সরিৎশেখর বললেন, 'আর চেষ্টা কোরো না। এবারে বরং ফেরা যাক।'

খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর। এখন ওঁর ক্লান্তি অত্যন্ত পরিষ্কার। কোনও রকে বসলে হয়। কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না অনিমেষ।

সরিৎশেখর বললেন, 'এই ন্যাড়া মাঠটাকে তুমি পার্ক বললে? ফুল নেই গাছ নেই এমনকী মাটিতে ঘাস নেই, বসার জায়গার কথা ছেড়েই দিলাম। কোন সংজ্ঞায় একে পার্ক বলা যায়? তবু তোমরা বলছ। বলছ অভ্যাসে। আসল জিনিসটা কখন হারিয়ে গিয়ে তার জায়গায় নকল জুড়ে বসল কিন্তু তোমরা টের পেলে না। আশ্চর্য।'

অনিমেষ জবাব দিল না। ওর মনে হচ্ছিল দাদুর কথার কোনও প্রতিবাদ আর এই মুহূর্তে সে করবে না। তর্ক করে এই বৃদ্ধকে আঘাত দিয়ে কী হবে। একটা অনুভূতি ক্রমশ ওকে অধিকার করছিল—দাদুকে আর দেখতে পাবে না সে। ভবিষ্যতের কথা সে জানে না। হয়তো ভবিষ্যৎ তাকে অনেক কিছু দেবে। যে সব কল্পনা তার বুকে মুখ খোঁড়ে সেগুলো হয়তো সত্যিকারের চেহারা নেবে। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে সে দু'হাত ভরে পেয়েছে সেই মানুষটি অতীত হয়ে যাবেন। এতদিন পরে যে সরিৎশেখরকে সে দেখেছে তাঁর সঙ্গে অতীতের সেই চেহারার কোনও মিল নেই। যে মানুষ নিজের শ্রাদ্ধ করে এসেছেন তিনি যে কোনও মুহূর্তেই চলে যেতে পারেন। অনিমেষের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ সরিৎশেখর কথা বললেন, 'অনিমেষ, তোমার কুষ্টিতে আছে রাজদ্রোহের জন্য জেলবাস অনিবার্য। তুমি রাজনীতি করবেই। কিন্তু যাই করো নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে কোরো। আমি জানি না সকাল থেকে রাত্তিরে একবারও তোমার নিজেকে ভারতবাসী বলে মনে হয় কি না। চারধারে যা দেখি তাতে কেউ সে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। নেতারা রাজনীতিকে সম্বল করে ক্ষমতা দখল করছে। এই দেশে বাস করে কেউ দেশটার কথা চিন্তা করে না। একটা যুবক নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবে না বা তা নিয়ে গর্ব করে না। তা হলে কী জন্যে তুমি রাজনীতি করবে? কেন করবে? আমি ঠিক বুঝি না তোমাদের। কিন্তু মনে হয়, তোমরা নানান জিনিস দিয়ে প্রতিমা বানাও শুধু প্রতিমার জন্যে, ভক্তিটুকুই তোমাদের নেই।'

অনিমেষ নাড়া খেল। সেই সময় দূরে অন্ধকারের ফিকে আলোয় প্রথম ট্রাম চলার সাড়া পাওয়া গেল। একটা আলোর পিণ্ড থরথরিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। কান ফাটানো শব্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ড্রাইভার। চকিতে দাদুর হাত ধরে ফুটপাতে উঠে এল অনিমেষ। যেন বুকের মধ্যে সপাং সপাং চাবুক মেরে শব্দের ঝড় তুলে ট্রামটা মিলিয়ে গেল ও দিকে।

সরিৎশেখর বললেন, 'চলো। তোমার কলকাতা জাগল।'

অনিমেষ চুপচাপ নিজের অতীতকে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। না, দাদুর কথা শুনবে না সে। নিজে স্টেশনে গিয়ে ভাল জায়গা দেখে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসবে দাদুকে। কর্তব্য বা ঋণস্বীকার নয়, এ আর এক ধরনের দীক্ষা—যা বোঝানো যায় না, যে বোঝে সে বুঝে নেয়।

## উনিশ

সরিৎশেখরকে জানালার কাছে বসিয়ে দিল অনিমেষ। রিজার্ভেশন পাওয়ার কোনও উপায় নেই, কুলিকে একটা টাকা দিয়ে জায়গা কিনতে হল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরিৎশেখরের দিকে তাকাতেই অনিমেষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সেই বিকেলটার কথা মনে হচ্ছিল। তার প্রথম কলকাতায় আসার বিকেল। সেদিন সে ছিল কামরায় আর সরিৎশেখর প্ল্যাটফর্মে। এবার সরিৎশেখরকে দেখার পর থেকেই কে যেন বুকের মধ্যে বসে বারংবার জানিয়ে যাচ্ছে, এই শেষবার। এরপর আর বৃদ্ধের দেখা পাবে না অনিমেষ। একটা বিরাট গাছ একটু একটু করে শুকিয়ে একটা ছোট শেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার তেজ বাড়লেই ঢলে পড়বে যেন। কিছু করার নেই, শুধু চোখ চেয়ে দেখা। এই যে সে স্টেশনে এসেছে এটাও পছন্দ ছিল না সরিৎশেখরের। তাঁর জন্যে অনেক সময় নষ্ট করেছে অনিমেষ, আর নয়। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি। রাস্তায় কিছু খাবেন না জেনেও মিষ্টি দিয়েছে সঙ্গে। পিসিমাকে দাদুর প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে।

নির্বিকার মুখে বসেছিলেন সরিৎশেখর। হঠাৎ কাছে ডাকলেন ইশারায়। চারদিকে যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলির হাঁকাহাঁকি, ইঞ্জিনের আওয়াজ—অনিমেষ জানলার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দাদুর মুখটাকে একদম অচেনা দেখাচ্ছে এখন। অনিমেষ বলল, 'কিছু বলবেন?'

ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'তোমার মায়ের কোনও চিহ্ন তোমার কাছে আছে?'

# Kaalbela by Somoresh Majumder

## [Part.1]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**